চতুর্ব্বিংশ বর্ষ] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ । [১ম ও ২য় সংখ্যা ।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

সূচীপত্র।

প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

আলোচনা-কার্য্যালয়

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাবড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২, টাকা।

চতুর্ব্বিংশবর্ষের আলোচনার নিয়মাবলী।

গ্রাহকদিগের প্রতি।—

১। আলোচনা প্রতি মাসের সংক্রান্তি মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

২। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন, প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা পূরণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বৎসরের প্রথম হইতেই গ্রাহক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। সংক্রান্তির প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই আলোচনা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকটে পৌঁছিবে। সপ্তাহ অতীত হইয়া যাইলে পত্রিকা না পাইলে আমাদিগকে জানাইবেন অন্যথায় অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়।

৪। আলোচনার বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲টাকা এবং নমুনা সংখ্যা ।৵ আনা। ভিঃ পিঃ করিতে হইলে ২৵০ দুই টাকা এক আনা দিতে হয়।

৫। নমুনা লইয়া মতামত না জানাইলে পরবর্ত্তী মাসে আলোচনা ভিঃ পিঃ করিয়া বার্ষিক মূল্য লওয়া হয়।

৬। আলোচনাসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিতে হইলে গ্রাহক সংখ্যা দিতে হয়। এবং পত্রের উত্তরাদি লইতে হইলে ৵০ আনা ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাইকার্ড দিতে হয়; অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৭। প্রত্যেক গ্রাহকগণই পত্র লিখিবার সময় বেশ স্পষ্টভাষায় নাম ঠিকানা ও নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

লেখকগণের প্রতি।-

৮। লেখকগণ বেশ স্পষ্ট করিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধাদির শেষে স্ব স্ব নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৯। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিই আলোচনায় প্রকাশার্থে মনোনীত হইবে।

১০। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাকটিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

১১। আলোচনার যে সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশিত হইতেছে তাহার মীমাংসা করিবার অধিকার একমাত্র গ্রাহকদিগেরই।

১২। প্রশ্ন মীমাংসা জন্য গুণানুসারে নগদ টাকা, প্রশংসাপত্র, স্বর্ণ বা রৌপ্য পদকাদি পুরস্কার বৎসরের শেষে দেওয়া হইবে।

১৩। যাঁহারা প্রশ্ন মীমাংসা করিবেন তাঁহাদের লিখিত উত্তর সহ নামধাম আলোচনায় প্রকাশিত হইবে।

১৪। আলোচনার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

১৫। আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি পেজ প্রতি বার ৪৲, অর্দ্ধ পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজ ১।০ আনা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র।

১৬। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম জমা দিলে উপরোক্ত দর অপেক্ষা টাকা প্রতি ৵০ আনা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়।

১৭। আলোচনা সংক্রান্ত পত্রাদি ও টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সরস্বতী

ম্যানেজার ও পরিচালক আলোচনা পত্রিকা।

হাওড়া।

চতুর্বিংশ বর্ষ] আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২৭। [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

আষাঢ় সংখ্যা সূচীপত্র।

শ্রাবণ সংখ্যা সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী]

ম্যানেজার ও পরিচালক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য-সরস্বতী।

আলোচনা-কার্য্যালয়

১০৮নং শঙ্কালনতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা।

বিশ্বাসই মূল।

মানবগণ অন্নজ, গ্রহজ ও কর্ম্মজ এই তিন কারণে শোক, দুঃখ, রোগ ও দরিদ্রতা ভোগ করিয়া থাকেন। অন্নজ রোগ ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধে আরোগ্য হয়। গ্রহজ রোগ গ্রহ শান্তিতে আরোগ্য হয়। আর কর্ম্মফলজনিত রোগে ঔষধ নাই তবে একমাত্র কালী পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি দান করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বিবরণ না জানিয়া কেবল মাত্র ঔষধে কোন ফল দর্শে না। সেই হেতু আমার কাছে আসিলে নাম ধরিয়া হস্তের রেখাদি দেখিয়া বা রাশি নাম কি ডাক নাম, উপস্থিত কত বয়স লিখিয়া ১৲ টাকা পাঠাইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি বলিয়া দেওয়া হয়। উপস্থিত কোন দশার ফলে রোগ, শোক, মনস্তাপ, গৃহবিচ্ছেদ মামলা মোকদ্দমা হইতেছে, কাজ কর্ম্ম নাই এবং নানা প্রকার অর্থ নষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নবগ্রহের শান্তি, কালী পূজা ও কবচ বা যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আর যদি কাহার জীবন সুখ না থাকে তবে তাঁহাকে কিছুই ব্যবস্থা দেওয়া হয় না। সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য এই গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। আবার যিনি গ্রহফলে আক্রান্ত, যাঁহার মতি বিভ্রান্ত, তিনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না। ইহার বিশেষ বিবরণ আমার কর্ম্মফল নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য খুরুট রোডে, তান্ত্রিক ঔষধালয় স্থাপিত করিয়াছি, এই স্থানে আমি দিবা ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত, এবং বৈকালে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে দেখিয়া থাকি।

কর্ম্মফলাদি তত্ত্ব।

মহাত্মা শ্যামানন্দ স্বামী কৃত।

কর্ম্মফলাদি তত্ত্ব—কোন কর্ম্মে কিরূপে রোগোৎপত্তি হয় এবং তাহার শান্তি বিধান, স্বরোদয়, গণকচূড়ামণি, পিশাচী, রাক্ষসী, তারিকা, সামুদ্রিক, লাম্বিক ও খনা প্রভৃতির মতে প্রশ্নাদি গণনা, এবং কিরূপে ষটচক্রভেদ করিয়া যোগীগণ ভগবান সদৃশ হন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সমেত তিনখণ্ড পুস্তক সডাক আড়াই টাকা স্থলে পাঁচসিকায় পাইবেন। পুস্তক নিঃশেষিত প্রায় সত্বর হউন।

সর্ব্ববিঘ্ন যন্ত্র বা কবচ।

মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র, সর্ব্বব্যাধিবিঘ্নপ্রশমন যন্ত্র নবগ্রহ যন্ত্র, মৃতবৎসা যন্ত্র, অপমৃত্যুনাশক যন্ত্র, কাকবন্ধ্যা যন্ত্র, চিরবন্ধ্যা যন্ত্র, বংশরক্ষা যন্ত্র, সর্ব্বচিন্তা যন্ত্র, সর্ব্ববশীকরণ যন্ত্র প্রভৃতি দিয়া থাকি। যাঁহার যে যন্ত্র আবশ্যক হইবে সেই যন্ত্রের নাম এবং নিজের নাম ও গোত্র লিখিয়া পূজার জন্য ৫৲ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইলে কবচ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিই। এই সকল যন্ত্র ধারণে সর্ব্বপ্রকার শুভ হয়।

তান্ত্রিক সাধক ও চিকিৎসক—

শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী।

তান্ত্রিক ঔষধালয়—[illegible]নং খুরুট রোড, হাওড়া।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ। ভাদ্র, ১৩২৭। ৫ম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

গ্রাহকবর্গের প্রতি সবিনীত নিবেদন।

যে সকল গ্রাহক এখনও পর্য্যন্ত আলোচনার বার্ষিক সাহায্য দেন নাই, তাঁহাদিগকে গতবারে স্ব স্ব দেয় সাহায্য মণিঅর্ডারে পাঠাইতে বলিয়াছিলাম কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত মণিঅর্ডারে সাহায্য পাঠান নাই তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষীয় পোষ্টাফিসসমূহে অনরেজিষ্টার্ড ভিঃ পিঃ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে রেজিষ্টারি করিয়া পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিতে হইতেছে, তাহাতে ২/০ আনা স্থলে ২৶০ আনা খরচ হইতেছে, সুতরাং গ্রাহকগণ যদি তাঁহাদের দেয় সাহায্য মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ ২/০ আনাতেই হয়। অতএব বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমরা ভিঃ পিঃ বন্ধ রাখিয়া গ্রাহকদিগকে তাঁহাদের দেয় সাহায্য মণিঅর্ডারে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। যদি কেহ মণিঅর্ডার করিয়া সাহায্য পাঠাইতে অসুবিধা বোধ করেন তাহা হইলে একখানি কার্ড দিয়া আদেশ করিলে পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিব। ৺পূজা আগত, গ্রাহকগণ তাঁহাদের দেয় সাহায্য সত্বর পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

বিনীত নিবেদক—ম্যানেজার আলোচনা।

ম্যানেজার ও পরিচালক—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য-সরস্বতী।
আলোচনা-কার্য্যালয়
১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা।

ভাদ্র সংখ্যার সূচীপত্র।

(প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

চতুর্ব্বিংশবর্ষের আলোচনার নিয়মাবলী।

১। আলোচনার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে লইলে ২।০ আনা। নমুনা যে কোন মাসের এক সংখ্যা সডাক ।৵০ আনা।

২। নমুনা লইয়া মতামত না জানাইলে পরবর্ত্তী মাসে আলোচনা ভিঃ পিঃ করিয়া বার্ষিক মূল্য লওয়া হয়।

৩। লেখকগণ বেশ স্পষ্ট করিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধাদির শেষে স্ব স্ব নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিই আলোচনায় প্রকাশার্থে মনোনীত হইবে।

৫। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাকটিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

৬। প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন, অন্যথায় ক্রমশঃ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৭। আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি পেজ প্রতি বার ৪৲, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র।

৮। আলোচনা সংক্রান্ত পত্রাদি ও টাকাকড়ি ম্যানেজার ও পরিচালকের নামে পাঠাইবেন।

৯। পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র প্রশ্নোত্তর পাঠাইবেন। নচেৎ গত মাস পরে পাঠাইলে আর তাহা প্রকাশিত হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩২৭।　　[৬ষ্ঠ সং

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

ত্রুটী স্বীকার।

আলোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমাদের অনেক গ্রাহকই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকেই অনেকভাবে পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, কিন্তু সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে পত্র দিয়া জানান আমাদের সাধ্যাতীত, তবে যাঁহারা রিপ্লাই-কার্ড দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আবার প্রেস বিভ্রাটে যেরূপ কাণ্ড হইয়াছে, তৎসমুদায় পরে জানিতে পারিবেন। বাকী সংখ্যা শীঘ্রই পাইবেন। যাঁহারা উতলা হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—ম্যানেজার

ম্যানেজার ও পরিচালক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য-সরস্বতী।

আলোচনা-কার্য্যালয়।

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সর্ব্বত্র ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ২।৵

কার্ত্তিকসংখ্যার সূচীপত্র।

চতুর্বিংশ বর্ষের আলোচনার নিয়মাবলী।

১। আলোচনার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে লইলে ২।৶০ আনা। নমুনা যে কোন মাসের এক সংখ্যা সডাক ।৶০ আনা।

২। নমুনা লইয়া মতামত না জানাইলে পরবর্ত্তী মাসে আলোচনা ভিঃ পিঃ করিয়া বার্ষিক মূল্য লওয়া হয়।

৩। লেখকগণ বেশ স্পষ্ট করিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধাদির শেষে স্ব স্ব নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিই আলোচনায় প্রকাশার্থে মনোনীত হইবে।

৫। মনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাকটিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

৬। প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন, অন্যথা ক্রমশঃ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৭। আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি পেজ প্রতি বার ৪৲, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র।

৮। আলোচনা সংক্রান্ত পত্রাদি ও টাকাকড়ি ম্যানেজার ও পরিচালকের নামে পাঠাইবেন।

৯। পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র প্রশ্নোত্তর পাঠাইবেন। নচেৎ ২।৩ মাস পরে পাঠাইলে আর তাহা প্রকাশিত হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ]   কার্ত্তিক, ১৩২৭।   [৭ম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

ত্রুটী স্বীকার।

আলোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমাদের অনেক গ্রাহকই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকেই অনেকভাবে পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, কিন্তু সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে পত্র দিয়া জানান আমাদের সাধ্যাতীত, তবে যাঁহারা রিপ্লাই-কার্ড দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আবার প্রেস বিভ্রাটে যেরূপ কাণ্ড হইয়াছে, তৎসমুদায় পরে জানিতে পারিবেন। বাকী সংখ্যা শীঘ্রই পাইবেন। যাঁহারা উতলা হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—ম্যানেজার।

ম্যানেজার ও পরিচালক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য সরস্বতী।

আলোচনা-কার্য্যালয়।

১০৮ [illegible]নতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূ[illegible] অগ্রিম সর্ব্বত্র ২৲ টাকা, ভিঃ পিতে [illegible]।

আশ্বিন সংখ্যার সূচীপত্র।

[প্রেরিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

চতুর্বিংশ বর্ষের আলোচনার নিয়মাবলী।

১। আলোচনার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে লইলে ২৶০ আনা। নমুনা যে কোন মাসের এক সংখ্যা সডাক ।৵০ আনা।

২। নমুনা লইয়া মতামত না জানাইলে পরবর্ত্তী মাসে আলোচনা ভিঃ পিঃ করিয়া বার্ষিক মূল্য লওয়া হয়।

৩। লেখকগণ বেশ স্পষ্ট করিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধাদির শেষে স্ব স্ব নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিই আলোচনায় প্রকাশার্থে মনোনীত হইবে।

৫। মনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাকটিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

৬। প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন, অন্যথা ক্রমশঃ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৭। আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি পেজ প্রতি বার ৫৲, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র।

৮। আলোচনা সংক্রান্ত পত্রাদি ও টাকাকড়ি ম্যানেজার ও পরিচালকের নামে পাঠাইবেন।

৯। পত্রিকা প্রাপ্তিপত্র প্রশ্নোত্তর পাঠাইবেন। নচেৎ ২।৩ মাস পরে পাঠাইলে আর তাহা প্রকাশিত হইবে না।

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

ক্রুটী স্বীকার।

আলোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমাদের অনেক গ্রাহকই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকেই অনেকভাবে পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে পত্র দিয়া জানান আমাদের সাধ্যাতীত; তবে যাঁহারা রিপ্লাই-কার্ড দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আবার প্রেস বিভ্রাটে যেরূপ কাণ্ড হইয়াছে, তৎসমুদায় পরে জানিতে পারিবেন। বাকী সংখ্যা শীঘ্রই পাইবেন। যাঁহারা উতলা হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রুটী মার্জ্জনা করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—ম্যানেজার।

ম্যানেজার ও পরিচালক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য-সরস্বতী।

আলোচনা-কার্য্যালয়।

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সর্ব্বত্র ২৲ টাকা, ভিঃ পিতে ২৶০।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার সূচীপত্র।

চতুর্বিংশ বর্ষের আলোচনার নিয়মাবলী।

১। আলোচনার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে লইলে ২৷৵০ আনা। নমুনা যে কোন মাসের এক সংখ্যা সডাক ৵০ আনা।

২। নমুনা লইয়া মতামত না জানাইলে পরবর্ত্তী মাসে আলোচনা ভিঃ পিঃ করিয়া বার্ষিক মূল্য লওয়া হয়।

৩। লেখকগণ বেশ স্পষ্ট করিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধাদির শেষে স্ব স্ব নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিই আলোচনায় প্রকাশার্থে মনোনীত হইবে।

৫। মনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাকটিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

৬। প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন, অন্যথা ক্রমশঃ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৭। আলোচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি পেজ প্রতি বার ৫৲ অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র।

৮। আলোচনা সংক্রান্ত পত্রাদি ও টাকাকড়ি ম্যানেজার ও পরিচালকের নামে পাঠাইবেন।

৯। পত্রিকা প্রাপ্তিপত্র প্রশ্নোত্তর পাঠাইবেন। নচেৎ ২।৩ মাস পরে পাঠাইলে আর তাহা প্রকাশিত হইবে না।

শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

চতুর্বিংশতি বর্ষ। } সন ১৩২৭ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে নিবেদন।

কাল অনাদি অনন্ত। এই অবিরাম কাল সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকালের বন্ধন অপচয় নাই, কালের পরিবর্তন কখন সম্ভবে না। অনন্ত অনন্তকাল একই প্রবাহে প্রবাহমান। তবে আমরা সেই অনন্তের কোন কুল-কিনারা করিতে পারি না বলিয়া বার, মাস, বৎসর প্রভৃতি বিভাগে সংক্ষিপ্ত করিয়া [illegible] করিয়াছি। পুরাতন দিন গেল, নূতন আসিল মাস গেল, আবার মাস আসিল পুরাতন বৎসর গেল, আবার নূতন বৎসর আসিল, সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সমস্ত বস্তুর পরমায়ু ক্ষয়িত হইয়া পড়িল।

এই নিয়মে ১৩২৭ সালে আমাদের আলোচনার পরমায়ু একবৎসর বাড়িয়া গেল। মা জগদম্বার কৃপায়, সে এই শুভ ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। এই আধিব্যাধি প্রপীড়িত জগতে কালের সহিত সমস্ত বস্তুই পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আলোচনার পরিবর্তনও অসম্ভব নহে। রয়েল তিন ফর্ম্মা হইতে ডিমাই ও ফর্ম্মা করা হইল। ইহাতে গ্রাহকগণের অসন্তোষের কোনও কারণ নাই। যে কয়মাস বাকী পড়িয়াছে, ছয় ফর্ম্মা করিয়া যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করিয়া পরে ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইবে, এবং বৎসরের শেষে যে কয়টী ফর্ম্মা কম পড়িবে তাহা পূরণ করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল। নতুবা মুদ্রাযন্ত্র একেবারে অধিক ফর্ম্মা ছাপিয়া ঠিক সময়ে প্রকাশ করিতে পারিবে না। আমি সাংসারিক নানাবিধ দুর্ঘটনায় এবং শারীরিক নানাপ্রকার অসুস্থতা বশতঃ আলোচনা ঠিক সময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হঠাৎ সন্নিপাত রোগে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতে আশা ছিল না যে আলোচনা আবার জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া আমার আজীবন সাহিত্য সেবার সহায়তা করিবে, কিন্তু মা যাঁহার সহায়, পত্রিকা পরিচালনকল্পে তিনি যখন অলক্ষিতে থাকিয়া পদ্মহস্ত প্রসারিত করিতেছেন, তখন ইহা লোকলোচনের বহির্ভূত হইতে পারে না। ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইলাম। এই কাগজের দারুণ মহার্ঘতার দিনে পত্রিকা কিরূপভাবে পরিচালনা করিব চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় আমার প্রিয় ছাত্র **শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্যসরস্বতী** আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা দেখিয়া এবং এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায় দেখিয়া, তিনি স্বইচ্ছায় "আলোচনার" সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন।

এখন নবীন কর্ম্মীর হাতে পত্রিকার উন্নতি হইবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়, বয়োবৃদ্ধ একজন রোগগ্রস্ত দুর্ব্বল কর্ম্মী অপেক্ষা নবীন উৎসাহে উৎসাহী যুবকের দ্বারা কার্য্য যে সুচারুরূপে সমাহিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গ পূর্ব্বের ন্যায় "আলোচনার" প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আমাদের সৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করুন—গ্রাহকগণের সাহায্য ভিন্ন কোন পত্রিকাই কখন স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে নাই। "আলোচনা" যে এই সুদীর্ঘ তেইশটি বর্ষ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে, গ্রাহকগণের একান্ত অনুরাগই ইহার একমাত্র কারণ।

আজ বর্ষারম্ভে জগৎকর্ত্রী মহামায়ার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং আমাদের কৃপাময় পাঠকবর্গের আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "আলোচনা" আবার দেশের সেবায় ব্রতী হইল। মা আমাদের সহায় হউন।

সম্পাদক।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

ত্রিদোষ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটির নাম ধাতু। ধাতু অর্থে যে দেহ ধারণ করে—তজ্জন্য ঐ তিনটির নাম ত্রিধাতু। আবার ইহাকে দোষও বলা যায়।

দোষ—যদ্দ্বারা দূষিত হয় তাহা; সুতরাং দেখা যাইতেছে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিকে ত্রিধাতুও বলা যায় আবার ত্রিদোষও বলা যায়।

ঐ তিনটি আমাদের শরীর বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া ধাতু সংজ্ঞা হইল। এখন দেখা যাউক ইহারা কিরূপ ভাবে আমাদের শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—

বায়ু।

প্রথমতঃ দেখা যাক বায়ুর ক্রিয়া কি,—ইহার দ্বারা শরীরের উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, চেষ্টা, মলমূত্রাদির বেগ প্রবৃত্তি, রস, রক্ত, মেদঃ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, এই সাতটির সম্যক প্রকারে গতি, ইন্দ্রিয় সমূহের পটুতা, ধারণ এবং হৃদয় ও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। এই গুলি হইল শরীরে বায়ুর ক্রিয়া এবং ইহার গুণ রজোগুণাত্মক, সূক্ষ্ম, শীতল ও রুক্ষ গুণবিশিষ্ট, লঘু ও দ্রুতগতিশীল, যোগবাহী সংযোগে অর্থাৎ পিত্তের সহিত মিলিত হইলে সংযুক্ত দাহ, আর কফের সহিত মিলিত হইলে শৈত্য ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা শরীরের যাবতীয় পদার্থ সকলকে বিভাগ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে আনয়ন করে বলিয়া এই বায়ুই ত্রিধাতুর প্রধান।

পাকাশয়, কটী, উরু, দেহাভ্যন্তরস্থ পথ সকলে, অস্থি এবং চর্ম্মে সাধারণতঃ অবস্থান করে কিন্তু পক্কাশয়ই (সচরাচর যাহাকে উদর বলে) ইহার প্রধান স্থান। আবার এই বায়ুর স্থান ও কর্ম্মভেদে পাঁচ প্রকার নাম হইয়াছে। যথা,—উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান।

উদান বায়ু—কণ্ঠে, প্রাণ বায়ু—হৃদয়ে, সমান বায়ু—অগ্ন্যাশয়ে, অপান বায়ু—মলাশয়ে; ব্যান বায়ু—সর্ব্বদেহে অবস্থিতি করে।

১। উদান বায়ু দ্বারা উর্দ্ধগত কার্য্য অর্থাৎ শ্বাস, প্রশ্বাস, বাক্যকথন সঙ্গীতাদি কার্য্য সাধিত হয়। ইহা কুপিত হইলে নানাবিধ ব্যাধি বিশেষতঃ প্রায়ই উর্দ্ধগত রোগ জন্মাইয়া থাকে।

২। প্রাণ বায়ুর দ্বারা শ্বাস, প্রশ্বাসের বায়ু ধারণ এবং খাদ্যদ্রব্য সকল উদরে প্রেরণ করিয়া দেহকে জীবিত করিয়া রাখে। ইহা কুপিত হইলে হেঁচকী, হাঁপানি, প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হয়।

৩। সমান বায়ুর দ্বারা ভুক্তদ্রব্য সকল জীর্ণ হইয়া রস, মল, মূত্রাদিকে পৃথক বিভাগ করে। এই বায়ু কুপিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, গুল্ম প্রভৃতি রোগ সমূহের উৎপত্তি হয়।

৪। অপান বায়ু মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব অর্থাৎ যে সকল অধোগমনশীল, তাহাদিগকে অধোগামী করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তিগত ও গুহ্যগত রোগ, শুক্রদোষ, প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। ব্যান বায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে রস বহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব এবং গমনাদি প্রায় দৈহিক সর্ব্ব ক্রিয়াই হইয়া থাকে। ইহা কুপিত হইলে প্রায় দেহগত রোগই উৎপন্ন হয়।

পিত্ত।

দ্বিতীয়তঃ পিত্তের স্বরূপ বলা যাইতেছে,—ইহা উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ, রজগুণাত্মক, ভেদক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ ও তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট এবং পাকে অম্লরসাত্মক। পিত্তও স্থান কর্ম্মাদিভেদে পাঁচ প্রকার। যথা,—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক।

পাচকপিত্ত—অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত—যকৃত ও প্লীহায়, সাধকপিত্ত—হৃদয়ে; আলোচক পিত্ত—চক্ষুদ্বয়ে এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বশরীরগত চর্ম্মে অবস্থান করে।

১। পাচক পিত্ত—ভুক্ত দ্রব্যাদির পরিপাক করিয়া রস ও মল, মূত্রাদি বিরেচন করে এবং অন্যান্য পিত্তের সহায়তা করে। সমস্ত পিত্তের মধ্যে এই পাচক পিত্তই প্রধান এবং ইহাকেই অগ্নি বলে। অর্থাৎ এই পিত্ত, তেজোময় এবং ইহার যে উষ্ণ তাহাই অগ্নি। এই অগ্নি (পিত্ত) বৃহৎকায় জীবে যব প্রমাণ, ক্ষীণকায় জীবে তিল প্রমাণ, এবং কৃমিকীটাদিতে বালুকা প্রমাণ অবস্থিতি করে।

২। রঞ্জক পিত্ত দ্বারা ভুক্তদ্রব্যজাত রস সকল রক্তে পরিণত হয়।

৩। সাধক পিত্ত দ্বারা বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতিশক্তির উন্মেষ হয়।

৪। আলোচক পিত্ত দ্বারা রূপের দর্শন ক্রিয়া সাধিত হয়।

৫। ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা শরীরের কান্তি জন্মাইয়া থাকে এবং প্রলেপ ও অভ্যঙ্গাদির (যেমন চন্দনাদির প্রলেপ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ অর্থাৎ মর্দ্দন) পরিপাক করিয়া থাকে।

পঞ্চপ্রকার পিত্তের মধ্যে পাচক পিত্ত বিকৃত হইলে অন্য সমস্ত পিত্তই স্ব স্ব স্থানানুযায়ী বিকৃত ভাব ধারণ করে। পিত্ত বিকৃত হইলে শরীরে নিদ্রাল্পতা, বমি, কণ্ঠ ও নাসাপাক, তিক্তাস্বাদ, মূর্চ্ছা, হস্তপদাদির দাহ, ঘর্ম্ম, মত্ততা, তৃষ্ণা, প্রলাপ, মল, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়,

শ্লেষ্মা।

তৃতীয়তঃ শ্লেষ্মাও স্থান কর্ম্মাদিভেদে পাঁচ প্রকার। ইহা শ্বেতবর্ণ, গুরু,

স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, মধুর ও তমোগুণাত্মক। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণ রসাত্মক হয়। ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, ও শ্লেষ্মণ; এই পাঁচটি শ্লেষ্মা বা কফের নাম!

ক্লেদন শ্লেষ্মা—আমাশয়ে; অবলম্বন শ্লেষ্মা—হৃদয়ে, রসন শ্লেষ্মা—কণ্ঠে, স্নেহন শ্লেষ্মা—মস্তকে এবং শ্লেষ্মণ শ্লেষ্মা—সন্ধি সমূহে অবস্থান করে।

১। ক্লেদন শ্লেষ্মা, ভুক্ত খাদ্যাদিকে ক্লিন্ন করে এবং তাহাতে খাদ্য পিণ্ডগুলি বিভিন্ন হইয়া যায় এবং অপরাপর শ্লেষ্মাদিকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়া থাকে।

২। অবলম্বন শ্লেষ্মা রস-সংযুক্ত হইয়া হৃদয় ও স্কন্ধের বল সন্ধারণ করিয়া থাকে।

৩। রসণ শ্লেষ্মা জিহ্বা ও কণ্ঠের রসজ্ঞান নির্দ্ধারণ করে।

৪। স্নেহন শ্লেষ্মা মস্তকে থাকিয়া স্নেহপ্রদান পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে।

৫। শ্লেষণ শ্লেষ্মা সমস্ত সন্ধিস্থলে থাকিয়া তৎ তৎস্থানের সংশ্লেষ বিধান করিয়া থাকে।

আমাদের শরীরযন্ত্রে বায়ু পিত্ত ও কফের কিরূপ আধিপত্য তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই ত্রিদোষের সাম্যই শরীরের সুস্থাবস্থা এবং ইহা কুপিত হইলেই আমাদের শরীরকে নানারূপ ব্যাধি প্রপীড়িত করে।

বর্ত্তমানে আমি ঐ ত্রিদোষ গুলি কেন কুপিত হয় তাহারই একটা মোটামুটী হিসাব দেখাইব।

বায়ু কুপিত হইবার কারণ। উড়ীধান, খেসারী, মটর, ছোলা, শ্যামাধান, মুগ, অড়হর, বরবটী, বনমুগ, মসুর, কোদোধান, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, শীতল, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য, অল্প ভোজন, অধিক ভোজন, অসময়ে ভোজন, অনাহার, আহারের অব্যবহিত পরেই আহার, ভারবহন, মেঘাগম, জলসন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাবস্থায়, অতিরিক্ত পথহাটা, দণ্ডাদির দ্বারা আঘাত, ধাতুক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, দৈহিক স্রোতোরোধ, অত্যন্ত মৈথুন, মলাদির বেগধারণ, অত্যন্ত বমন ও বিরেচন, অত্যন্ত কাম, চিন্তা, শোক, ভয়, বর্ষা ও শীতকাল, দিবা ও রাত্রির শেষাংশ, পূর্ব্ব বায়ু সেবন ও হিম এই সমস্ত বায়ু কোপের কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

পিত্ত কুপিত হইবার কারণ। লবণ রসাত্মক দ্রব্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও দাহীদ্রব্য, তিল, মাষ ও কুলথ কলাই, মৎস্য, মেষমাংস, গব্যদধি ও ঘোল, উপবাস, ক্রোধ,

রৌদ্রসেবন, স্ত্রীসহবাস, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ব্যায়াম, মদ্যাদিপান, ভুক্তান্নের জীর্ণবস্থায়, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ণ ও অৰ্দ্ধরাত্র সময়ে পিত্ত কুপিত হয়।

কফ দূষিত হইবার কারণ। লবণ, মধুর, অম্লরসাত্মক দ্রব্য, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, মাষকলায়, তিল, তরল দ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, শীতল দ্রব্য, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, দিবা ও রাত্রির প্রথমাংশ, আহার সময়ে, বসন্ত ও হেমন্তকালে কফ কুপিত হয়।

বাতাদি ত্রিদোষ কুপিত হইবার কারণ যেরূপ বৈদ্যকগ্রন্থে উল্লেখ আছে সেইরূপ আবার উক্ত ত্রিদোষের উপশমবিধিও উল্লিখিত আছে। এস্থলে সেই উপশম বিধিগুলি উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বায়ুর উপসম। মধুর, লবণ ও অম্লরসাত্মক দ্রব্য, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য, নস্য, নিদ্রা, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, রৌদ্রসেবন, গাত্র মর্দন, দধি, মেঘান্তকাল, তৈলাদি অভ্যঙ্গ দ্বারা কুপিত বায়ু শান্তি হয়।

পিত্তের উপসম। তিক্ত, মধুর ও কষায়রসাত্মক দ্রব্য, শীত, বায়ু, ছায়া, রাত্রি, পাখার হাওয়া, জ্যোৎস্না, মাটীর ঘর, ফোয়ারার জল, পদ্মপুষ্প, স্ত্রীলোকের গাত্র-স্পর্শ, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, সেক প্রভৃতি দ্বারা কুপিত পিত্ত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কফের উপসম। কষায়, তিক্ত, কটুরসাত্মক দ্রব্য, রুক্ষ ও ক্ষারদ্রব্য, ব্যায়াম, ধূমপান, উষ্ণ দ্রব্য, নস্য, সেক, উপবাস, তৃষ্ণা, বাসসেবন, রাত্রি জাগরণ, জল-ক্রীড়া ও স্ত্রীসহবাস দ্বারা কুপিত কফের উপসম হয়। (ধন্বন্তরী।)

মুষ্টিযোগ।

হাত-পা ফুলা।—(১) হলদে বসন্ত (দেয়ালের গায়ে জন্মে, ছোট হলদে ফুল) পাতার রস ৬ ফোঁটা ও প্রবাল ভস্ম খড়িকার ডগায় অল্প লইয়া মধুসহ মাড়িয়া খাইবে। ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে। (২) লবণ, তৈল ও লঙ্কা সেবন একেবারে পরিত্যাগ করিবে, মিষ্টও খুব কম খাইবে। (৩) হাতে পায়ে গাঁধালের তেল মালিস করিবে। (গাঁধালপাতা চারি সের, সরিষা তৈল এক সের। পাতা কুটিয়া তাহার রস বাহির করিয়া তৈলে পাক করিবে। তৈলের ফেণা মরিয়া গেলে রস দিতে হয়। গরম থাকিতে থাকিতে দুই পয়সার পানড়ি পাতা ও দুই পয়সার বুচকি দানা বা ক০চি একত্রে গুঁড়াইয়া ঢালিয়া দিবে এবং ছাকিয়া লইবে।

অম্লরোগ (যকৃতের দোষে)—(১) ছাগলের পিত্ত লইয়া তাহাতে প্রত্যেক ১০ ফোঁটায় ১০০ ফোঁটা হিসাবে স্পিরিট দিয়া হোমিওপ্যাথির ন্যায় ১x ডাইলিউসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গ্লোবিউল দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহার ৬টা করিয়া সেব্য। (২) মৌরি, যোয়ান ও গোলমরিচ সম পরিমাণ লইয়া তাহার সরবৎ। আহারে তৈল ও লঙ্কা নিষেধ। লবণ কম খাওয়া উচিত। আর একটা ঔষধ—আনসেওড়ার পাতার রস, ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৯ ফোঁটা পর্য্যন্ত শীতল জলসহ সেব্য।

কবিকুঞ্জ।

বাল্মিকী।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠায়" কি গান গাহিলে কবি!
কি করুণা মাখা হায়! আঁকিলে পবিত্র ছবি!
পিকবর কলকণ্ঠে গাহিতে না পারে যাহা—
গাহিলে হে তুমি দেব! বীণার ঝঙ্কারে তাহা।
করুণা ছানিত সুধা, মন্দাকিনী ধারা প্রায়,
চিরপূত চির-নব কি গান গাহিলে হায়!
শর বিদ্ধ বলাকার শোকোচ্ছ্বাসে মহাপ্রাণ,
অনন্ত কালের বক্ষে আঁকিলে কি চিত্রখান!
জনশ্রুতি যে কালের বার্ত্তা না বহিতে পারি,
অতীত তমস্রা হেরি বিস্ময়ে আসিত ফিরি;
সেই দূর অতীতের করুণ পবিত্র ছবি,
সত্য ঘটনার মত তুমিই দেখালে কবি।
পান করি সে যুগের অনাবিল প্রেম-সুধা,
প্রেমভরে কাঁদে দেব অনিবার এ বসুধা!
পিতার অপত্যস্নেহ, মাতার করুণাধার,
ভক্তের বিমলাদর্শ, কি মাধুর্য্য মিত্রতার!
কি কঠোর রাজধর্ম্ম, কি আদর্শ অবলার,
রসায়ন চিত্র তুমি অঙ্কিত করেছ তার।
বিশ্ববাসী আজও দেব! হয়ে যায় আত্মহারা,

সে করুণ আলেখ্য হেরি ফেলে সবে অশ্রুধারা।
অশ্রুজলে কত সুখ, কি মাধুর্য্য কবিতায়,
তুমিই দেখালে দেব! বিশ্ববাসী জনে তায়।
নমি ওহে কবিগুরু! তব পদে বার বার,
বিষ্ণু অবতার রামে হৃদে রেখ অনিবার।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

প্রতীক্ষা।

(প্রভু) জগতের মাঝে তুমি বিরাজিত, তোমারে চাইগো তাই ;
তোমা ছাড়া আর কাহারে প্রার্থিব, জগতে আর কিছুই নাই।
সবার মাঝারে জাগিয়ে রয়েছ, দেখাতে আপন মহিমা,
যেমন, অশ্রুর মাঝারে আনন্দ লুকায়ে, পুষ্পেতে যেমন সুষমা।
যেমন, গুহার মাঝারে নিবিড় আঁধার, জ্বলে না দেউটি কভু ;
দীপ সঙ্গমে আলোকিত গুহা, তোমার কৃপায় প্রভু।
জগতের মাঝে তুমি বিরাজিত, তোমারে চাইগো তাই,
তোমা ছাড়া আর কাহারে পশিব, জগতে আর কিছুই নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

আশীর্ব্বাদ।

চাই না আমি রাজা হ'তে, সাগর সেচা ধন,
চাই না আমি বিদ্যার গৌরব, চাই না প্রিয়জন।
জগত মাঝে যশের আমার নাইক' প্রয়োজন,
চাই না আমি হাসির ছটায় সুখের বরিষণ।
তোমার দেওয়া দুঃখের মাঝে, আমার দেহ-তরী—
(আমি) সকাল বিকাল অহঃরহ, বাইতে যেন পারি।
(ওগো) আমার দয়াল ঠাকুর, (এই) আশীষ কর দান ;
(যেন) ঝড়-বাদলে আমার তরী, না হয় অবসান।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

অধ্যাত্ম-গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥১

অন্বয়ঃ।—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সমবেতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত।

বঙ্গানুবাদ।—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন। হে সঞ্জয়! কৌরবেরা ও পাণ্ডবেরা ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার মানসে সমবেত হইয়া কি করিল আমাকে বল।

টীকা।—ধৃতরাষ্ট্রঃ, অন্ধকুরুরাজ—এখানে মন যিনি কর্ম্মক্ষেত্র দেহের রাজা। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, সত্ত্ব ও রজগুণ প্রধান জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্র—এখানে সুষুম্না বা ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ যোগমার্গ। মামকাঃ, আমার দল কৌরবসেনা—এখানে পাপবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ। পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবসেনা—এখানে সনাতন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল। যুযুৎসবঃ, যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত—এখানে ধর্ম্মবুদ্ধিতে ও পাপবুদ্ধিতে সংগ্রাম, মানুষে মানুষে নয়। সঞ্জয়ঃ—দিব্যদর্শন যোগের ফল।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ সাধককে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। রিপুগণকে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা দুঃসাধ্য। ভোগলালসা পরম শত্রু। এ শত্রুকে নাশ করিতে না পারিলে সাধনমার্গে উন্নতি করিতে পারা যায় না। যিনি ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং পাপবুদ্ধিকে পরিহার করিয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, দয়াবান, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পরিশূন্য, তিনি ক্রিয়া-যোগের একমাত্র অধিকারী। যে ব্যক্তি ক্রূরকর্ম্মা, খলস্বভাব, রাগ, হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অজিতেন্দ্রিয়, মিথ্যাচারী ও কপটী সে ব্যক্তি যোগের অধিকারী নহে। যিনি শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান এই ষটসম্পত্তি-সম্পন্ন, তিনি যোগী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি ঐ সকল দৈবী-সম্পদ বিবর্জ্জিত এবং আসুরীসম্পদযুক্ত, সে ব্যক্তি যোগপন্থা আশ্রয় করিবে না।

যোগের ফলে যোগীর অমানুষিক শক্তিলাভ হয়, তাহার মধ্যে দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রবণ অভ্যাসেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ। পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ দ্রোণম্ উপসংগম্য বচনম্ অব্রবীৎ।

বঙ্গানুবাদ।—সঞ্জয় কহিলেন। পাণ্ডবদের সেনা ব্যূহ দর্শন করিয়া রাজা দুর্য্যোধন গুরু দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

টিপ্পনী।—সঞ্জয়—দিব্যদর্শন, যোগক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ করিলে দূরের লোককে দর্শন করা যায় ও দূরের কথা শ্রবণ করা যায়। দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, হস্তিনার রাজা—এখানে অভিমান, বাসনা, কামনা। আচার্য্যম্, দ্রোণাচার্য্য—এখানে সংস্কার জাত বুদ্ধি। পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং, পাণ্ডবদের রচিত সেনা ব্যূহ—এখানে ধর্ম্মবুদ্ধি, দৈবীসম্পদ সমূহ।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—সাধনার নাম সংগ্রাম। সাধক সাধন সমরে প্রবৃত্ত হইলে পাপবুদ্ধির দল বা আসুরী সম্পদ সকল তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে, তাহাকে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে তখন পাণ্ডবব্যূহ বা ধর্ম্মবুদ্ধি বা দৈবীসম্পদ সমূহ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় এই চিত্র সাধকের চিদাকাশে উদ্ভাসিত হয়। বিবেক বৈরাগ্যের দল পূর্ব্বমুখী আর অভিমানী মহামোহের দল পশ্চিমমুখী। এই উভয় দলের সংঘর্ষকে সাধন সমর বলে। এই সাধন সমরের নাম ক্রিয়া। দেহকোষের পূর্ব্বভাগে সবিতৃমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। সাধনা করিতে করিতে ইহা দৃষ্ট হয়।

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

দুর্য্যোধনের পাণ্ডবব্যূহ দর্শন করার অর্থ এই সাধকের মনে অভিমান আসে, তাই সে দেখে তার সম্মুখে বিবেক বৈরাগ্যের দল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩

অন্বয়ঃ।—হে আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডবপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য।

বঙ্গানুবাদ।—হে গুরো! পাণ্ডবদের মহতী সেনা দর্শন করুন, দেখুন আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সেনাদিগকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

টীকা।—দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্ন— এখানে চৈতন্য জ্যোতিঃ। চমূং সৈন্য। ব্যূঢ়াং—ব্যূহ রচনাদ্বারা সজ্জিত।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—সাধনকালে চৈতন্য জ্যোতিদ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয় অর্থাৎ সাধনানুকূল শম-দম-তিতিক্ষা উপরতি-শ্রদ্ধা ও সমাধানে এই ষটসম্পত্তি এবং বিবেক বৈরাগ্য উত্তেজিত হয়। সেই জন্য চৈতন্য-জ্যোতি বা ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনা ব্যূহ রচনা করিয়াছে বলা হইল।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ।—অত্র যুধি ভীমার্জ্জুন সমাঃ মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ সন্তিঃ—যুযুধানঃ, বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ, বীর্য্যবান উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্রঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ, এতে সর্ব্বে মহারথাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এই যুদ্ধে পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা বিক্রমশালী ধনুর্দ্ধর বলবান অনেক বীরপুরুষ আছে। সাত্যকি, বিরাট মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ বীর কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বীর উত্তমৌজা, পরাক্রান্ত যুধামন্যু, সৌভদ্র ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ—ইহারা সকলেই মহারথ।

টীকা।—শূরা, বীরপুরুষগণ। মহেষ্বাসা, ধনুর্দ্ধরেরা। যুযুধান, সাত্যকি—এখানে শ্রদ্ধা। বিরাট—সমাধি। দ্রুপদ—অন্তর্যামিত্ব। ধৃষ্টকেতু—যম। চেকিতান—স্মৃতি। কাশিরাজ—প্রজ্ঞা। পুরুজিৎ—প্রত্যাহার। কুন্তিভোজ—আসন। শৈব্য—নিয়ম। যুধামন্যু—প্রাণায়াম। উত্তমৌজা—বীর্য্য। দ্রুপদ—তীব্রবেগ। সৌভদ্র—সংযম। দ্রৌপদেয়—পঞ্চবিন্দু।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—ধর্ম্মবুদ্ধির দল ইহাদের দ্বারা গঠিত ও পুষ্ট। সাধন সমরকে যোগক্রিয়া বলে। যোগের আটটী অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন,

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সাধক শ্রদ্ধাসহকারে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্ভব হয়, তাহাতে তাহার প্রজ্ঞার বিকাশ হয়। তখন তিনি নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পান ও অলৌকিক দৃশ্য দেখেন। কখন ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, কখন অনাহতনাদ শ্রুতিগোচর হয়; কখন চিদাকাশে তিনি জ্যোতির্বিন্দু দেখেন।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ।।৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি জয়দ্রথঃ ।।৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।।৯

অন্বয়ঃ।—হে দ্বিজোত্তম! তু অস্মাকং যে বিশিষ্টাঃ মমসৈন্যস্য নায়কাঃ ভবন্তি তান্ নিবোধ, তে তব সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। ভবান্ (দ্রোণ) ভীষ্মশ্চ, কর্ণশ্চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণশ্চ, সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ, অন্যেচ বহবঃ শূরাঃ সন্তি তে সর্ব্বে মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের দলে যে সকল মহাধনুর্দ্ধর সেনা নায়ক আছেন, তাহাদের নাম বলি শুনুন। আপনি, ভীষ্ম, রণজয়ী কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ এবং বিকর্ণ। এতদ্ভিন্ন রণক্ষেত্রে আরও অনেক বীরপুরুষ আছেন, তাঁহারা আমাদের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহারা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সকলেই সমানরূপে যুদ্ধবিশারদ।

টিকা।—দ্রোণাচার্য্য—মলিন সংস্কারজাত বুদ্ধি। ভীষ্ম—চিদাভাস, আভাস অস্মিতা, অহঙ্কার, জীবভাব। কর্ণ—কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কৃপ—অবিদ্যা। অশ্বত্থামা—কর্ম্মফল। বিকর্ণ—অকর্ত্তব্যকর্ম্ম। সৌমদত্তি—সংসার। জয়দ্রথ—অভিনিবেশ, মরণের ভয়। ভূরিশ্রবা—কর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—মলিনবুদ্ধি, মায়াজনিত অহঙ্কার, বাসনা, কামনা, সংসারাসক্তি, ভোগলালসা, কর্ম্মসংস্কার, কর্ম্মফল, পঞ্চক্লেশ—এই সকল লইয়া পাপবুদ্ধির দল পরিপুষ্ট। মনোবৃত্তিগুলি জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, কিছুতেই জীবকে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেয় না। নির্ম্মলাবুদ্ধি ব্রহ্মমুখী, মলিনাবুদ্ধি সংসারমুখী।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥১০।১১

অন্বয়ঃ।—ভীষ্মাভিরক্ষিতং অস্মাকং তৎ বলম্ অপর্য্যাপ্তং, ভীমাভিরক্ষিতং ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং) বলং পর্য্যাপ্তং। সর্ব্বেষু অয়নেষু যথা ভাগম অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু।

বঙ্গানুবাদ।—ভীষ্ম দ্বারা পরিরক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত; ভীমদ্বারা রক্ষিত, পাণ্ডবদের বল পরিমিত। আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত ব্যূহদ্বারে ভীষ্মকে সাবধানে রক্ষা করুন।

টীকা।—অপর্য্যাপ্তং, অপরিমিত। পর্য্যাপ্তং, পরিমিত। কৌরবসেনা সংখ্যা ১১ অক্ষৌহিণী, পাণ্ডবসেনার সংখ্যা ৭ অক্ষৌহিণী। এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ হস্তি, ৬৫৬১০ রথ, ১০৯০৫০ পদাতিক, যুক্তসেনা ২১৮৭০, সমুদায়ে ২১৮৭০০। সর্ব্বেষু অয়নেষু সুষুম্নানালে গ্রথিত ছয়টা পদ্ম বা চক্র।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—ভীষ্মাভিরক্ষিতং—আভাস চৈতন্যদ্বারা পরিচালিত। ভীমাভিরক্ষিতং—এখানে বায়ুতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে। চঞ্চল স্বভাবা শক্তি দ্বারা চালিত। বুদ্ধি চৈতন্য জ্যোতিকে প্রকাশিত করে। উহার প্রকাশ হইলে, উহাই আবার বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। কামনার তাড়নায় বিষয়বুদ্ধি উদ্দীপিত হইলে পরস্পর পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকে। আভাস চৈতন্য জাগ্রত থাকিলে সংসার বাসনা কোন ক্রমেই ত্যাগ হয় না।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥১২।১৩

অন্বয়ঃ।—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত সশব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ।

বঙ্গানুবাদ।—প্রবলপ্রতাপান্বিত কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত শঙ্খ বাজাইলেন। তদনন্তর

শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল হঠাৎ বাজিয়া উঠিল, তাহাতে এক মহান শব্দ সমুত্থিত হইল।

টীকা। সিংহনাদং—গম্ভীরশব্দ, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ঘন ঘন হইতে থাকিলে এই শব্দ শোনা যায়, তখন মনে হয় যেন সিংহ গর্জ্জন করিতেছে। বিনদ্য—করিয়া। শঙ্খং দধ্মৌ, শঙ্খবাদন করিলেন। তস্য, দুর্য্যোধনের। ভেরী, বড়ঢাক। পনব, মাদল। আনক, ঢোল। গোমুখ, রামসিঙ্গা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—ক্রিয়া করিতে বসিয়া সাধক যত বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকেন তত তিনি নানাবিধ শব্দ শুনিতে পান। কখন সিংহের গর্জ্জনশব্দ, কখন শাঁকের শব্দ, কখন তুরী ভেরীর শব্দ, কখন বাঁশীর শব্দ, কখন রামসিঙ্গার শব্দ শোনা যায়। শরীরের শিরা ও নাড়ীর মধ্যে বায়ু চলাচল করাতে ঐ সকল শব্দ সমথিত হইয়া থাকে।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দুইটী দিব্যশঙ্খ বাজাইলেন।

টীকা।—মহতিস্যন্দনে, বড় রথে—এখানে শিবনেত্র এক করিলে উভয় চক্ষের দৃষ্টি যে স্থানে পতিত হয়। শ্বেত অশ্বযুক্ত রথে—শুভ্র জ্যোতির্মণ্ডল। মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ—এখানে ঘন কৃষ্ণবর্ণ গোলক। পাণ্ডব, অর্জ্জুন—এখানে ভ্রমরের ন্যায় গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু। শঙ্খৌ প্রদধ্মতু, শঙ্খনাদ করিলেন।

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা।—সাধনকালে নিমিলিতনেত্রে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টিস্থাপন করিলে প্রথমে অন্ধকারময় আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়, তৎপরে শাদা জ্যোতির্ম্মণ্ডল একটু উর্দ্ধে দৃষ্ট হয়, কিছুক্ষণ পরে সেই শুভ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডল অদৃশ্য হইয়া যায়, তৎপরে গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ এক গোলক দেখা যায়। ঐ গোলকের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রে একটী উজ্জ্বল বিন্দু দেখা যায়। ঐ সমস্ত অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মন ক্রমশঃ স্থির ও একাগ্র হইয়া আসে তখন নানাবিধ ধ্বনি বা শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ।

স্মৃতির-দাগ।

(গল্প)

আমি সংসার ত্যাগী—সন্ন্যাসী, আমার জীবনে এখন অলস অপরাহ্ণ উপস্থিত! কিন্তু আর পারি না, সংসারের ছায়ান্ধকারে আপনার সঙ্গে আর খেলিতে পারি না। যে রুদ্ধ স্রোতস্বিনী এতকাল অন্তরে অন্তরে বহিতেছিল, আজ সে সাগরের ডাক শুনিয়াছি; সে অপূর্ব্ব চলোর্ম্মি লীলা—আর কি বাঁধিয়া রাখা যায়? তবে জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া মনের কথা গোপন করিতে যাইব কেন?

আজ তোমাদের কাছে জীবনের প্রথম কথা জানাইব। তোমরা সংসারী জানি, সন্ন্যাসীর নীরস কাহিনী তোমাদের ভাল লাগিবে না। কিন্তু আমি কেন সন্ন্যাসী হইয়াছি সে কথাটা তোমাদের না বলিয়া জীবন-যজ্ঞে আমি ত পূর্ণাহুতি দিতে পারিতেছি না। স্মৃতি-সরিতের প্রথম তরঙ্গ হৃদয় তটে আঘাত করিতেছে—তাই তোমাদিগকে আমার মর্ম্মকথা জানাইতে চাই।

আমি সন্ন্যাসী, আমার ব্রত ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্রে চিত্ত সংযম। হায়! এতদিন ত তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। তবে আমার অতীত জীবন মনে পড়ে কেন? কেন মনে পড়ে শৈশবের সেই সুখ স্বপ্নের মায়াচিত্র? লক্ষ জীবনের বিনিময়ে যাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, এখনও তাহার জন্য হৃদয়ের তড়িৎ কম্পন কেন?

ম্লান কুসুমের ক্ষীণ সৌরভের মত এখনও সেই অতীত স্মৃতি মনে পড়ে। সে স্মৃতি উজ্জ্বল না হইলেও—বড় মধুর। মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যামল কল্যাণ শ্রী সুবর্ণপুর গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল। আমার পিতা গ্রামের জমীদারের নায়েব ছিলেন। আমি উঁহার একমাত্র সন্তান। এক দয়াময়ী মহিলার স্নেহের স্নিগ্ধ উষায় আমার সুখের শৈশব সুধাময় হইয়াছিল। তিনি আমার মা। গ্রামে পিতার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না—না চাহিতে কুবেরের ভাণ্ডার আমার সেবায় লুণ্ঠিত হইত। দাসদাসী আমায় কোল হইতে নামিতে দিত না। অনন্তকরুণাময়ী মা আমার সকল আবদার সহ্য করিতেন। আমার কৌমার অভিধানে কেবল সুখ সৌভাগ্যের লীলা খেলায় পরিপূর্ণ ছিল। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, মাতার শুভ কামনা, মর্ত্ত্যলোকে আমার জন্য ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল।

এখনও মনে পড়ে—সেই শত সুখ স্মৃতি জড়িত পল্লীগ্রাম। মনে পড়ে সেই "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী" বাড়ীখানি। তোমরা জন-কোলাহল মুখর সহরবাসী

পল্লীলক্ষ্মীর মহিমা কি বুঝিতে পারিবে? সেই বিহগনশাস্থিত গ্রামাপথ—যেন আকাশের বক্ষে দীপ্ত ছায়াপথ, পথের দুই পার্শ্বে শাখা পল্লব বহুল বিটপী শ্রেণীর ঘন আস্তরণ নগর দৃশ্য ক্লান্ত নয়নে অতি অপূর্ব্ব। আমি সন্ন্যাসী, সুখ ভুলিয়াছি, আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিন্তু কই—সেই অমিয় সরস পল্লীবাসের কথা ত ভুলিতে পারি নাই। না—সে কথা কি ভুলিতে পারি? সে কথা যে আমার তাপ দগ্ধ প্রাণের কুঞ্জ কথা।

জগতে সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মিয়াছিলাম। পিতা আমাকে পাঠশালায় দিয়াছিলেন। আমি বড় লোকের ছেলে, পাঠাভ্যাসের কটা বিচ্যুতি দেখিলে গুরুমহাশয় কিছুই বলিতেন না। আমার কাজ ছিল—ভৃত্যের কোলে চড়িয়া একবার পাঠশালায় হাজিরা দেওয়া।

মুকুল সুরভি আম্রকাননে মধ্যাহ্ন ক্ষেপণ; রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রভাতে সহচর সঙ্গে সরসী বক্ষে সন্তরণ; শ্যামল দূর্ব্বাদলে বসিয়া সেই অস্তাচলগামী লোহিত সূর্য্যের শোভা দর্শন; চন্দ্রমাশোভিত রজনীতে দিগন্তপ্রসারী মাঠে অশিক্ষিত কৃষকবালকগণের সহিত অসংযত সঙ্গীত আলাপ। হায় রে সে "স্মৃতি" এখনও হৃদয়ে গভীরভাবে নিহিত আছে—মনে হইলে হৃদয়ের ক্ষতস্থান আবার বেদনাযুক্ত হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পিতা আমাকে গ্রামের মধুসূদন উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। যাহাতে আমার লেখাপড়া হয়, তাহার দিকে যত না লক্ষ্য হউক জলখাবারের দিকে পিতামাতার খুবই লক্ষ্য ছিল। ঠাকুর্দ্দার আমলের রামদীন নামে একজন দরোয়ান রোজই আমার জলখাবার বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত। এখানেও শিক্ষকেরা আমায় কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না কিন্তু হায়! ইহার মূলে যে একটা বিষম ভ্রান্তি লুকায়িত ছিল—তাহা পিতামাতা বুঝিতে পারিতেন না।

আমাদের বাটীর কিছুদূরে হেমন্তদের বাড়ী। সে আমার সহপাঠী ও বাল্যকালের বন্ধু। উহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাহার পিতা হরকান্ত বাবু সুদূর পশ্চিমে চাকরী করিতেন। সংসারের মধ্যে হেমন্ত তাহার পিতামাতা আর এক কনিষ্ঠা অনূঢ়া ভগ্নি—স্নেহলতা। স্নেহের বিবাহের জন্য হরকান্ত বাবুকে বড়ই ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। অর্থগৃধ্নু, শোণিত পিপাসু পাত্রের পিতা এক সহস্র রৌপ্যখণ্ডের বিনিময়ে তাহার স্নেহকে পুত্রবধূ করিতে চায়। তিনি সামান্য মাহিনা পান—এত অর্থ তাহার পক্ষে যোগাড়

করা সাধ্যাতীত। তবে একটা ভরসা, স্নেহের রূপ ছিল গুণ ছিল; একাধারে সে লক্ষ্মী সরস্বতী; একাধারে সে গঙ্গা-যমুনা। সে ভঙ্গীতে চপলতা নাই—ধীর, শান্ত। যখন সে পিতার পত্র পাইত এবং সেই পত্রের অক্ষরে অক্ষরে তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস ব্যথাপূর্ণ কথাগুলি পড়িত তখন সে একটা অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিত।

সে ভাবিত হায়! তাহাকে লইয়া পিতামাতার কত কষ্ট—কত যন্ত্রণা; তাহারই জন্য তাঁহাদের সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার ভাবিত—হায়! সে যে বালিকা, তাহার যে কোন ক্ষমতা নাই। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

হেমন্তের মুখে সর্ব্বদাই অনেক দুঃখের কাহিনী শুনিতাম, প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। তাহার মাকে "কাকীমা" বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বিবাহের কথাবার্ত্তার পর হইতে স্নেহ বড় বেশী আমার নিকটে আসিত না। কাকীমা প্রায়ই বলিতেন "স্নেহ! বিমল তোর দাদা হয়, ওর কাছে আ'সতে বা কথা কইতে লজ্জা কি মা?" আমারও কি জানি কেন তখন তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিত। তাহার সেই নির্ম্মল অথচ করুণায় ঢল ঢল মুখখানির দিকে চাহিতে পারিতাম না, একটা সঙ্কোচ আসিত। কিন্তু হায়! সে একদিন আমার সঙ্গী ছিল, কত খেলা ধূলার মধ্যে বাল্য-জীবন কাটিয়াছিল। সে সব কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি।

গ্রামের নিকটে একটী শীর্ণকায়া নদী ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইত। সকলেই উহাতে স্নান ও উহার জলপান করিত; সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িতেন, তখন আমি আর হেমন্ত প্রায়ই সেই নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম। সে সব দিন আজ কোথায়?

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসিয়া নিজের পড়ার বই পড়িতেছিলাম। পড়া নাম মাত্র—বাবার ভয়ে! এমন সময় মা এসে হাসতে হাসতে বল্লেন—"বিমল একটা কথা শুনেছিস্?" আমি বলিলাম "কি কথা মা?" তিনি বলিলেন—"কাল নদীতীরে হেমন্তর মার সঙ্গে দেখা—তিনি অনেক কথা বল্লেন। আহা! তিনি স্নেহের বিয়ে নিয়ে বড়ই ভাবনায় পড়েছেন; কথায় কথায় বল্লেন—বলতে সাহস হয় না দিদি—তোমরা বড়লোক! স্নেহকে যদি দয়া করে পুত্রবধূ কর, তাহলে আমাদের বড়ই উপকার হয়। এই কথা বলে তিনি অনেক কাকুতি

মিনতি কল্লেন। তা' ওঁকে আজ এ কথা বলেছিলুম—উনি ত শুনেই চটে গেলেন। বাল্যবিবাহের প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত; বল্লেন—তোমায় নিয়ে আর পাল্লুম না, ভেতরে ভেতরে বুঝি তোমাদের এই মতলব হচ্ছে, বিমলের এই বয়েস। এখন থেকেই তা'র বিয়ে দেবার চেষ্টা! লেখা পড়াটা তার মাটী কর্ত্তে চাও। আমি বিমলকে বারণ করে দিব—যেন সে আর ওদের বাড়ী না যায়।" মা চুপ করলেন। আমি বল্লাম—"ওদের অপরাধ কি? তুমি যত সব কাণ্ড বাধালে। কেন তুমি ওর কথা বাবাকে বলতে গেলে?" আমার বড় দুঃখ হইল। হায়! এতদিন পরে আমার ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে। এতদিনের ভালবাসা একটী কথায় সব দূরে চলে যাবে। মা আর কিছু না বলে চ'লে গেলেন।

তারপর দিন সকাল বেলায় স্কুল যাবার আগে বাবা ডেকে বল্লেন—"বিমল! তুমি হেমন্তদের বাড়ী যেও না, আমার নিষেধ।" আমি যেন কিছুই জানি না এইরূপ ভাণ করে বলিলাম—"কেন বাবা?" তিনি দৃঢ়স্বরে বল্লেন—"তুমি ছেলেমানুষ সে সব শুনে কাজ নেই, আমি তোমায় যেতে বারণ কচ্ছি—তুমি ওদের বাড়ী যাবে না—যাও স্কুল যাও।"

বড় কষ্টে—বড় দুঃখে প্রাণের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্কুলে গিয়া হেমন্তকে কোন কথা বলিলাম না—আহা! সে বড় মনে ব্যথা পাবে। কাকীমা আমায় বড় ভালবাসেন তিনি যখন এ কথা শুনবেন—তাঁ'র বড়ই কষ্ট হবে, স্নেহ যখন শুনবে—আর ভাবিতে পারিলাম না—মনকে ফিরাবার জন্ত পাঠে মনোযোগ দিলাম! কিন্তু হায়! পুস্তকের প্রত্যেক কথা যেন তিক্ত ঔষধের মত বোধ হইতে লাগিল। শিক্ষকের নিকট ছুটী লইয়া বাহিরে গেলাম।

জ্যৈষ্ঠমাস। দু' চার দিন পরে আমার গ্রীষ্মের ছুটী হইবে। আমার শরীর ভাল ছিল না—জ্বর হইয়াছিল তজ্জন্ত স্কুলে যাই নাই, বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলাম। এমন সময় দেখি হেমন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার সামনে উপস্থিত। মুখে চোখে একটা আতঙ্ক—একটা উদ্বেগ! আমি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি খবর হেমন্ত? আজ স্কুলে যাওনি কেন?"—সে কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লে—"সর্ব্বনাশ! স্নেহকে বুঝি বাঁচাতে পাল্লুম না। আজ সকাল থেকে ভেদ-বমি হচ্ছে, ক্রমে অবস্থা খারাপ!" সে আর বলতে পাল্লে না—কেবল কাঁদতে লাগল! আমার মাথার ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পিতার নিষেধ নিমেষে ভুলিয়া গেলাম, প্রাণ কেঁদে উঠলো।

হেমন্তদের বাড়ী গিয়া দেখি—তাহার মা বড়ই কান্নাকাটি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আরও বেশী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—কাকীমা! যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ, কান্নায় কোন ফল নেই, বুক বাঁধুন। এখন যা' [illegible] তার চেষ্টা [illegible] চেষ্টা আর [illegible] মুহুর্ত [illegible] বাঁচা' [illegible] পারি। হেমন্ত আমার পার্শ্বে দাড়াইয়াছিল, সে মাপাঙ্গ [illegible] হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, এখানে এ রকম করে দাঁড়িয়ে থা'কলে কি হবে? মেয়েটা যাতে বাঁচে তা'র চেষ্টা করতে হবে ত?" সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা' ত' হবেই কিন্তু আমার যে ভাই হাত পা নড়ছে না।"

আমাদের গ্রামের প্রায় একমাইল দূরে হরিমোহন বাবুর বাড়ী। ইনি একজন ডাক্তার। হাতযশ মন্দ নয়—যদিও তিনি কখনও চিকিৎসা বিদ্যালয়ে পড়েন নাই, তথাপি ভাগ্যগুণে তাঁহার বাড়'তে কমলা বেশ বাঁধা ছিলেন।

যখন আমরা তাঁহার বাড়ীতে পৌছিলাম তখন অপরাহ্ন। ভাগ্যগুণে তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। আমরা সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনারা যান, আমি এখুনি যাচ্ছি।" আমি বলিলাম—"ঔষধের হাত বাক্সটা দিন, আমরা নিয়ে যাচ্ছি।" তিনি বলিলেন—"না, আপনাদের আর কষ্ট ক'রে নিয়ে যেতে হবে না।" আমরা কাজে কাজেই উঠিলাম। এক মাইল রাস্তা আসিতে আমাদের যেন একযুগ বলে বোধ হইয়েছিল। আমি বলিলাম—"হেমন্ত, আমার প্রাণে ভাই বড়ই আতঙ্ক হচ্ছে, না জানি গিয়ে কি দেখবো।" সে ম্লান হাসি হেসে বল্লে- "হাঁ ভাই খারাপ জিনিষটা আগে মনে জাগে, আমারও ভাই বুকটা বড় দুরু দুরু কচ্ছে।

সমস্ত দিনরাত রীতিমত ঔষধ ও পরিচর্য্যার গুণেই হউক—কি ভগবানের অপার মহিমাতেই হউক, স্নেহের অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল। আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হৃদয় থেকে একটা যেন গুরুভার নেমে গেল। কাকীমা বল্লেন—"বাবা বিমল! তোমার যত্নে ও শুশ্রূষায় আজ আমরা স্নেহকে ফিরে পেলুম, ওকে যে ফিরে পাব সে আশা আমার ছিল না।" স্নেহ অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "হাঁ মা! বিমলদাদার যত্নে আজ আমি বেঁচে গেলুম।" আমি হর্ষভরে বলিলাম,—মা স্নেহ! ভগবানই তোমায় বাঁচিয়াছেন, আমাদের ক্ষমতা কি?" ইহা বলিয়া তাহাকে একদাগ ঔষধ সেবন করাইলাম। কাকীমা

বলিলেন—"বাবা বিমল, তুমি আমাদের জন্ম যে কষ্ট করেছ, তা আপনার লোকও অত করে না। তুমি আমাদের ছেলের মতন—তোমাকে কি আর আশীর্ব্বাদ করবো—ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন, ধর্ম্মে অচলা মতি হোক্! আহা! না জানি বাবার আমার কত কষ্ট হ'য়েছে, হেমন্তের মুখে শুনলুম, বাছা আমার খবর পেয়েই জ্বরগায়ে ধুকতে ধুকতে এসেছে। আমি বলিলাম—"কাকীমা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে, এখন একটুও জ্বর নেই—ঠিক সেই সময়ে রামদীন আসিয়া উপস্থিত—আমাকে দেখিয়া বলিল—"খোকাবাবু! তুমি এখানে? বাবা মা যে বড়ই ভাবছেন! কাউকে না বলে জ্বরগায়ে চলে আসায় কর্ত্তা একেবারে আগুন হ'য়ে গেছেন।" আমি তাহাকে সব কথা বলিলাম। সে বলিল—"তুমি কাল দুপুরবেলায় চলে এসেছ—সে পর্য্যন্ত তুমি আর বাড়ী যাওনি।" কাকীমা বল্লেন—"তোমার বাবুকে সব বুঝিয়ে বলবে যে খোকাবাবু আমাদের বাড়ীতে ছিল।" সে বল্লে—"মা আমি ত সব বল্‌বো—কিন্তু কর্ত্তাবাবু যে রকম রেগেচেন, না জানি আজ আবার কি হয়!" আমার বড় ভয় হইল, কারণ আমি বাবার স্বভাব খুব ভালরূপই জানিতাম—তা আবার বারণ সত্ত্বেও এখানে এসেছি; তিনি যখন ভাল থাকেন তখন সদাশিব, কিন্তু রাগিলেই অস্থির। আমি বল্লুম—"রামদীন! তুমি যাও, আমি এখুনি যাচ্ছি।" স্নেহ সব কথা শুনিতেছিল, অতি ধীরে ধীরে বলিল—"বিমলদা তুমি বাড়ী যাও, আমার জন্ম না জানি তুমি কতই বকুনি খাবে।"

বাড়ার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বুকের ভিতর ভয়ে গুরু গুরু করিতেছিল। দরজা ভেজান ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলিলাম। বড় ভয় করিতে লাগিল, আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কেমন ক'রে বাড়ীর ভিতর যাই! বড়ই মুস্কিলে প'ড়লাম, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল; যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়, সম্মুখে স্বয়ং পিতা! বাবাকে দেখেত আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। পায়ের তলার জমিটা যেন বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো। তিনি চীৎকার ক'রে বল্লেন—"পাজি! কাউকে কিছু না ব'লে ওদের বাড়ী যাওয়া হয়েছিলো—ওদের বাড়ী যেতে বারণ করেছিলুম না?" আরও অনেক বকলেন। বড়ই মর্ম্মান্তিক হইল। চীৎকার শুনে মা আমায় সেখান থেকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন—"আমায় ব'লে যেতে হয় বাবা! আমি সব ঢেকে নিতুম। তোর বরাতে যা' ছিল—তা হ'য়ে গেল।"

এই ঘটনার পর অনেকদিন হেমন্তদের বাড়ী যাইনি। যাবার ইচ্ছা থাকলেও

পারিনি—পাছে আবার বাবা টের পান। হেমন্তর মুখে সব খবর পেতুম। স্নেহ এখন বেশ ভাল হ'য়ে গেছে।

একদিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় স্নেহের সঙ্গে দেখা—সে বাগান হইতে আসিতেছিল; আমায় দেখে বল্লে—"এই যে বিমলদা! তুমি আমাদের ওপর রাগ করেছ, কতদিন এখানে আসোনি।" লজ্জায় আমার মুখ লাল হইয়া গেল। আমি বলিলাম—"স্নেহ আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না, বাবা বলেছেন যদি তোমাদের বাড়ী যাই তাহ'লে আমায় বাড়ী ঢুকতে দিবেন না।" এই কথায় স্নেহের হাসিভরা মুখখানি শ্রাবণের আকাশের মত সহসা ভারি হইয়া উঠিল, চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া গেল। আমার বড়ই কষ্ট হইল—হায়! আজ তার প্রাণে ব্যথা দিলাম। ধীরে ধীরে সে বলিল—"বিমলদা সব জানি আমার জন্য যত তোমার দুঃখ—আমার জন্যই যত বকুনি খেয়েছ আমায় ক্ষমা কর বিমলদা! মা সেদিন কত দুঃখ কচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে—" আর কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সে বলিল না, চলিয়া গেল। বুকের ভিতর বড়ই ব্যথা পাইলাম।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখি মার বড় জ্বর, বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। আমি মার কাছে গিয়া বসিলাম—গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম—বড় উত্তাপ, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তিনি অঘোরে পড়ে আছেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"এই দুপুরবেলায় জ্বর হয়েছে। আজকে, আর ডাক্তারের দরকার নেই। অনেকদিন পরে জ্বর হয়েছে—কিছুদিন বোধ হয় ভোগাবে।'

তার পর দিন সকালবেলায় মায়ের জ্বর একটু কম বোধ হইতে লাগিল। বুঝিলাম ইহা আপন হইতে যাইতে পারে, সামান্য সর্দ্দিজ্বর। মা আমায় কাছে বসিয়ে বল্লেন—"বড় সর্দ্দি বাবা! মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে।" আমি বলিলাম—"মা! বলেনত' ডাক্তারকে খবর দিই, একটা ঔষধের ব্যবস্থা করে দিলেই অনেকটা ভাল হবেন।" তিনি বলিলেন—"না, ঔষধের আজ দরকার নেই। তুমি এখন স্কুলে যাও বাবা, আবার বেলা হয়ে যাবে।

স্কুলে যাইয়া দেখি হেমন্ত আসে নাই। শুনিলাম, সে ট্রান্সফর সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করেছে। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম আর এখানে অন্য স্কুল নাই, যে সে ভর্ত্তি হইবে। তবে কি সে অন্য স্থানে পড়িবে? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—উদ্বেলিত জলরাশির ন্যায় মনটা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। তবে কি হায়! এতদিন পরে সে

আমার কাছ থেকে সরে যাবে! মনটা বড়ই খারাপ হইল। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম আজ একবার লুকিয়ে হেমন্তদের বাড়ী যাইব। বইগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে একটা অছিলায় ছুটী চাহিলাম, তিনি ছুটী দিলেন। বাড়ীতে পা দিলেই কাকীমার সঙ্গে দেখা। তিনি অতি দুঃখের সহিত বলিলেন—'বিমল! এতদিন পরে গরীব কাকীকে মনে হলো বাবা?' আমি বল্লাম—"কি করবো কাকীমা! সবইত শুনেছ। হেমন্ত কোথায় কাকীমা? আজ স্কুল যায়নি কেন?" তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বল্লেন—কোথায় বেরিয়েছে, আর বাবা এখানে এতদিন বাস কচ্ছি এবারে এ দেশ ছাড়তে হ'ল। তুমি বোধ হয় শুনেছ, হেমন্ত ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করেছে।" আমি ম্লানমুখে বলিলাম—"হাঁ—কাকীমা! কি ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।" তিনি বলিলেন—"সেখান থেকে বদলী হ'য়ে গেছেন, কাল চিঠি দিয়েছেন ২।৩ দিনের মধ্যে আমাদের সব সেখানে যেতে হবে। তাঁর বড়ই অসুবিধা হচ্ছে, এই দেখনা চিঠি"—পাশের জানালা হইতে চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন। সব পড়িলাম—প্রাণটা যেন হু হু করে উঠলো। কাকীমা বলতে লাগলেন—"আর বাবা সব জানত, স্নেহের বিয়ের জন্যে রাত্রে ঘুম হয় না—বয়স দিন দিন বাড়ছে, আর ঘরে রাখা যায় না, বড় আশা ছিল স্নেহকে তোমায় দেবো—কিন্তু ভগবান সে আশায় বঞ্চিত করলেন।" কাকীমা আর কিছু বলিলেন না—অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন। অদূরে স্নেহ বসিয়া ছিল, সে বিষাদ প্রতিমার মত সেখান হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। আমার প্রাণের ভিতর যেন দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লুম—"কাকীমা কিছু ভাববেন না, অবশ্য ভগবান দিন দেবেনই! তবে আসি কাকীমা সন্ধ্যা হলো।" ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম।

দশদিন কাটিয়া গেল তবু মায়ের জ্বর কমিল না, বরং রোগ যেন দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তার বলিলেন—এ পীড়া শীঘ্র সারিবার নহে, রোগীর অনেক ভোগ আছে।

দিনরাত জাগিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে মায়ের সেবা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, একদিন শেষরাত্রে মা আমাদের কাঁদাইয়া কোন অজানিত স্থানে চলিয়া গেলেন। আমরা এত করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম—সমস্ত আশা ভরসা সুখ শান্তি মায়ের সঙ্গে চলিয়া গেল।

সময় কাহার ও জন্য অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে দুইটী বৎসর অতীত হইয়া গেল। সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হইল; এক মার বদলে আবার আর এক মা পাইলাম। কিন্তু হায়! তেমন সুখ শান্তি পাইলাম না। যে বিটপীর ছায়ায় এতদিন অবস্থান করিতেছিলাম, হঠাৎ কালের ইঙ্গিতে সেও ভূমিসাৎ হইল। বলা বাহুল্য—লেখাপড়া ছাড়িলাম। আর ভাল লাগিল না, ক্রমে বিমাতার ব্যবহার ও পরিচয় পাইলাম—প্রাণে বড়ই দুঃখ জন্মিল। হৃদয়টা একটা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহের কথা যখনই মনে পড়িত, তখন প্রাণটা আরও ব্যাকুল হইত—তাহারা অনেকদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, কোথায় যে গিয়াছে তাহাও জানি না। হায়! পিতারও আর আমার প্রতি তেমন যত্ন নাই, মমতা নাই।

কি করিব—হায়! নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতাম—নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া যাইত। আর সহ্য করিতে পারিলাম না—সংসার বড়ই বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। শেষে একদিন বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম। এত ধন সম্পত্তির মায়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলাম—ভাগ্যগুণে সাধুসঙ্গ পাইলাম। তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন হইল আমি আর একটি সাধু এই সহরে আসিয়াছি। সেদিন পূর্ণিমা—পৃথিবী একটা শুভ্র বসন পরিয়া হাসিতেছিল। সাধু একটা শ্মশানের নিকটে বসিয়া আমায় অনেক উপদেশ দিচ্ছিলেন। অদূরে শ্মশানের চিতাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ শ্মশানের কিছু-দূরে একটা কোলাহল শুনিতে পাইলাম। একটু পরে দেখিলাম কতকগুলি লোক হরিবোল দিতে দিতে একটি শবদেহ লইয়া আসিল—উহা একখানি সাদা কাপড়ে আবৃত ছিল এবং ফুলের মালাসকল শবের উপরে শোভা পাইতেছিল। শববাহী লোকের মধ্যে হেমন্তকে দেখিতে পাইলাম! প্রাণটা একটা অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করি কিন্তু পারুম না, কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল। হেমন্তের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হইল—কিন্তু সে আমায় চিনিতে পারিল না।

চিতা প্রস্তুত হইল—একব্যক্তি শবের মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। যাহা দেখিলাম—তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—আমি বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এ যে স্নেহ! ভগবান, শেষে শ্মশানে দেখা করিয়ে দিলে?

সাধু বলিলেন—"বৎস! তোমার একি হইল?" হেমন্ত আমার কণ্ঠস্বরে

চিনিতে পারিয়া আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলে এ ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সোনার প্রতিমা স্নেহকে সকলে মিলিয়া চিতায় তুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সোনার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। আমার মাথা বড়ই ঘুরিতে লাগিল, হেমন্তকে কি বলিতে যাইতেছিলাম, বলিতে পারিলাম না—অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না—যখন জ্ঞান হইল, দেখি হেমন্তর কোলে শুইয়া আছি—তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু, আমার বুক ভাসাইয়া দিতেছে।

তারপর—তারপর! আর আমার কিছু বলিবার নাই—এইখানে আমার কাহিনী শেষ হইল। যতদিন বাঁচিব ততদিন এই স্মৃতি নিয়ে থাকিতে হইবে। বোধ হয় এ দাগ আর জীবনে মুছিবে না—যদি মুছে ত জীবনের পরপারে যাইয়া মুছিবে—আমিও শান্তিতে কাটাইতে পারিব।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

প্রশ্ন।

১।

সভা করি বসিয়াছে, দেব চারিজন।
তিন পেট, পাঁচ পদ, কর নিরূপণ॥
নয় গোটা মুণ্ড তাঁদের, বাহু চৌদ্দখান॥
উনিশ লোচন আর অষ্টাদশ কান॥

২।

সর্ব্বস্থানে আছি আমি, যেথা তুমি যাও।
গেলে কিন্তু কিছুতেই ফিরে নাহি পাও॥
মোর কাছে সকলের সম অধিকার।
ধনী বা দরিদ্র হও, নাহিক বিচার॥
আমার মাহাত্ম্য যেবা বুঝিবারে পারে।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ দিতে পারি তারে॥
বুঝিতে না পারে যেবা রিষ্ট হই তার।
জীবন কাড়িয়া লই করহ বিচার॥

৩। একটি নাতিদীর্ঘ করুণ-রসাত্মক কবিতা লিখুন।

সাধক কবি তুলসীদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম-কথা।

বান্দাজেলার অন্তর্গত যমুনাতীরবর্ত্তী রাজাপুর গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে একঘর ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীর বয়স কিছু বেশী হইলেও তখন তাঁহারা জরা-বার্দ্ধক্যের কবলস্থ হন নাই; অথবা জরা-বার্দ্ধক্য তখন সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারিত না। এখন যেমন স্ত্রীলোক কুড়ি হইলেই বুড়ি, আর পুরুষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া রুগ্ন হইয়া পড়ে; কিছুদিন ঐরূপ পীড়া ভোগ করিতে করিতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহা হইত না, তাহার কারণ, তখন দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, অতি অল্প বয়স হইতেই মানুষকে সংসার চিন্তায় এত অস্থির হইয়া পড়িতে হইত না। ভারতের কোথাও ভাত-কাপড়ের কষ্ট কাহাকেও ভোগ করিতে হইত না; সংসার কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া কাহাকেও এখনকার মত এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না।

এখন সংসারের চিন্তা অত্যাধিক বাড়িয়াছে, বলিয়াই মানুষকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; দুর্ব্বিসহ চিন্তায় জর জর হইয়া মানুষ অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে, অকালবার্দ্ধক্য তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। চিন্তার তুল্য ব্যাধি কি আর কিছু আছে?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বান্দাজেলা হিন্দুস্থানী প্রধান দেশ। আমরা যে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা সরোজপারী, পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ; শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ব্রাহ্মণের নাম আত্মারাম দিবেদী এবং ব্রাহ্মণীর নাম ছিল—হুলসী দেবী। এতাধিক বয়স হইলেও, তখনও তাহাদের কোনও পুত্রাদি হয় নাই। সংসারে পুত্রকন্যা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র শোভা হয় না; সে সংসারে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ উপভোগ করিতে হয়। আত্মারাম ও হুলসী দেবী ধর্ম্মোপার্জ্জনে পরম আনন্দ লাভ করিলেও পুত্রকন্যার বিহনে সময়ে

সময়ে বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন। সংসারে অনাটন কিছু নাই; ধর্ম্মকর্ম্মেও তাঁহারা কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে আনন্দের দুলাল দুই একটি পুত্রকন্যা খেলা করিয়া বেড়াইলে অতীব শোভার আস্পদ হইত; তাঁহাদের সংসারে এইটিরই অভাব ছিল! এবং এই অভাবই সদানন্দময় পতি পত্নীকে সময়ে সময়ে ম্রিয়মান করিয়া রাখিত! পুত্রকন্যা হইবার বয়স প্রায় অতীত হইল, তথাপি সংসারের সাররত্ন তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না, শ্রীরামজী বোধ হয়, এ জন্মে তাঁহাদের মনোবাসনা পুর্ণ করিলেন না, এই দুঃখই তাঁহাদের প্রাণে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিত, তাহা ছাড়া পতিব্রতা তুলসী দেবীকে ও শ্রীরামগত প্রাণ আত্মারামকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহাদের উভয়কে দেখিলে আনন্দের পুর্ণমুর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। স্বধর্ম্মনিরত পতি পরায়ণ ব্রাহ্মণদম্পতী সমস্ত দিবস ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিয়া অপরাহ্ণে আহারাদি করিতেন—অহোরাত্র রাম গুণ গান করিয়া তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত, বৃথা কাজে তাঁহারা কখন ব্যাপৃত থাকিতেন না। এই আদর্শ ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে রাজাপুর গ্রামের সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, সকলেই তাঁহাদের অনুজ্ঞা সসম্ভ্রমে প্রতিপালন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত।

ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিলে, ঈশ্বর চিন্তায় সর্ব্বদা মতি রাখিতে পারিলে তাঁহাদের দৈহিক জ্যোতিঃ ও মানসিক স্ফুর্ত্তি যেরূপ লাভ হয়, রাজ-ভাণ্ডারের অতুল ধনসম্পদেও তাহার কণিকামাত্র পাওয়া যায় না। রাজার আনন্দ—ভোগমূলক, আর ধার্ম্মিকের আনন্দ—ত্যাগমূলক—অতএব পার্থক্য অনেক। আত্মারাম ও তুলসী দেবীকে দেখিলে, তাঁহাদের সেই তেজপুঞ্জ, তপঃক্লিষ্ট দেহের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে, সাক্ষাৎ দেবদম্পতী বলিয়া অনুমিত হইত, হঠাৎ দর্শন করিলে তাঁহাদের পদে স্বতঃই মস্তক নত হইয়া পড়িত, জোর করিয়া কিছু করিতে হইত না। ধর্ম্মের এমনি প্রভাব, ধার্ম্মিকের এমনি আকর্ষণী-শক্তি।

ধার্ম্মিকের কিছুরই অভাব থাকে না। অদৃষ্ট মন্দ হইলেও, কর্ম্মফলে তাহার মন্দ গঠন হইলেও, সাধক উৎকট তপস্যায় তাহা খণ্ডন করিতে পারেন। সকলেই মনে করিয়াছিল;—পুত্রমুখ নিরীক্ষণ এ দেব-দম্পতীর ভাগ্যে বুঝি নাই। ইঁহাদের অবর্ত্তমানে বুঝি ভগবান এ পবিত্র বংশের বিলোপ সাধন করিবেন। কিন্তু সাধকের সাধনার ফল কি ব্যর্থ হইতে পারে? আত্মারাম ও তুলসী দেবীর মনোবাসনা অপূর্ণ রহিল না; সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য আকাঙ্খা করিতেন, ভগবান এতদিনে তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন।

তুলসী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ভক্তচূড়ামণি তাঁহার গর্ভকোষে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই স্বপ্নদর্শনের পর একদা তিনি শুভ মুহূর্ত্তে গর্ভ ধারণ করিলেন, দেখিয়া রাজাপুর গ্রামের সকলেই খুসী হইল। দ্বিবেদীর বংশ রক্ষা হইলে, গ্রামের অনেক উপকার হইবে। এমন ধার্ম্মিক দম্পতীর পুত্র হইলে সে নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক হইবে, উত্তরকালে এ গ্রামে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইবে না, বলিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। নিজে ভাল হইলে তাহার দুঃখে বা সুখে সকলেই এইরূপ অংশভাগী হইয়া থাকে।

কিন্তু জানি না, ভগবান কি অভিপ্রায়ে এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াও কেন এরূপ অকৃপা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরীক্ষা যে পদে পদে; সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি যে পদে পদে বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। দৃঢ়ব্রত না হইলে কি তাঁহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়? আত্মারাম পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে কি জানি কি ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ নিরানন্দ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আত্মারাম তাহা প্রকাশ করিলেন না। নানাপ্রকার ধর্ম্মভাবে পত্নীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। আত্মারামের গুরুদেব নৃসিংহ দাস গোস্বামী জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনিও শিষ্যের এবম্বিধ সৌভাগ্যে আনন্দিত হইলেন, প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। গুরুই ত জীবের ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর, গুরুইত পরমপদ, তখন ত প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এইরূপ পরম দেবতার আবির্ভাব হইয়া হিন্দুসংসার উজ্জ্বল করিত, জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ দেবকল্প, ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণই তখন সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিত, ইহপরকালের কর্ত্তা, ভবার্ণবের নাবিক ছিল। হায়! এখন তাহার স্থানে ভোগের প্রতিমূর্ত্তি রাক্ষস সকল তাণ্ডবনৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হিন্দু-সংসারকে স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকে পরিণত করিতেছে।

একদিন শুভ মুহূর্ত্তে তুলসী দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজাপুর গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। নৃসিংহদাস আসিয়া পঞ্জিকা দৃষ্টে গণনা করিলেন, মূলা নক্ষত্রের প্রথম চরণে পুত্রের জন্ম হইয়াছে বলিয়া উহা পিতামাতার প্রতিপাল্য নহে, শাস্ত্রানুসারে উহাকে ত্যাগ করাই ধর্ম্মসঙ্গত। গুরুদেবের মুখে এই নির্ঘাতবাক্য শুনিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল; আত্মারাম পরম ধার্ম্মিক, ধর্ম্মের জন্য তিনি নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এ সদ্যোজাত শিশু ত কোন ছার! আত্মারাম গুরুর আদেশে পুত্রকে পরিত্যাগ

করিলেন। কিন্তু তাহাকে একেবারে নয়নের অন্তরালে বিসর্জ্জন করিতে হইল না। শিশুকে পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াই নিষেধ; এই জন্য ভক্ত-দম্পতীকে নৈরাশ্য সাগরে নিমজ্জিত না করিয়া গুরুদেব বলিলেন—"বৎস! পুত্রটিকে একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি উহাকে লইয়া প্রতিপালন করিতেছি; তোমরা প্রত্যহ উহাকে দর্শন করিয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিও, তাহা হইলে আর প্রাণে কোন প্রকার অসন্তোষ আসিতে পারিবে না—অনায়াসে একনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিবে, মন আর চঞ্চল হইবে না।" ধর্ম্মপ্রাণ আত্মারাম তাহাতে কোন দ্বিধাবোধ করিলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে গুরু-বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তুলসী দেবী এতক্ষণ গুরুদেবের মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়ই কাতর হইয়াছিলেন; হায়! দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া, এই বৃদ্ধবয়সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবশেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে লালন পালন করিতে পাইব না; তাহাকে দেখিতে পাইব না, জীবন্ত শিশুকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে? কোন্ রমণী এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, না হয়, প্রাণ যাইবে তাহাতে ক্ষতি কি? শিশুকে ত্যাগ করিতে হইবে, আর দেখিতে পাইবে না, শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ছটফট্ করিতে ছিল। সোনার শিশুটিকে কোলে করিয়া এতক্ষণ তিনি অরুন্তুদ রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছিলেন; মনে করিতেছিলেন—এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি, ধর্ম্মত্যাগ করি, কি পুত্রকে ত্যাগ করি? আবার মনে ভাবিতেছিলেন—আমার না হয়, যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ইহাতে আমার স্বামী দেবতার যদি কোন অমঙ্গল হয়; এই ভাগ্যহীন শিশুকে লইয়া যদি তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইয়া পড়ে, তুলসী দেবী প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমন সময়ে নৃসিংহ দেবের শ্রীমুখে উক্ত প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, গুরুগৃহে পুত্রকে অহরহঃ দেখিতে পাইবেন, ভাবিয়া মন আশান্বিত হইল। আত্মারাম যখন গুরুসহ আসিয়া পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন এবং সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, তখন তিনি. দুঃখে ও আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীহস্তে প্রাণের পুত্রকে প্রদান করিলেন।

নৃসিংহ দাস শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পুত্রটি গুরুদেবের যত্নে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রটি যখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, নৃসিংহদাস তখন তাহার অন্নপ্রাশন

কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নাম রক্ষা করিলেন—তুলসীদাস। * এই বালক কালে শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন, মহাকবিরূপে সাধনার উচ্চস্তরে সমারোহণ করতঃ হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

বালক তুলসীদাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতামাতার ইচ্ছা-ক্রমে গুরুদেব তাহাকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পিতামাতা যদিও তাহাকে প্রতিপালন করিতেন না, তথাপি নৃসিংহ দাস তুলসীদাসের প্রাণগতিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন সময়ে আত্মারাম ও হুলসী দেবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পাছে তাঁহারা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কোন বিষয় পাছে তাঁহাদের মনোমত না হয়, এই জন্য তিনি সকল বিষয়েই শিষ্য দম্পতীর মতামত না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। আত্মারাম বলিতেন—প্রভু! তুলসীদাসের উন্নতি-অবনতির ভাব সমস্ত আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন—তাহাই করিবেন। আমরা যখন আপনার পদানত দাস, আমাদের ইহপরকালের যাবতীয় ভার যখন আপনার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; তখন আমাদের পুত্রের জীবনোপায় আপনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে ভাল ব্যতীত মন্দ হইবে না। সে বিষয়ে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে—তাহাই করিবেন। নৃসিংহ দাস কিন্তু তাহা শুনিতেন না, তিনি বালকের সকল কার্য্যেই তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন।

তুলসীদাস পিতামাতার ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেনই। গুরুরও সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নৃসিংহদাস মুক্তপুরুষ হইয়াও অবশেষে এই বালকের মায়ায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিলার্দ্ধ না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না, মায়ামুক্ত নৃসিংহ ক্রমশঃ বালকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যোগ তপস্যা সমস্ত একবারে বিস্মৃত হইয়া অনন্ত চিন্তায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস কোনও দোষ করিলে তিনি শাস্তি দিতেন না, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের সেই নধর অধরের কমনীয় বচন শুনিয়া ও তাহার সেই নরদুর্ল্লভ সুন্দর কান্তি দেখিয়া পথের পথিক যখন তাহাকে কোলে না করিয়া থাকিতে পারিত না, তখন পিতামাতা বা গুরুদেবের কথা কি বলা যাইবে? এইরূপ অত্যাধিক স্নেহে তুলসীদাসের প্রথম বয়সে বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হইল না; [illegible] ধার্ম্মিক পিতামাতার গুণে এবং পরম ভক্ত নৃসিংহ দাসের শিক্ষায় বালক ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হইল না। নৃসিংহ যখন দেবারাধনা

* ১৫৮৯ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন।

করিতেন, বালক তুলসীদাসও সে সময় গুরুদেবের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণার অনুকরণ করিতেন, ঠাকুর দেবতার পূজাদি কেমন করিয়া করিতে হয়—তাহা শিক্ষা করিতেন।

তুলসীদাস এই বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান হইলেও বড় একগুঁয়ে বালক ছিলেন, যাহা ধরিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না, ইহাতে তাঁহার প্রাণ যাক্ আর থাক্। তুলসীদাস বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে, তিনি তাহাতে এমন ভাবে মজিয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। গুরুদেব এই জন্য তাঁহাকে বড় কাহারও সহিত মিশিতে দিতেন না। তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বে দীনদয়াল তেওয়ারীর পুত্র দুঃখী তেওয়ারীর সহিত তুলসীদাসের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল, দীনদয়াল তাঁহার পিতার নিকট আত্মীয় বলিয়া দুঃখীর সহিত খেলা করিতে কেহ নিষেধ করিত না। দুঃখী তুলসীদাসের সমবয়স্ক—খুব ভাল ছেলে।

একটু জ্ঞানবান হইলে নৃসিংহ দেব নবমবর্ষে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তুলসীদাসের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি দেখিয়া গুরুদেব তাঁহাকে সেই সমস্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুলসীদাস মনের আনন্দে সেই সকল উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বালক অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, কোন বিষয় একবার শিখাইলে আর দ্বিতীয়বার তাহা শিক্ষা দিতে হইত না। ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত হইতে পারিলে মানবের সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে; তুলসীদাস বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় কিছু অমনোযোগী থাকিলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার সে অভাব দূর হইতে লাগিল। এখন আর তাঁহাকে সহজে কেহ মূর্খ বলিয়া ধরিতে পারিত না। যাহার জন্য বিদ্যাশিক্ষা, সেই বস্তুই যদি লাভ হয়, তবে আর বিদ্যাহীনতা দোষদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সম্পাদক।

আমি।

'আমি;—আমি' বলিয়া আমি একবার আমার দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম—শুনিলাম—বুঝিলাম এ আমি' আমি। মনটা যেন কেমন কেমন করিল,—বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—গায়ের লোমগুলা খাড়া হইয়া উঠিল। ও বাবা,—কথাটা ত বেশ সরল মিষ্টি,—পাকা, কিন্তু ভিতরটা কেন এত আঁকা-বাঁকা?—না—আমারই হয়ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে। এতটা শক্তি হইতে

পারে? ফের তাকাইলাম,—দেহের সব দেখিলাম, দেখিলাম সবই 'আমি'! ও হরিবোল! ওর ভিতর আবার একটা কি—'আমি' হইতে 'আমার' আসিয়া পড়িল। যে দেহের অন্তর্বাহ্য 'আমি' ভাবিতেছিলাম তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আবার আমার জ্ঞানে কত ভালবাসিতেছি। তারপর দেখি চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়—যাহারা ক্রম বিকাশের মুখে ছোট হইতে বড় হইতেছে, কত কি করিতেছে,—আ মলো! তারাও যে 'আমার'! মনের ত কথাই নাই,—তিনিত আমাকে লইয়া তুলা ধুনিতেছেন। উদয় অস্ত—আবার উদয়ভাবে ত আমি 'আমিত্ব'টুকু মাখাইয়া,—বিশিরা কাচের মধ্য দিয়া, নানা রঙের, নানা ঢঙের, নানা ছাঁচের করিয়া নাচাইতেছি। ও মা—শুধু আমি নাচাই নাই। সময়ে সময়ে সেও যে সেই—রঙ ঢঙ ঠাট্‌ ঠমক লইয়া আমাকে বেদিয়ার বানর করিয়া নাচাইতেছে। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমিই তাহাকে নাচাইতেছি—এবং নাচাইব। কিন্তু যাই তাকে 'আমিত্ব' মাখাইয়াছি,—ছিল সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—দেখিতে দেখিতে—ওরে বাপরে, কত বড়, কত লম্বাচওড়া—কত উঁচু ও মোটা! এই তাহার দেহটা এক একবার বেশ মসৃণ কোমল বোধ হইতেছে,—আবার উহার কত ব্রণ, কত স্ফোটক,—কত গভীর ক্ষত। ছি, ছি, কি বীভৎস! ও ত বেশ ছিল। ছেলেবেলা থেকে দেখছি,—যখন আমার ব'লে কিছু ভাবতাম না, আগুনে হাত দিতাম,—মোহরকে জলে ফেলে দিতাম, তখন ত ও অত নাচত না, আমাকেও এত নাচাত না। এ কি অভিনয়? এর ভিতর এত কে জানে,—তা'হলে কি এত ভুলিতাম, যদিও ভুলিতাম—ভাবিয়া ভুলিতাম। আবার ওর পাশে কে? একটা স্ত্রীলোক নয়? তাইত, ওর কপালে আগেয় অক্ষরে লেখা 'বাসনা'! উঃ! ওর মুখ থেকে কত কি বাহির হইতেছে। যাক্‌—এখন 'আমি' এই শব্দ ধরিয়া কোথায় আসিলাম! এর মূল 'আমিত্ব'; ঐ আমিত্বই মন ও বাসনাকে সম্মিলিত করিয়া, এত বড় সপ্তসর্গ ও সপ্তপাতালকে মুখে ঢুকাইতেছে,—বাহির করিতেছে, আবার ঢুকাইতেছে। আবার অন্ত জগতের জন্য চারিদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। তাই কি মহা সাধক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন;—

> 'বাসনাতে দাও আগুন জেলে' ক্ষার হবে
> তায় পরিপাটি। তাহাতে ধোপ্‌ খুলবে ভাল
> মনের ময়লা যাবে কাটি!

তবে কি 'বাসনা'—রাক্ষসীই মনকে আপনার করিয়া এত খেলা খেলিতেছে?

তা' যেন হলো, কিন্তু সেও আমার দোষ—আমি 'আমি' হইতে 'আমিত্ব' লইয়া ঘটক সাজিয়া তাহাকে টানিয়া মনের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। তাইত দু'জনার এত রঙ্গ বাড়িয়াছে, প্রেত ও প্রেতিনীরূপে এত তাণ্ডবনৃত্যে হৃদয়কে শ্মশান করিতেছে। যাদুকররূপে উহা মিথ্যাকে সত্য সাজাইয়া, আমাকে আমিত্বের মধুর আস্বাদ দিতেছে। আরে ছাই,—কে জানে সেই মধুর সঙ্গে মৌমাছি, উঃ—কি হুল ফুটান! এই কি 'আমিত্ব'? ঐ হুল ফুটানর কি এত জ্বালা। একেই কি সবাই আমিত্ব ব'লে আমনে দিশাহারা হয়?

'আমি'ত্ব বই কি? সুধু ঐ নয়,—ও দিকে মাকড়সার জাল দেখিয়াছ? উহাও ঐ আমিত্বের সূতার গাড়ী—দেখছ না গায়ে হাতে মুখে লাগিলে আটার মত কেমন চট্ চট্ করে, জড়াইয়া ধরে। আরে ছিঃ! এ আর বুঝিতে পার না? ঐ জালেই ত তুমি পড়িয়াছ, সেই তুমিই 'আমি'। ঐ দেখ আমি উহাতে পড়িয়া কেমন ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূতার উপর সূতা টানিয়া কেমন জড়াইতেছি। আর ওদিকে আমি নিজেই মাকড়সা সাজিয়া দশটা চো'ক, দশদিকে তাকাইতে তাকাইতে,—পাছে শত্রু আসে এই ভয়ে আমার উপর পড়িতেছি—পড়িয়া রস চুষিতেছি। বিষ খাইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিলে লোকে আত্মহত্যা বলে, ইহাতে পাপ হয়। আর এ বুঝি আত্মহত্যা নয়, বা ইহাতে বুঝি পাপ নাই? আছে বই কি, তবে কি জান, আমি 'আমিত্বে' ভুলিয়া ধোঁয়ার মধ্যে থাকিয়া দেখিতেছি। তাইত সাপকে রজ্জু মনে করিয়া হাত দিতেছি,—ফুলের মালা করিয়া গলায় জড়াইতেছি। সাপের মাথার মানিক সহজ লভ্যজ্ঞানে সাপের মুখে হাত দিতেছি। সাপ ছাড়িবে কেন? সে স্বভাবগুণে কামড়াইতেছে দেখিতেছি,—জ্বালায় জ্বলিতেছি, তবু মাণিকের জন্ত আঁচড় পাঁচড় করিয়া, তাহার মাথা খুঁজিতেছি। আরে বর্ব্বর! মাণিক কি সাপের মাথায় থাকে! সে যে তাহা গিলিয়া রাখে! কোথা হাত দিতে কোথা হাত দিতেছিস্?—হায় দুরদৃষ্ট! সাধকের কথা শুনিয়াছিস্;—

দিনকো ডাকিণী রাতকো বাঘিণী
পল পল লহু চোষে।

এই 'আমি' তাই,—নিজে নিজের রক্ত চুষিতেছি। এর ফল আমিত্বের—রস—রঙ—সঙ্—ঢঙ্!

আমিত্বে ঐ সকলে, কি শুধু নিজেকে নিজে জড়াইয়াছি। ছিলাম দ্বিপদ, হইলাম চতুষ্পদ,—এইখানেই—ধোঁয়ার মধ্যে স্বরূজ্ঞানকে হারাইলাম, ধরিলাম,

আবার হারাইলাম। এই ভাবেই যায়,—তাহার পর মক্ষিকারূপ ষট্‌পদ স্থধু জলে বা স্থলে নয়,—শূন্যেও বেড়াইতে লাগিলাম। কেন না তখন অনেক জিনিসের প্রয়োজন হইল। সে সকল ত চাই। দেখিতে দেখিতে মাকড়সারূপ অষ্টপদে আপনার লালায় জাল গড়িয়া, ওত পাতিয়া, শিকার ধরিতে রহিলাম। নিজেই শিকারী,—নিজেই শিকার। এ রহস্য মন্দ নয়—সহজ নয়—শক্ত ও নয়। দেখ—দেখিবে বেশ কৌশল,—বেশ বাগবন্দী খেলা, বেশ অষ্টচক্রের মধ্যে রাজা বন্দী। এখন স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সব কয়টিতে 'আমিত্ব' মাখাইয়া জাগিয়া জাগিয়া অষ্টপদে ছুটিয়া ছুটিয়া স্বপ্নের খেলা খেলিতে লাগিলাম। ওদিকে শাল দোশালা, গাড়ী, ঘোড়া—প্রাসাদ-পরিখা ধনরত্ন—জমিজমা—এমন কি সূচাগ্র পরিমিত স্থল, সবে আমি—'আমি' সবে! যেন সোনায় সোহাগা, দুধে আলতা,—হরিতালে হিঙ্গুল। এরই নাম 'আমি' ও আমিত্ব—জীবনে মরণ কবির কথা,—জীবনে মরণ ভালবাসার পরিণাম। (১) এইখানে ধ্রুব সত্য।

মরণ শুনিলেই ভয়ে অন্তর গুড়্ গুড়্ করিয়া উঠে—আতঙ্কে উঠিয়া চারিদিকে তাকিয়ে দেখি,—তখনও অন্তর গুড়্ গুড়্—গুড় ত মিষ্ট! তবে কি অন্তরে মিষ্ট?—মিষ্ট বই কি? যেমন ন্যায় হইতে 'ন্যায়' হয়, তেমনি 'গুড়' হইতে তাহার মিষ্টস্বাদ 'গুড়' পদটি বাছিয়া লইলে—ততটা ভয়ের মধ্যেও যেন একটু সাহস আসে। তখনও আমি বা 'আমিত্ব' যায় না। বোতল ভরা বায়ু,—সে কি যাইতে চায়? তায় ত যাইবার ধর্ম্ম নয় যে যাইবে! যাইবে বই কি—যন্ত্র বিশেষের দ্বারা, ঐ দেখ বোতল বায়ু শূন্য। এ গুরু নিজের গুণে, ঐরূপ 'আমি' ও 'আমিত্ব'টুকু বাহির করিয়া লইলেন। টকে উপযুক্ত পরিমাণে গুড় পড়িয়া মিষ্ট হইয়া গেল। সেই গুড় গুরুরূপে আমার আমি ও "আমিত্ব" টানিয়া লইয়া আমাকে মিষ্ট করিয়া তুলিল। দেখ দেখি তখনকার আমি আর এখনকার আমি দুয়ে প্রভেদ আছে কি? আছে বই কি,—আগের "আমি" ত্রিশিরাকাচের মধ্যে রঙ ঢঙে সাজান,—আমিত্বে ঢাকা মিথ্যায় গড়া,—বাসনা যুক্ত মন ইন্দ্রিয়াদি সহিত বিশ্বগ্রামে উদ্ভ্রান্ত। ক্রমশঃ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

---

(১) কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

শক্তি-সাধনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশী-বাস।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রম পাকা হইলে তবে মানবের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। তখন সংসার ভাব সম্যক-ভাবে তিরোহিত হইলে আর এসব কিছুই ভাল লাগে না, মন স্বভাবতই আরও কিছু মধুর বস্তু লাভের জন্ম অস্থির হইয়া পড়ে, পরকালের পথ মুক্ত করিবার জন্য তখন প্রাণ ছটফট্ করিতে থাকে।—সংসার হইতে অবসর লাভের জন্ম প্রাণে একটা উৎকট আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে; সকল বিষয়ে যেন বৈরাগ্য ভাব আনয়ন করে—এই অবস্থাই বাণপ্রস্থ। শাস্ত্র এই জন্ম "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বলিয়া আদেশ করিয়াছেন। সংসার ছাড়িয়া যে বনেই বাস করিতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই, তবে তখন যেন মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়; তাহা হইলেই জীবের আর পরকাল নিস্তারের কোন ভাবনা থাকে না।

দেবীপুরের দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রপাঠি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সুব্রাহ্মণ, বহুদিন ধর্ম্মভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এখন আর তাঁহার কিছু ভাল লাগে না; তাই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া কাশীবাসের ইচ্ছা করিয়াছেন। পুত্রদুইটি উপযুক্ত হইয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্মে তাহারা এখন পরিপক্ক, তবে আর বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকা কেন? এখন দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই প্রাণ সুস্থির হয়।

অধ্যাপক দেবানন্দের সংসার খুব সচ্ছল। শিষ্য যজমানের কল্যাণে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রণের বিদায়-পত্রে এবং দক্ষিণা ও প্রণামী প্রভৃতিতে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। উপার্জ্জনও যেমনি, খরচও তাঁহার তেমনি ছিল। গৃহে একটি টোল ছিল। তাহাতে আটদশটি ছাত্র ঠিক নিজের বাটীর মত প্রতিপালিত হইত; অতিথি-শালায় কত অতিথি আসিত-যাইত, তাহার স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের সন্তোষ বিধান করিতেন। গৃহে পূজা-পার্ব্বন ত ফাঁক পড়িত না, তারপর লক্ষ্মীশ্রী হইলে আত্মীয়-স্বজন যেমন আপনাআপনি একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতাইয়া জুটে—ভট্টাচার্য্য গৃহে তাহারও অভাব পরিলক্ষিত হইত না। এত খরচ করিয়াও ব্রাহ্মণ নগদ অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; ছোটখাট একখানি জমীদারীও তাঁহার ছিল। প্রজাগণ সকলেই রামরাজত্বের মত

তথায় সুখে বাস করিত, কর আদায়ের জন্য কখন কাহাকেও কোনপ্রকার পীড়ন সহ্য করিতে হইত না। সংসারের সকল সুখ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া দেবানন্দ এখন উদাস প্রাণ, ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী সুখভোগের জন্য তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত। যাহাতে জুয়ার-ভাটা নাই—যে সুখে সুখী হইলে প্রাণ আর অন্য কোন সুখের আকাঙ্খা করে না, ব্রাহ্মণ সেই অতুল স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংসারে আপনার বলিতে দেবানন্দের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর ও কনিষ্ঠ রামেশ্বর এবং পত্নী উমাকালী, আর একটি কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নি—নাম দাক্ষায়নী এবং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ প্রমদা, এই কয়েকটি মাত্র পরিজন; কিন্তু ব্রাহ্মণের মাসিক আটমণ চাউলেও সংসারের ভরণপোষণ হইত না, দেবানন্দ এমনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বেশ্বরের বয়স ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাঁহারও এক পুত্র এক কন্যা হইয়াছে; কনিষ্ঠ রামেশ্বরের বয়স পঁচিশ বৎসর, এখনও বিবাহ করেন নাই। সর্ব্বেশ্বর ইংরাজী শিক্ষায় মুক্তিমন্ত বলিয়া পিতার সমস্ত বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। কলিকাতার কোন অফিসে চাকুরী করিয়া মাসিক কিছু উপার্জ্জনও করেন। তিনি বলেন—পিতার এ সমস্ত অর্থব্যয় কেবল বাজে খরচ মাত্র; ব্যয় করিবার কোন আবশ্যক নাই কিন্তু দেবানন্দের ন্যায় পিতার উপর কোন কথা বলা তাঁহার সাধ্য নাই—কাজেই নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন। শ্বশুরের বাজে খরচ দেখিয়া প্রমদার গা ইসপিস্ করিত কিন্তু কি করিবেন উপায় ত নাই। কনিষ্ঠ রামেশ্বর ঠিক পিতার অনুরূপ সাত্ত্বিক প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আচার-ব্যবহার, শাস্ত্রাধ্যয়ন-পটু সুপণ্ডিত, পৈতৃক শিষ্য-যজমান রক্ষা করিতে; কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়া বংশের মানবৃদ্ধি করিতে, তাঁহার প্রগাঢ় ইচ্ছা, কিন্তু দাদা ও বৌদিদি বিপরীত ভাবাপন্ন; তাঁহারা এখনকার ধরণে ওসমস্ত কীর্ত্তি-কলাপ উচ্ছেদ করিয়া, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া হাল্ফ্যাসনে থাকিতে পারিলে আর কিছুই চান না। অত গোলমাল তাঁহাদের অসহ্য।

পিতামাতা যখন কাশীবাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তখন সর্ব্বেশ্বর মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইয়া মৌখিক খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রমদাও কৃত্রিম দুঃখ জানাইতে লাগিল। রামেশ্বর কিন্তু প্রমাদ গণিলেন, তিনি পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া, কেমন করিয়া থাকিবেন। পার্থিব দেবতা পিতামাতার চরণ বন্দনা না করিয়া যে রামেশ্বরের দিন চলে না। যে দিন তিনি এ কার্য্য করিতে না পাইতেন, সে দিন তাঁহার বৃথা বলিয়া মনে হইত, গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা-

করিয়াও তাঁহার তত তৃপ্তিবোধ হইত না,যত জনকজননীর পূজায় তৃপ্তি পাইতেন। দেবানন্দ যে দিন দূরদেশে বিদায় লইতে যাইতেন ; সে দিন রামেশ্বর বড় একটা পাঠাভ্যাসে মন সংযোগ করিতে পারিতেন না। যেন চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। তাই অতবড় বুড়োছেলেও মায়ের আঁচলে-আঁচলে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেদিনকার পিতার অভাব যেন জননীতে পূরণ করিয়া লইতেন। রামেশ্বরের এরূপ ভাব দেখিয়া সকলে না হউক, সর্ব্বেশ্বর ও প্রমদা হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সর্ব্বেশ্বর সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতেন। রামেশ্বর দাদা ও বৌদিদির কার্য্যে কোন প্রকার সমালোচনা করিত না ; কারণ তাঁহারাও যে দেবদেবীর স্থানীয় ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা ; প্রমদা যে মাতৃস্থানীয়া, ইঁহাদের কথায় আবার প্রতিবাদ কি ? কোন বিষয় অযৌক্তিক হইলেও রামেশ্বর তাহা অবনত মস্তকে পালন করিতেন। সমস্তদিন পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ লইয়াই কাটাইতেন ; একখানি কাপড়, একখানি চাদর এবং একজোড়া চটিজুতা হইলেই তাঁহার বেশভূষার চরম হইত—সেই তপঃজ্যোতিপূর্ণ কলেবরে এই বেশভূষাতেই রূপের তেজ ফুটিয়া বাহির হইত। আর বড়বাবু নানাপ্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদ, এমন কি হ্যাটকোট পরিলেও তাঁহাকে তেমন সুন্দর দেখাইত না। ভগবান প্রদত্ত গঠন প্রণালী ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য যে স্বতন্ত্র, কৃত্রিমতায় কি তাহা লাভ হইতে পারে ? তাহা হইলে কুরূপও ত সহজে সুরূপ হইতে পারিত। রামেশ্বরের প্রকৃতি যেমন কমনীয় ছিল, জনমনোহর সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহঅঙ্গনে তেমনি খেলিয়া বেড়াইত, দেখিলে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলকেই ভক্তি করিতে বাধ্য হইত।

পিতামাতা তীর্থগমন করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবেন, পুত্র হইয়া ইহাতে বাধা দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। স্বধর্ম্মপরায়ণ বিপ্রজাতি যদি এ সকল প্রতিপালন না করিবেন, তবে করিবে কে ? ইহাত তাঁহাদেরই আশ্রমোচিত কার্য্য—বরং পুত্র হইয়া পিতামাতার এরূপ পরকাল চিন্তার পথে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য। রামেশ্বর জনক-জননীকে বাধা দিলেন না। আর সর্ব্বেশ্বর ত পূর্ব্ব হইতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। পিতামাতা চলিয়া গেলে বিষয়ের ভার ত তাঁহার হাতেই পড়িবে, তখন দেখা যাইবে, কেমন করিয়া এত বাজে খরচ হয় ; আর প্রজারা খাজনা না দিয়া কেমন করিয়া রেহাই পায়। তবে পতি-পত্নীতে

বাহ্যিক রাক্ষসীমায়া দেখাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা জানিতেন—পিতা-মাতা যাহা মনস্থ করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না ;—ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ যাক্ আর থাক্। যখন বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবেন, স্থির করিয়াছেন—তখন তাঁহার বাক্য নড়চড় হইবে না ; তবে আমি কৃত্রিম কান্নাকাটি করিয়া মায়া দেখাইবার ত্রুটী কেন করিব ?

প্রাণে ভগবদভাব জাগিলে, আর তাহাকে কোন টানেই টানিয়া রাখিতে পারে না ; তখন বিষয়-বৈভব, পুত্র-পরিজনের মায়া আর কোন কার্য্যকারী হয় না। বিষয়বৈরাগ্য এমনি মনোহারী ; এমনি আসক্তিশূন্য ; যিনি এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন, তাঁহার জীবনই ধন্য, নতুবা কপটতা আশ্রয় করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সাধু সাজিলে, তাহাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ; তীর্থস্থানে গিয়া ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা ভুলিয়া গৃহের পুঁইমাচার চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে।

তখন তীর্থের পথ এত সুগম ছিল না ; একান্ত অনুরাগ না জন্মিলে কেহ বাটী হইতে বাহির হইতে পারিত না। ভগবান দেবানন্দকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাণে ঐকান্তিকতা জাগিয়াছে ; তাঁহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দেবাদিদেব ও অন্নপূর্ণার পদে প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। এক তিল আর তাঁহার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই ;—যেন সমস্ত কাঁটা ফুটিতেছে।

হিন্দুর মতে স্ত্রী সহধর্ম্মিনী, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহা শাস্ত্রের বচন ; স্বামী যাহাতে আসক্ত, পতিব্রতা পত্নীর কি তাহাতে অনাসক্তি আসিতে পারে ? তিনিও সমস্ত মায়া কাটাইয়া স্বামীর অনুগমনে উদ্যতা হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রদ্বয়কে সমস্ত কাজকর্ম্মের উপদেশ দিয়া তাঁহারা দেবারাধনায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিতে ভূস্বর্গ কাশী যাত্রা করিলেন। পিতামাতার নিকট কনিষ্ঠ পুত্রের মায়ার টান বড় বেশী ;—রামেশ্বর বেশী উথলা হইলে পাছে, পিতামাতার কোন অমঙ্গল হয়, এই জন্য তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেও, বাহ্যিক প্রফুল্লতা দেখাইতে লাগিলেন।

দেবানন্দ ও উমাকালী কনিষ্ঠপুত্রকে জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর করে সমর্পণ করিয়া, দাক্ষায়নীকে সংসারের এবং অতিথি সৎকারের ভারার্পণ করিয়া, অনুগত প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ শুভদিনে শুভ যাত্রা করিলেন। এতদিনে সর্ব্বেশ্বর ও প্রমদার অন্তরে একটা বোঝা নামিয়া গেল। সম্পাদক।

ঘরের লক্ষ্মী।

(ক্ষুদ্রগল্প)

সংসারে স্বামীর গৃহ সুখ নিকেতন ;
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম স্বামী,—স্বামী—নারায়ণ।

মাতা স্নেহ স্বরে ডাকিলেন,—"বাবা যোগেশ !"

যোগেশ উত্তর করিল,—"কেন মা !"

"উনি যে তোর বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন ?"

যোগেশ হাসিয়া বলিল—"তাহা ত শুনিয়াছি মা !"

"তা তুই কি বলিস ?"

"আর কিছু দিন পরে হইলে ভাল হইত মা !"

"দেখ বাবা ! আমি আর এখন পরিশ্রম করিতে পারি না ; বড় বউ-মা আর একা একা কত কাজ করিবে ?"

যোগেশ হাসিয়া বলিল—"মা ! তোমরা যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ, সে মেয়ে কি তোমাদের গৃহস্থালীর ঘর-সংসারের কাজ করিতে পারিবে ?"

মাতা বিস্মিত-ভাবে বলিলেন—"কেন রে ! সে ঘর সংসারের কাজ করিতে পারিবে না ?"

"মা ! তাহারা যে সাহেব ! তাহাদের চলাফেরা, হাবভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সমস্তই সাহেবী চালের। মেয়ে কলেজে পড়ে, গান গায়, চা খায়, আর সর্ব্বদা সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়া থাকে ;—এমন বিবিমেয়ে কি তোমার গৃহস্থঘরে মানাইয়া চলিতে পারিবে ?"

"মেয়ে বাপের ঘরে যে চালেই থাকুক—বিবাহ হইলে সকলেই শ্বশুর-ঘরের চালেই চলে ! বড় বউ-মা ত ধনীর কন্যা—পিতামাতার কত আদরের ছিল ; তা সে কি আমাদের গৃহস্থচালে চলিতেছে না ?"

"মা ! বৌদিদি ধনীর মেয়ে হইলেও—গ্রাম্য মেয়ে ; তাই গৃহস্থচালে চলিতেছে। আর সে যে একবারে সহুরে বিবি !"

"তা বাবা ! তোর মা—"

"না মা ! আমার কিছু ঠেকিবে না, ঠেকে ত তোমাদেরই ঠেকিবে।"

"তা আমি বুঝ'ব।"

"শেষে যেন আমার দোষ দিও না মা !"

"কা'র দোষ দিব ঠাকুর পো !"

বধূ নিরুপমা এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া মাতা-পুত্রের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। যোগেশের শেষোক্ত কথা শুনিয়া, সে সহসা বাহির হইয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিল—"কা'র দোষ দিব ঠাকুরপো!—তুমি যদি তাকে ভাল চালে চালাইয়া নেও; সে চলিবে না কেন? স্ত্রীলোক কি কখনও পুরুষের অবাধ্য হইতে পারে?"

যোগেশ একটু হাসিয়া বলিল—"বৌদিদি! তোমরা সংসারের সকল খবর রাখ না—আজকালের মেয়েরা আর স্বামীর বাধ্য হইয়া চলে না; বরং স্বামী-বেচারাই স্ত্রীর বাধ্য হইয়া চলে!"

"তা তাহারা চলুক, তুমি ত আর তেমনটি নহ? তুমি তাহাকে একটু বুঝাইয়া-সুঝাইয়া দিলে আমি ঠিক চালে চালাইয়া লইতে পারিব।"

"দেখ্‌ব' তখন।"

"দেখেনিও তখন—এখন এস, জলখাবারগুলি খাইয়া যাও।" নিরুপমা দেবরের হাত ধরিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেল। যোগেশ-জননী উমাসুন্দরী সেইস্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিলেন—"এমন লক্ষ্মীরূপা পুত্রবধূ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! মা আমার রূপে শেফালিকা, মাধুর্য্যে অপরাজিতা, সরমে বনযূথিকা, স্নেহে মন্দাকিনী, পবিত্রতায় ভাগীরথী;—সহিষ্ণুতায় সীতা, পাতিব্রত্যে সাবিত্রী, সন্তানপালনে জননী, ক্ষুধার্ত্তের অন্নপূর্ণা!

(২)

শুভদিনে শুভক্ষণে ডেপুটী-নন্দিনী মাধুরীর সহিত যোগেশের বিবাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল! বিবাহের পরদিন নানারূপ বাদ্যভাণ্ড ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যোগেশ নববধূ সহ গৃহে পদার্পণ করিল। যোগেশের জননী আসিয়া বলিলেন—"বাবা! আমার জন্য কি নিয়া আসিলে?" যোগেশ উত্তর করিল—"তোমার জন্য দাসী আনিলাম।"

যোগেশের ভ্রাতৃবধূ নিরুপমা আসিয়া সহাস্যে বলিল—"আমার জন্য কি আনিয়াছ?" যোগেশ হাসিয়া বলিল—"বিবি।"

তাহার পর যোগেশের মা ও যোগেশের বৌদিদি বরণডালা সাজাইয়া বধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

মাধুরীর সঙ্গে একটি ঝি আসিয়াছিল। সে বাড়িতে আসিয়া অবধি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াই আছে। "ওমা, কি বন-জঙ্গলে দেশ গা;—দিনের বেলায় বাঘে খেয়ে ফেলবে যে। ঘরগুলি যেন পায়রার খোঁপ;—কি বিশ্রী—তা থাক! কিন্তু

কই মিস্ মাধুরীর জন্য ত কোন নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত ঘর নাই—তাহার জিনিস-পত্রগুলি কোথায় রাখিব? কোথায় তাহাকে একটু চা-টা করিয়া দিব? কোথায় বসিয়া সে চা-বিস্কুট খাইবে?—না আছে চেয়ার—না আছে টেবিল! ওমা, ওদিকে দেখ না—মাগীরা তাহাকে কেমন ঘিরিয়া বসিয়াছে—হাঁপ ছাড়িতে দিতেছে না। ওই মোটা মাগীই বুঝি বাড়ীর গিন্নী—যাই একবার তাহার কাছে!

ঝি গিন্নীর কাছে গিয়া বলিল—"তোমরা কেমন ধারা লোক গা?"

"কেন বাছা কি চাই?

"আমার জন্য কিছুই না—মিস্ বিবির জন্য একখানা ঘর,—খান দুই চেয়ার—"

"মিস্ বিবি কে বাছা?"

তোমাদের নূতন বৌ!—তাহার জন্য কোন্ ঘর—"

"ওমা, সেকি—নূতন বৌউ—সবে মাত্র আসিয়াছে—তাহার আবার আলাদা ঘর কি?"

"সে একটু বিশ্রাম করিবে, চা-টা খাইবে"

"ওমা!"

উমাসুন্দরী বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে ঝি'র দিকে চাহিয়া বলিল—"ওমা! নূতন বৌয়ের আলাদা ঘর চাই—চা-বিস্কুট খাইবে, এ কি কথা? এমন কথা ত কোন দিন শুনি নাই? লোকে কি বলিবে? ওমা কি লজ্জা!"

ঝি হাত নাড়া দিয়া নাকিসুরে সাড়ম্বরে বলিল—"তা হবে না, আসবার সময় সাহেব আমায় কত করে বলে দিয়েছেন।"

"সা-হে ব?"

"হাঁ গো হাঁ, তোমাদের নূতন কুটম্ব—নূতন বৌয়ের বাপ।" উমাসুন্দরী এদিক ওদিক চাহিলেন; মনে মনে ভাবিলেন—"ওমা! ইহারা কি খাস্ বিলাতী সাহেব গা;—এমন বৌ লইয়া কি ঘরকন্না চলিবে!"

গৃহের পরিবার পরিজন ও সমাগতা কুটম্বিনী সকলেই অবাক্! এমন কথা ত কেহ কোন দিন শুনে নাই? পৃথিবী কি উল্টে গেল—কলির কি শেষ হইল? সকলে এ উহার মুখ চাহিল; মাগী বলে কি!

বিবাহের পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। মাধুরী শ্বশুরালয় হইতে হাসিতে হাসিতে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

(৩)

দেখিতে দেখিতে বিবাহের পর ৬ মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন উমাসুন্দরী যোগেশকে কহিল—"বাবা! একটা ভাল দিন দেখিয়া ছোট-বৌমাকে নিয়ে এস।"

যোগেশ বলিল—"মা ও বিবি লইয়া কি করিবে? উহার বিবিয়ানা ধরণের চাল হইয়াছে; ও কি এই গ্রাম্য গৃহস্থ ঘরের বধূরূপে চলিতে পারিবে?

মাতা,—তাই বলিয়া ঘরের-বৌ ফেলিতে ত পারিব না? তুই না হয় এক কাজ কর—কলিকাতায় গিয়া একটা বড় চাকরি ধর—সেইখানে বৌমাকে নিয়ে রাখ।

যোগেশ,—কি ভাবে?

মাতা,—বৌমা যে ভাবে থাকিতে চায়!

যোগেশ,—দেখ মা! তোমরা বিবি-বৌ আনিয়া ঠেকিয়াছ—তাই বলছ—সাহেব হইয়া, বৌকে সাহেবী চালে রাখিতে বিদেশে গিয়া থাক্। কিন্তু মা! আমি তাহা পারিব না;—দশটা স্বর্গের সুরবালা আনিয়া দিলেও না!"

মাতা,—তবে কি হইবে বাবা?

যোগেশ,—আমি বলি কি মা! ও বাপের বাড়ীতেই থাকুক—

মাতা,—সে কিরে, বৌ বাপের বাড়ী থাকিবে—সে কেমন কথা? লোকে কি বলিবে? ছেলের বিয়ে দিয়াছি, বৌ বাপের বাড়ী রাখিতে? তুই একদিন যা সেখানে—বৌমাকে নিয়ে আয়।

যোগেশ,—সে পিতৃ-ভবনের অতুল সুখ ছাড়িয়া এখানে আসিবে কি?

মাতা,—বাপের ঘরে যত সুখই থাকুক, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া মেয়েমানুষ কি চিরকাল সেইখানে সুখে থাকিতে পারে। দুইদিন পরেই বাপের ঘর হয় পরের ঘর—আর পরের ঘর হয় আপনার ঘর।

যোগেশ,—সে যদি তাহা না বুঝে?

মাতা,—তুই একটু বুঝাইয়া-সুঝাইয়া—

যোগেশ,—এখন আর মুখের কথায় কিছু হইবে না—যদি নিজে ভাল না হয়। আচ্ছা তুমি বলিতেছ, একদিন যাব সেইখানে।

(৪)

রাত্রে আহারাদির পর, যোগেশ শ্বশুরের কাছে স্ত্রীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।—যোগেশের শ্বশুর শৈলেশ বাবু বলিলেন—"নিতে ত আসিয়াছ—মাধুরীকে নিয়া রাখিবে কোথায়?"

"কেন, আমাদের বাড়ীতে!"

"সেখানে সে থাকিবে কোথায়?

"আমাদের ঘরে।"

"চলিবে কি করিয়া?"

"মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হইবে না।"

"তাহা হইলে আমার মেয়েকে, সেখানে ছাড়িয়া দিব না।"

"মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন, ছাড়িয়া দিবেন না—এ কেমন কথা?"

"দেখ যোগেশ! সে যেমন তেমন মেয়ের ন্যায় থাকিতে পারিবে না; তাহার শিক্ষা ও অভ্যাসের উপযোগী গৃহস্থালী গড়িয়া দিতে হইবে।"

যোগেশ বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? আমাদের বাড়ীর চাল চলন যেরূপ আছে; তাহা বদ্‌লাইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই—আর তেমন ইচ্ছাও আমার নাই।

"তাহা হইলে মাধুরীকে সেখানে ছাড়িয়া দিব না।"

"তবে বিবাহ দিয়াছিলেন কেন? জানেনইত আমরা গ্রাম্য—আমাদের চাল-চলন সাধারণ!

"তখন মনে করিয়াছিলাম—তুমি উচ্চশিক্ষিত—শীঘ্রই বড় চাকুরী করিয়া সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে বাস করিবে—উন্নত রুচিমত গৃহস্থালী পাতিয়া নিবে।"

"দেখুন স্ত্রীর জন্য বাড়ী-ঘর, পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ছাড়িয়া বড় চালের একটা আলাদা সংসার পাতাইয়া নিতে পারি—সেইরূপ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমার হয় না—দরকারও মনে করি না।"

"তাহা হইলে মাধুরীর কি করিয়া চলিবে? তাহার মতেইত তোমার চলিতে হইবে!"

যোগেশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"স্ত্রীর মতে স্বামী চলে না—স্বামীর মতেই স্ত্রী চলে!—স্ত্রী স্বামীর দাসী—স্বামী স্ত্রীকে যে ঘরে, যে ভাবে রাখিবে, স্ত্রী সেই ভাবে থাকিবে।"

শৈলেন বাবুর একটু রাগ হইল, বলিলেন—"তা সে পারিবে না;—আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব না।"

"বেশ!"

(৫)

স্বামীর সঙ্গে পিতার যে সব কথাবার্ত্তা হইল, মাধুরী পাশের ঘর হইতে

সমস্তই শুনিল। প্রথম হইতেই স্বামীর প্রতি মাধুরীর ভক্তি প্রেম-প্রীতি আকৃষ্ট হইতেছিল। স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার সুকোমল নারী-স্বভাব নত হইয়া আসিল। 'তাই ত স্বামীর চালেই ত স্ত্রীকে চলিতে হয়।' সে "সাবিত্রী" পুস্তকখানি পড়িয়াছিল। তাহার মনে পড়িল—"সাবিত্রী রাজকন্যা ছিলেন, তথাপি তিনি বনবাসী স্বামীর শাকভাত ও বৃক্ষ-বল্কলের নিকট রাজপ্রসাদের রাজভোগ ও রাজ-বেশভূষা অতি তুচ্ছ মনে করিয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া চিরতরে বনবাসিণী হইয়াছিলেন।" আর সেই দিন কথকঠাকুরও ত বলিয়া গিয়াছেন—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।"

তবে আমি কেন পিতৃগৃহে থাকিব?—সুখের জন্য? পিতৃগৃহের সুখ—পিতামাতার আদর-স্নেহ দু'দিন বৈ-ত নয়! আর স্বামীগৃহের সুখ—স্বামীর প্রেম-ভালবাসা চিরকালের। যাহার স্বামীর ভালবাসা আছে; তাহার সবই আছে;—যাহার উহা নাই তাহার কিছুই নাই। পিতামাতার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার অপেক্ষা স্বামীরপ্রদত্ত সামান্য ভরণ-পোষণে গর্ব্বানুভব করা সতীস্ত্রীর কর্ত্তব্য! আর স্বামীর বাসভবনই স্ত্রীর বৈকুণ্ঠ-ধাম—স্বামীই সতীর নারায়ণ!

যোগেশ যখন শয়নকক্ষে শয়ন করিতে গেল, তখন দেখিল—মাধুরী শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে। যোগেশ সস্নেহে মাধুরীর হাত ধরিয়া বলিল—"মাধুরী! এখনও শয়ন কর নাই?

মাধুরী আরক্ত মুখখানি একটু নত করিয়া, একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—শুনিবে কি?"

"অমৃতে অরুচি কাহার?"

সলজ্জভাবে মাধুরী বলিল—"ঠাট্টা না,—সত্যি"

যো—"কি কথা?"

মা—"বাবার সঙ্গে তোমার যে কথা হইল, আমি সমস্তই শুনিয়াছি;—বাবা আমায় ছাড়িয়া দিবেন না—না?"

যো—"হাঁ, তাই ত বলিলেন।"

মা—"আমি এখানে থাকিব না।"

যো—"কোথায় যাইবে?

মা—"তোমার সঙ্গে—তোমাদের বাড়ীতে!"

যোগেশ—"আমার সব কথা ত শুনিয়াছ?

মা—"হাঁ"

যো—"সব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

মা—"হাঁ"

যো—"সেখানে থাকিতে পারিবে ত?

মা—"পারিব—যদি ভুল করি, শিখাইয়া দিও।"

মাধুরী ছল ছল নেত্রে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল—যোগেশ সাদরে স্ত্রীকে বুকে টানিয়া লইল।

পরদিন বৈকালে যোগেশ সস্ত্রীক বাটী ফিরিল। গৃহে পৌছিয়াই মাতাকে কহিলেন—"এই লও মা! তোমার গৃহস্থ-ঘরের গৃহস্থ-বৌ!"

মাধুরী শাশুড়ীর পদে প্রণতা হইল। উমাসুন্দরী সস্নেহে প্রণতা বধূকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

"এস মা আমার "ঘরের লক্ষ্মী!"

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

মতিমালা।

(১)

নগেন্দ্র বাবুর বড় আদরের একমাত্র দুহিতা মতিমালা অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই পিতৃহীনা হইল। নগেন্দ্রবাবুর উপর্য্যুপরি পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়, কিন্তু নির্ম্মম বিধাতা তাহাদিগের মধ্যে একটিকেও পঞ্চবৎসরের অধিক কাল জনকজননীর আনন্দবর্দ্ধন করিবার সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই। অবশেষে সুদীর্ঘ কাল নানা দেবদেবীর সাধনার ফল স্বরূপ প্রৌঢ় বয়সে তিনি এই কন্যা-রত্নটি লাভ করেন; সুতরাং কন্যাটি তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল। অষ্টম বর্ষে "গৌরীদান" করিয়া কোনও সদ্বংশ-সম্ভূত দরিদ্র-সন্তানকে জামাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া, স্বগৃহে তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন, এই বাসনা তাঁহার মনে সাতিশয় বলবতী ছিল; কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত বাসনা ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই, কালের আহ্বানে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চির অবসর গ্রহণ করিতে হইল। নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি পাটের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অসহায়া বিধবার হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত হইলে, অত্যল্পকাল মধ্যে জ্ঞাতিশত্রু ও আইন আদালতের কৃপায়, অনাথিনী বিধবা দারিদ্রের দ্বারে উপনীতা হইলেন। মতিমালা পরমা-

সুন্দরী ;—লালিত্যের নিখুঁত ছবি, অকস্মাৎ দেখিলে দেবী প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হয় ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের ছলনায় এ পর্য্যন্ত তাহাকে পাত্রস্থ করিবার কোনও সুবিধা হইল না। এদিকে মতিমালা দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণা হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পন করিল। অনাথিনী বিধবা অনোন্যপায় হইয়া ভগবানের ইচ্ছায় আত্মনির্ভর করিলেন।

(২)

হরিহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা নিবাসী একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। কলেজষ্ট্রীটে তাঁহার একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের দোকান ; কলিকাতায় তিন চারিখানি বাটী, তদ্ভিন্ন একখণ্ড জমিদারী আছে। হরিহরবাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ, বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয়। সংসারে তাঁহার একটি বিধবা ভগ্নী অহল্যা দেবী ও কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর। ভগ্নিটিকে হরিহরবাবু জননীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার আজ্ঞা দেবাদেশের ন্যায় পালন করেন। হরিহরবাবুর বয়ক্রম দ্বাত্রিংশৎ। ইতিপূর্ব্বে তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নী বিবাহের পর বৎসরেই বিসূচিকারোগে ইহলীলা সম্বরণ করেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়া পত্নীও একটিমাত্র কন্যা প্রসব করিয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিতা হন ; চারি দিবস পরে কন্যাটিও গতাসু হয়। এই দুর্ঘটনার পর হরিহরবাবু ভাবিলেন "আমার দাম্পত্য-জীবনে দেবতার অভিসম্পাত আছে ; আমাকে একাকী রাখাই ভগবানের অভিলাষ ;—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধচারণ করিয়া কখনই সুখী হইতে সমর্থ হইব না, অতএব আমার দাম্পত্য-সুখের আশা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার বুদ্ধিমতী সহোদরা অহল্যা দেবীর নিকট তাঁহার এই মনোভাব গোপন রহিল না। তিনিও নানা উপায়ে তাঁহার শোকসন্তপ্ত সহোদরকে অন্যমনস্ক করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না ;—তাহার অব্যাহত গতি সততই অপ্রতিহত। এইভাবে দুঃখ সন্তাপের মধ্য দিয়া আর একটি বৎসর অতীতে বিলীন হইল। এ সংসারে কালের ন্যায় শোকসান্ত্বনাক্ষম কেহই নাই। হরিহরবাবু ক্রমে ক্রমে প্রকৃতস্থ হইয়া বৈষয়িক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। আজ রবিবার। আহারান্তে আজ আর কোনও কর্ম্মস্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই ; সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রথানুসারে আজ কিঞ্চিৎ বিলম্বে আহারে উপবেশন করিলেন, এবং নানাপ্রকার খোসগল্প করিতে করেতে তাঁহার সমাধা

করিয়া আরাম বাক্সে ঠেস দিয়া একখানি পুস্তক লইয়া শয়ন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভগ্নী অহল্যা দেবী ধীরে ধীরে আসিয়া সেই কক্ষে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হরিবাবু ঈষৎ ব্যস্তভাবে বলিলেন "দিদি, তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল?

অহল্যা দেবী আরও একটু নিকটস্থ হইয়া একখানি তালবৃন্ত গ্রহণ পূর্বক ব্যজন করিতে করিতে বলিলেন "না, এখনও হয় নি। আজ যে গরম,—তার উপর ভগবানের অসুখ করেছে; তাদের দেশের লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ বলে আমার কাছ হ'তে ছুটি নিয়ে গেছে;—তা তুমি একটু ঘুমোও, তারপর আমি যাব এখন।"

ব্যস্তভাবে তিনি উত্তর করিলেন "না না—তুমি খাও গে, আমার বেশী গ্রীষ্ম বোধ হয়নি।"

"তা যাচ্ছি। পাখা টানবার লোক নেই, কষ্ট হবে, তাই বলছিনু;—তা আমার একটু পরে গেলেও চলবে।"

"না না—তুমি আগে খেয়ে এস, আমি বেশ আছি, আমার কোনও কষ্ট হয় না।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে।"

"তোমার কথা আবার রাখা রাখি কি?—কি করতে হবে তাই বল।"

"দেখ হরি, আর এ রকম করে থাকাটা ভাল দেখায় না; আমি তোমার জন্য একটি পাত্রী স্থির করেছি; তোমাকে—

বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন "দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ঐ বিষয়টিতে আমাকে মাপ কর।"

অহল্যা দেবী বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং ঈষৎ অভিমান ভরে বলিলেন "কেন? এখন হ'তে কি আর আমার কোনও কথা এ বাড়ীতে খা'টবে না?"

হরিবাবু ত্রাস্ত ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"সে কি কথা দিদি! তুমি রাগ কর'ছ কেন?—তুমি বুঝে দেখ, যদি বিবাহ করে সুখে থাকা আমার ভাগ্যে থা'কতো, তাহ'লে আজ তোমাকে আর এ ভাবে আমাকে অনুরোধ করতে হ'ত না। তা' ছাড়া এ বয়সে আবার বিবাহ করাটা কেবল লোক হাসান মাত্র।"

অহল্যা দেবী ঈষৎ উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন—"কে তোমাকে এ সব বুদ্ধি দিয়েছে?—তোমার বয়সে কত লোকের প্রথম পক্ষের বেঁচে আছে। [illegible]

পুরুষকে জল দেবার একটা ছেলে নেই, আর বলে কি না বে' করবে না।"

হরিহরবাবু কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "আচ্ছা সে যা হয় হবে; এখন তুমি গিয়ে খাওয়া দাওয়া কর।"

অহল্যা দেবী কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মীমাংসা না করিয়া তিনি কিছুতেই আহারে স্বীকৃতা হইলেন না। অবশেষে বহু বাক্‌-বিতণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল যে, যদি কোনও সহায়-সম্পদ-হীন সদ্বংশসম্ভূতা দরিদ্রের কন্যা পাওয়া যায়, এবং কন্যার অভিভাবকগণের কোনও অমত না থাকে, তাহা হইলে তিনি বিনা পণে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন।

ভ্রাতা ভগ্নীর পরামর্শের ফলে, অত্যল্পকাল মধ্যে বিধাতার কৃপায় —নগেন্দ্রবাবুর দুঃখিনী বিধবা কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর। বি, এস, সি।

কবিকুঞ্জ।

ভাঙ্গা-গড়া।

তুমি যা গড়েছ বিশ্বে হে সর্ব্বজ্ঞ হরি।
পবিত্র সুন্দর ভক্ত মনোহর করি॥
আমি তারে অসম্পূর্ণ ভাবি রূপহীন।
ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে গর্ব্বে গড়ি নিশিদিন॥
তাই মোর সর্ব্ব শ্রম করিয়া বিফল।
থামায়ে দিয়েছ মোর কর্ম্ম কোলাহল।
গর্ব্বহারি! করি তব ন্যায় বজ্রপাত॥
শ্রমে গড়া রমা-সৌধ চূর্ণি অকস্মাৎ॥
আমি যা গড়িতে গেছি (প্রভো) ভেঙ্গেছি কেবল।
তুমি যা ভেঙ্গেছ তারে দিয়ে নববল॥
রেখেছ ভুবনে প্রভু করিয়া সফল।
বিফল সঙ্কল্প আশা বিসর্জ্জিয়া সব॥
সব তুচ্ছ-স্বপ্ন-সম করেছে তোমার।
ইচ্ছামত কর্ম্ম তব সাধিব (হে) অনিবার॥

শ্রী[illegible] চৌধুরী।

মাধুর্য্য।

সুধাংশু গগনে দেখে উদাস চকোর।
চেয়ে চেয়ে চলে যায় অস্তে তারা ভোর॥
কমলিনী চেয়ে রয়, দেখে চেয়ে ভানু।
তাতে কি সুখ আছে সে জানে আর ভানু॥
গুণ গুণ গান করে আকুল মধুপ।
দিয়ে মধু ফুলবধু শুনে চুপ চুপ॥
মারুত বহিয়া যায় শোঁ শোঁ সুধু করে।
কুসুম পরাগ খুলে সোহাগে আদরে॥
দূর হতে মেঘ ডাকে শিখি নাচে সুখে।
ভাবে ভাবে বুঝে লয় দূরে কি সম্মুখে॥
অধরে অধর দিয়ে করিলে চুম্বন।
উথলিবে সুধাসিন্ধু কে করে বারণ।
চেয়ে চেয়ে কত সুখ পরশে পরশে।
এখানে জগত মুগ্ধ মধুরতা রসে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্ন।

১। দ্বি অক্ষর নাম তার কিবা নামধারী
নিচেতে পুরুষ তার উপরেতে নারী।
মুখেতে করিয়া গ্রাস উদরে চিবায়,
তাহার উচ্ছিষ্ট দেব দ্বিজগণে খায়।

২। "আ" পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রাণীনাং; "বি" পূর্ব্বক মহতাদপি।
"প্র" পূর্ব্বক শাপরাধিনাং; কেবলং যুবতী প্রিয়॥

৩। রূপক, অলঙ্কার, উপমা ও অর্থগৌরবযুক্ত একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করুন।

নিবেদন—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা বশতঃ যথাসময়ে আলোচনা প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়া আমার উপর পত্রিকা পরিচালনের ভারার্পণ করেন কিন্তু ছাপাখানা বদলের জন্য প্রেস এক্টের বিধানানুযায়ী ডিক্লারেসন প্রভৃতি গ্রহণের জন্য পত্রিকা প্রকাশে অযথা বহু বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট আমার করযোড়ে প্রার্থনা, যেন তাঁহারা আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী সরলান্তঃকরণে মার্জ্জনা করেন। ইতি নিবেদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সরস্বতী। ম্যানেজার আলোচনা পত্রিকা।

21 JUL 22

আলোচনা ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭ সাল।

এত কষ্ট কেন ?

আজ দুর্ভিক্ষ, কাল ঝটিকাবর্ত্ত, পরশু জলপ্লাবন—একটা না একটা লাগিয়াই আছে। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির যখন এই অবস্থা,—আনন্দমুখরিত বঙ্গপল্লীতে যখন নীরাশার ঢেউ আসিয়া সমস্ত কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে,—যখন অন্নাভাবে দেশময় একটা অব্যক্ত যাতনার ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন একবার আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি, এত কষ্ট কেন হইতেছে? এই কষ্ট লাঘব করিবার উপায় কি আমাদের হাতে কিছুই নাই ?

প্রথমে অন্ন-বস্ত্রের কথা। অবাধ বাণিজ্য দেশকে সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসাক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়াছে। দেশের ধান যখন দেশেই থাকিত, বাণিজ্য স্রোত যখন এত প্রবল ভাবে দেশ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, তখন ধানের দর এত বেশী ছিল না। কিন্তু যে স্রোত বহিতেছে তাহা রোধ করে কে? দেশের লোক—যাহাদের হাতে ধান আছে, তাহাদের এমন শিক্ষা হয় নাই যে, দেশের মঙ্গল অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—পরোক্ষে নিজেদেরও যে অনিষ্ট হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া এই বাণিজ্য-স্রোতের পথে বাধা দিতে পারে। চাই টাকা, সেই টাকার লোভে আমাদের প্রধান খাদ্য সব বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার পরিবর্ত্তে অজস্র টাকা দেশে আসিতেছে। কিন্তু কেবল টাকাই ত লোকের দুঃখমোচন করিতে সমর্থ নহে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িল। একজন অর্থলোভী অর্থের জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করিতে থাকে; তাহার কঠোর তপস্যায় ভগবান্ প্রীত হইয়া তাহাকে বর লইবার জন্য বলেন, তাহাতে সে এই বর চাহিল যে, সে যে দ্রব্য স্পর্শ করিবে তাহাই যেন সোনা হইয়া যায়। ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তাহার পর সে মহানন্দে গৃহমধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করিতে লাগিল, নিমেষের মধ্যে সমস্ত সুবর্ণে পরিণত হইল, তাহার আর আনন্দ ধরে না; অতঃপর আহার করিতে বসিল, আহার্য্য দ্রব্যে হাত দিবা মাত্র তাহাও সোনা হইয়া গেল, তখন সে খায় কি? তখন সে বুঝিতে পারিল, সে যে বর পাইয়াছে তাহা তাহার সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। আমাদের অবস্থাও অনেকটা এই রকমের হইয়া

দাঁড়াইতেছে। এ অবস্থায় দেশাত্মবোধ লোকের মনে জাগরিত না হইলে আমার দোষে আমার দেশের শত শত লোকের কষ্ট হইতে পারে সুতরাং ত্যাগ স্বীকার করিয়াও দেশের উপকার করিব এইরূপ ভাব হৃদয়ে না জাগিলে কেন ফলোদয় হইবে না।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাঙ্গালা দেশের লোক আজ অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে কেন? শুধু অবাধ বাণিজ্যের উপর দোষ চাপাইলেও চলে না। নৈসর্গিক কারণেও অনেক সময় ফসলের টান ঘটিতেছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়—এ সব ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল, যাগ যজ্ঞ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইত, তখন এরূপ ঘন ঘন ঋতুবিপর্য্যয়ের কথা শুনা যাইত না। কিন্তু লোকের মনে এখন সে ধর্ম্মভাব আর নাই, শাস্ত্রানুষ্ঠানে আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি, যথেচ্ছাচারের প্রবল বাত্যায় আমরা আলোড়িত হইতেছি; সঙ্গে সঙ্গে দেবগণও বুঝি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া আমাদের ফসলোৎপন্নোপযোগী ঋতুরও বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিতেছেন। আজকাল পরাবিদ্যায় অনেকেই আস্থাবান; যদি পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের কথা মানিতে হয় তাহা হইলে দেবগণের রোষের জন্য যে এইরূপ ঋতুবিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নয়, তাহাও ধারণা করা যাইতে পারে। উঁহাদের মতে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সন্তোষ বা অসন্তোষের উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করে।

আমাদের উপস্থিত বস্ত্র-কষ্টের কারণ আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। লজ্জানিবারণের জন্য আমাদিগকে বৈদেশিক বিপনীর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। তুলার বাজার বৈদেশিকের হাতে, কাপড়ের কল অধিকাংশই তাই। যাহারা এই সকল কলে কাজ করে, তাহাদের মজুরীও বাড়িয়া গিয়াছে সুতরাং কাপড়ের দর যাহা উঠিয়াছে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় হ্রাস হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আমাদের দুঃখ অনিবার্য্য, আর এই দুঃখ অচিরে মোচন হইবারও আশা নাই। কিন্তু আমাদের এমন এক সময় ছিল, যখন এই কাপড়ের জন্য আমাদিগকে কোন ভাবনাই ভাবিতে হইত না। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে চরকায় সূতা কাটিয়া দিত, পরে তাহা তাঁতিবাড়ী হইতে সামান্য "বাণী"তে কাপড় হইয়া আসিয়া গৃহস্থের লজ্জানিবারণ করিত। এখন পল্লী-লক্ষ্মীদের গৃহাঙ্গন হইতে সে চরকা অনেক দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, পাড়ার তাঁতি-গ্রামে আর অন্নসংস্থানের উপায় দেখিতে না পাইয়া চটকলের কাজে লাগিয়া গিয়া

নিজের হাড় নিজে পিষিয়া কোন রকমে হাড়ে-মাসে জড়িত হইয়া জীবন কাটাইতেছে। বিলাসিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া—বিলাতী কাপড়ের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিয়াছি। তুলাও আর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় জন্মায় না, ঘরে চরকাও আর নাই ও কেহ রাখিতে ইচ্ছাও করেন না। সুতরাং পরমুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ফলে, দেশময় অতি করুণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—৬৲ টাকা যোড়া কাপড় কিনিবার কয়জনের শক্তি আছে? দেশে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই ত বেশী, তাহারা যে ভাবে দিন কাটাইতেছেন তাহা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এ দুর্দ্দিনে দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি? তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, ঘরের অভাব যাহাতে ঘরেই মিটে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষককে বল,—পাটচাষ ছাড়িয়া তুলার চাষে মন দিক্, গৃহস্থ-বধূকে উপদেশ দাও,—নাটক নভেলে সময় না কাটাইয়া চরকা লইয়া বসুক, তাঁতিকে বল, চটকলের কাজ ছাড়িয়া আবার সেই পুরাতন তাঁতঘরে আসিয়া কাজ করুক; দেশের উপকার হইবে নিজের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে, আর নিজের স্বাস্থ্যকেও নষ্ট করিতে হইবে না।

দোষ কি আমাদের নাই? দোষ আমাদের অনেক রকমে আছে। পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই অথচ বাবুয়ানার মাত্রা দিন দিন বেশ চড়িয়া যাইতেছে। এত জুতা, জামা, ছড়ি, এসেন্স, সাবান, সুগন্ধি তৈল কি তখনকার দিনে ছিল, না লোকে এই সকলের অভাব অনুভব করিত? আমরা বাবুয়ানা করিতে গিয়া, নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা নিজেদিগকে লোকের নিকট বড় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অনেক নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া ফেলি, আর সেই সকল অভাব যথোচিতরূপে পূরণ করিতে না পারিয়া আমরা কত কষ্টই না অনুভব করিয়া থাকি। হিন্দু আমরা—আমাদের দৃষ্টি বরাবর আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই আবদ্ধ ছিল, বাহ্যিক চাকচিক্য হিন্দুর চক্ষে কিছুই নহে, হিন্দু আধ্যাত্মিক (spiritual) উন্নতির উপাসক, বাহ্যিক (material) উন্নতির উপাসক নহে। সেই জন্য পরিধেয় কিংবা আহার্য্যের বিষয়ে হিন্দুর চিরকালই সরলতা ছিল। সাত্ত্বিক আহারে দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া, সামান্য পরিধেয় বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া হিন্দুগণ পুরাকালে যেরূপ ভাবে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন—শুধু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কেন, যেরূপ উচ্চ হৃদয়ের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আজকালকার কালে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংরাজীতে যাহাকে "plain living and high thinking" বলে তাহা এই ভারতবর্ষেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। সেই সত্য—সরল—সনাতন পথ হইতে আমরা বিচলিত হইয়া কতই না নূতন নূতন অভাবের ও তৎসঙ্গে নূতন নূতন কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছি!

তারপর স্বাস্থ্যের কথা,—রোগ-শোক আজকাল লাগিয়াই আছে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামকে গ্রাম গ্রাস করিয়া উৎসন্ন করিতেছে। এত ম্যালেরিয়া এত রোগ দেশে আগে ছিল না, এখন কেন বাড়িতেছে? কেহ কেহ বলেন, যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে দেহের পরিপুষ্টি না হইয়া লোকের রোগ-নিবারণ-ক্ষমতা কমিয়াছে, সেই জন্য রোগাক্রান্ত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, দেশে বনজঙ্গল বাড়িতেছে, ভাল পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না, সেই জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িতেছে। যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি কারণ আছে যাহা আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে দূরীভূত করিতে পারি। বাঙ্গালার মফঃস্বলে পানীয় জলের অভাব ক্রমে ক্রমে এক বিষম সমস্যার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার তখনকার লোকের পক্ষে একটী ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত, তখন এমন গ্রাম ছিল না যেখানে ভাল পানীয় জলের অভাব হইত। এখনও অনেক গ্রামে বড় বড় পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা হয়ত সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। তাহা সংস্কার করিয়া যে সাধারণের উপকার করিব, এ ভাবটা যেন লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাঁহাদের দু'পয়সা আছে, তাঁহারা সহরে গিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে জল কিনিয়া খাইতেছেন আর যাঁহাদের সে উপায় নাই, তাঁহারা পচা জলই খাইয়া জীবন হারাইতেছেন, তাহাদিগকে দেখিবার কেহ নাই। পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাটেরও অবস্থা ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। রাস্তা ঘাটের কিংবা পয়ঃ প্রণালীর উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক, লোকের মনের অবস্থা আজকাল এমন হইতেছে যে, অনেকে রাস্তার জায়গা কিংবা পয়ঃ প্রণালী ঘেরিয়া লইয়া নিজ জায়গার অন্তর্ভুক্ত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মোটের উপর দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে ধর্ম্মভাবের প্রভাবে বঙ্গে অসংখ্য তড়াগের আবির্ভাব হইয়াছিল;—যাহার প্রভাবে বৃহৎ বৃহৎ রাজবর্ত্মের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, বেদীনির্ম্মাণ, পঞ্চবটী স্থাপন, নাটমন্দির

নির্ম্মাণ প্রভৃতি পল্লীর মঙ্গলময় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে সে ধর্ম্মভাব আর নাই, তাহার স্থলে কি আসিয়াছে?—আসিয়াছে, স্বার্থপরতা, কলহপ্রিয়তা, দলাদলি আর মামলা মকর্দ্দমা। যদি দেশের মঙ্গল চাও, যদি দেশের লোককে বাঁচাইতে চাও, যদি পুরাকালের সুখশান্তি আনয়ন করিতে চাও তাহা হইলে আবার ধর্ম্মের বন্যা বহাইয়া দাও, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানে আস্থাবান্ হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত কর, আবার পুষ্করিণীতে স্বচ্ছ সলিল হাসিতে থাকিবে, আগাছা দূরীভূত হইয়া তাহার স্থলে পঞ্চবটী বসিবে, বট-অশ্বথের মধুর ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল করিবে, গোময়লেপন ও তুলসীবৃক্ষে গৃহ-প্রাঙ্গণ পবিত্র হইবে, রোগ-শোক বাপ্‌বাপ্ করিয়া দূরে পলাইবে।

আমাদের জীবনযাত্রা অনেক রকমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা উত্তরোত্তর কিরূপ কষ্টকর হইতেছে তাহা আর বলিবার নহে; কন্যার বিবাহ দেওয়া যেরূপ ব্যয়সাধ্য, পুত্রকে শিক্ষিত করাও তদনুরূপ। তখনকার দিনে সামান্য বেতন বা "সিধা" দিয়াই লেখাপড়া শেখা চলিত, কিন্তু এখনকার দিনে তাহা হইবার 'যো' নাই, স্কুল কলেজে ঢুকিতেই হইবে, বিদ্যালয়ের গোটাকতক ছাপ লইতেই হইবে, তাহা না হইলে মানুষ হয় না; আর গৃহস্থের কষ্টলব্ধ অর্থ জল করিয়া যখন সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয় তখন ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখিতে থাকে ও গৃহস্থের ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে, এত অর্থব্যয়, এত কষ্টস্বীকার তখন ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। আমাদের যে চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রী গ্রহণের জন্য নিয়োজিত হয়, তাহা যদি অন্য কোন কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে সাধারণ গৃহস্থের অনেকটা কষ্টের লাঘব হইত।

শুধু খাওয়া পরা লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে আমোদ আহ্লাদও চাই; একঘেয়ে জীবন কেহ কাটাইতে পারে না, তাহাতে স্বাস্থ্য ও মনের অবনতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় আর উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বহে না, বাঙ্গালী-জীবন এখন শুষ্ক মরুভূমিপ্রায়। এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইত, যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা প্রকার উৎসবের তরঙ্গ আমাদের কর্ম্মময় জীবনকে সর্ব্বদা সরস করিয়া রাখিত। অশিক্ষিত লোকেও শাস্ত্রের মধুর ব্যাখ্যা ও উপদেশপূর্ণ উপাখ্যানাদি শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান

অর্জ্জন করিত। যাঁহাদের সঙ্গতি থাকিত তাঁহারা ঐ সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন, আর পল্লীর অন্যান্য সকলেই বিনা অর্থব্যয়ে সেই সকল উৎসব আমোদ উপভোগ করিতে পারিত। হায়! সে দিন আর নাই। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের উৎসবের তরঙ্গ থামিয়া গিয়াছে; কথকতা, ভাগবত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত পাঠ এখন আর বড় একটা হয় না; সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের রোল গ্রামকে মাতাইয়া তুলে না। এখন যাত্রা কবির পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে সহরে বাঁধা ষ্টেজের থিয়েটার বায়স্কোপ চলিতেছে, আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা হইলে পয়সা খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া প্রবেশ লাভ করিতে হইবে। সে সরল স্বাভাবিক আমোদের স্থলে এখন ব্যয়সাধ্য অস্বাভাবিক আমোদ স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমাদের নৈতিক জীবনের অবনতি হইয়াও অনেক অশান্তি ও দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। দয়া-দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, অতিথিসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী পূর্ব্বের ন্যায় আর দেখিতে পাওয়া যায় কি? কে কাহার দুঃখ দেখে, কে কাহার দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করে? যে সহানুভূতির পীযূষধারায় সিক্তি হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইতে পারে, মানুষ দেবতা হইতে পারে, যে সহানুভূতির বলে আপনাকে পর করিয়া পরকে আপন করা যায়, যে সহানুভূতি এই সংসার-মরুতে রম্য উপবনস্বরূপ, তাহা আমরা হারাইয়াছি। এমন একদিন ছিল, যখন বাড়ীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম হইলে, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য লোকের অভাব হইত না, আর তাহার জন্য বাজে অতিরিক্ত অর্থব্যয়েরও আবশ্যক হইত না। পাড়ার গৃহিণীরা আসিয়া পাকশালা ও ভাণ্ডারের ভার লইতেন, প্রতিবেশিগণ সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন, একজনের বাড়ীর কাজ হইলেও তাহা যেন গ্রামের সমস্ত লোকের কাজ, কর্ম্মের বাড়ীর কোন ত্রুটী হইলে যেন সমস্ত গ্রামের একটা লজ্জার বিষয় হইবে, এইরূপ ভাব সকলের মনে ছিল। কিন্তু সে ভাব এখন আর আছে কি? এখন ক্রিয়া-কর্ম্ম বেতনভোগী লোকের দ্বারা করাইতে হয়। কোন কোন স্থলে এমন অবস্থাও দেখা গিয়াছে যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যও আজ-কাল লোকের অভাব হইয়া থাকে।

দেশের লোক উৎসন্ন যাইতেছে অনেক কারণে। তার মধ্যে আর একটী প্রধান কারণ হইতেছে,—মামলা মোকদ্দমা। এই সকলের আধিক্যের হেতু হইতেছে—লোকের নৈতিক অবনতি, ধর্ম্মভাবের অভাব, অধর্ম্মের বিস্তার। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া অবাধে সরলভাবে সমাধা হইত, এখন

তাহাই লেখাপড়ার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভাল ভাল সাক্ষী রাখিয়াও পরে মোকদ্দমা ভিন্ন নিষ্পত্তি হয় না; যেন মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া আদালতের চক্ষে ধুলি দিতে পারিলেই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়।

তাই বলি, আমাদের যে এত দুঃখ, এত কষ্ট, তাহার জন্য কি আমাদের কোন দোষ নাই? সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপাসক আমরা, আমরা কি আমাদের শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া চলিয়া থাকি? ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিগণ তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করিয়া আমাদের জন্য সত্য সরল সনাতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিলে এই ভবসংসারের অনেক দুঃখ নিবারিত হয়, কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট আমাদের যে আমরা আপনাদিগকে বিপথেই লইয়া যাইতেছি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল্।

কে তুমি?

প্রজ্জ্বলিত প্রভাকর, উজলিয়া দিগন্তর,
জবাপুষ্প আরক্ত বয়ান।
সুনীল অম্বরে ভায়, অনন্ত কিরণ তায়,
চমকায় সতত অন্তর॥
উজ্জ্বল কিরণ মালা, উরসে করয়ে খেলা,
উজলিয়ে হিমাদ্রি সতত।
কনক-মুকুট শিরে, ধর্ম্ম মোক্ষ দুই করে,
কে তুমি হে পবিত্র সরত॥
এ সংসার উদ্যান, নর-হৃদি সিংহাসন,
কে রচিলা, হে চির সুন্দর!
কাহার শকতি বলে, চলে জীব কুতূহলে,
কার প্রেমে পূর্ণ এ অন্তর?
কোটী সূর্য্য অঙ্গে ধরি, ঘন ঘোর অপসারি,
দাঁড়ালে সম্মুখে আসি মোর।
সহসা গভীর তানে, সুমহান্ বেদ-গানে,
ভাঙ্গালে মম মোহের ঘোর?
নীরব নীরব সব, নীঝর নীরব রব,
স্রোতস্বতী বহিলা উজান।

মন্দ্রিলা ভূধর বর, আকর্ণি গম্ভীর স্বর,
ঘন ঘন ছলিল পরাণ॥
প্রশান্ত জলধি কায়, সুবিশাল নীলিমায়,
ভাসে ছবি মহীমা মহান্।
শত মুখে মহাপ্রাণ, উঠিলা মঙ্গল গান,
ভাসাইয়া তাপিত বয়ান॥
"ঈশ্বর" মঙ্গলময়, সুললিত তান লয়,
মহাচ্ছন্দে গাহিছে পরাণ।
এস, করুণা আধার, তব দত্ত হৃদি মোর,
কর তার তোমার অয়ন॥

শ্রীরঙ্গলাল মিত্র।

প্রার্থনা।

সত্য নিরঞ্জন শ্রীমধুসূদন, ভব তারণ কারণ,
কলুষনাশন, মরণ বারণ, তুমি হে ভূতভাবন।
(তুমি) অনাদি অনন্ত, অব্যক্ত অচিন্ত্য, তুমি হে জগৎপতি,
তুমি মূলাধার, ভব কর্ণধার, দীনে দাও হে শকতি।
এ ভব সাগরে, তব কর্ম্মতরে, যেন অর্পিতে জীবন,
না হই দুর্ব্বল, দাও হেন বল, হে ভক্ত-ভয় ভঞ্জন।
তোমারি রচিত, তোমারি পালিত, এ সংসার মাঝারে,
সাজি' কর্ম্মিবেশে, তোমার আদেশে জন্মেছি নরাকারে।
তুমি লীলাময়, ওহে দয়াময়, কে বুঝিবে তব খেলা,
তামাসা দেখিতে, পাঠায়ে মহীতে, করিছ এ ভবমেলা।
দাঁড়ায়ে ওপারে, দেখিছ সবারে, কে কোন্ পথে যায়,
উৎপত্তির স্থল, নিবৃত্তির কাল, সকলি তোমার পায়।
তাই যত লোক, যেতে তব লোক, তব পানে সদা ধায়,
ভিন্ন ভিন্ন পথে চলয়ে জগতে, অন্তে সবে তোমা' পায়।
প্রহেলিকাময় ওহে দয়াময়, রচিত সংসার তব,
তব কৃপা বিনা এ অধম জনা, কেমনে তরিবে ভব।

শ্রীগিরিজাকান্ত শর্ম্মা।

হতাশ-প্রেম।

(১)

হুগলী-জেলার খালনা গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় একজন গুণী, জ্ঞানী ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র—শ্রীমান কমলকৃষ্ণের উপর সমুদায় জমিদারীর ভারার্পণ করিয়া বৃদ্ধবয়সে ত্রিবেণী সঙ্গম প্রয়াগতীর্থে বসবাস করিবার মানসে এই কয়েক বৎসর হইল, একখানি দ্বিতল অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন। সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সেই অট্টালিকার পাদচুম্বন করিয়া ভাগিরথী তরতরবেগে অদূরেই ত্রিসখীতে মিলিয়া মিশিয়া সেই অনন্ত মহানের উদ্দেশে অনন্ত সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন। বৃদ্ধ রমণীমোহন ও বৃদ্ধা পার্ব্বতী দেবী এবং তাঁহাদের বড় আদরের, বড় স্নেহের পুতলী একমাত্র পৌত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবীকে লইয়া এই অট্টালিকায় মহানন্দে বসবাস করিতেছেন। বালিকা নিরুপমা এই সবে মাত্র দাঁতের কোঠা ছাড়াইয়া অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

বৃদ্ধ রমণীমোহন পৌত্রীকে বিদুষী করিবার মানসে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পুস্তক লইয়া পাঠাভ্যাস করাইতে থাকেন। নিরুপমা প্রথম প্রথম ততটা মনোযোগী না হইলেও পিতামহের আগ্রহাতিশয্যে ক্রমশঃ বর্ণজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সাঙ্গ করিয়া ফেলিল। বোধোদয় পাঠ করিয়া তাহার বোধের শান্তি না হইয়া আরও বোধের বিকাশ আরম্ভ হইল; যেন মন্দাকিনীর পঙ্কোদ্ধারে তর তর বেগে স্রোত ছুটিল। তাই বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে শান্তি গাহিয়াছিল—"যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

(২)

"হ্যাঁগা—বলি নাত্নীকে নিয়েই যে দিনরাত কাটাচ্ছ! "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" না কি ঐই সমস্ত শোলোক আউড়ে, ছেলেকে বুঝিয়ে যে, দেশের মুল রাজ্যের কূল এই তীর্থি করতে এলে, তার কি হ'ল?

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল। রমণীমোহন আবেগকণ্ঠে বলিলেন—"ঠিক ব'লেছ গিন্নী, সন্ধ্যাহ্নিকও যে সময় হয় না! নিরু, তুই ভাই একটা মাষ্টার দেখ; আমায় আর বুড়োবয়সে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করাস না। কালই তোর জন্য মিস চা[illegible] বন্দোবস্ত করে দেব—সে এ অঞ্চলে শিক্ষয়িত্রীর

কাজ করিয়া বেশ পসার করিয়াছে। আর মেয়েটিও খুব শিক্ষিতা। সে দিন রেভারেণ্ড মিঃ হপকিনের সহিত আলাপ হয়েছিল; বেশ অমায়িক ভদ্রলোক কিন্তু—তাঁহারই মুখে মিস্ চারুর কথা শুনিয়াছি। এ কয়দিন হতেই মনে ক'রছিলাম কিন্তু হয়েও উঠে না—যাই হ'ক আজ গিন্নীও যখন মুখ ফুটে বল্লে তখন আর নয়। কি বলিস্ ভাই নিরু তোর কোনও অমত আছে?"

"না ঠাকুরদা,—আমার কোন অমত নাই। আপনার সাধনায় বিঘ্ন করতে চাহি না, আমার শিক্ষার জন্য মিস্ চারুকেই বন্দোবস্ত করে দেবেন।

দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মিস্ চারু, নিরুপমাকে স্থানীয় মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে এবং বিদ্যালয়ের ছুটীর পর সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়াও তাহাকে পাঠাভ্যাস করাইয়া যান।

এইরূপে সারাদিবস ও রাত্রির একভাগ নিরুপমার বিদ্যাশিক্ষাতেই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কথায় বলে "সংসর্গ দোষে—শতগুণ নাশে" আমাদের নিরুপমার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাটাই ক্রমশঃ খাটিতে লাগিল। সে অহর্নিশি মিশনারী বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীদিগের সহবাসে ক্রমশঃ আপনার কৌলিক রীতি নীতি ভুলিয়া খৃষ্টীয় ভাবের ভাবুকা হইতে লাগিল। তাহার চালচলন হাবভাব সমস্তই সেই পাশ্চাত্যভাবে মাখান হইয়া যেন হিন্দু সরস্বতী গাউন পরা, মোজা আঁটা, পিয়ানো ধরিয়া লেডী অক্টেভিয়া হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ রমণীমোহন বাবু পৌত্রীর এ রুচি পরিবর্ত্তনে ততটা দৃক্‌পাত করিতেন না। আদরের পৌত্রীকে বিশেষ আদর দিয়া তিনি তাহাকে আরও উৎসাহিতা করিতেন কিন্তু সেকালের গৃহিণী পার্ব্বতীদেবীর এ বিসদৃশ ভাবটা যেন কেমন কেমন ঠেকিত।

(৩)

ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত নরেন্দ্রনাথ রায় নামক একটি যুবক এলাহাবাদে আসিয়া নানাস্থানে আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া যখন হতাশ্বাস হইল, তখন সে নানা-চিন্তা করিয়া ভাগীরথীর তীর ধরিয়া অবশেষে নিরুপমাদের বাটীর বহির্দ্বারের রোয়াকে বসিয়া একটা হতাশের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছে। নিকটে কেহ কোথাও নাই যে কিছু যাচ্ঞা করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করে! সেদিন একাদশী তিথী—নিরুপমা বিদ্যালয়ে গিয়াছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্নানার্থে ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়াছিলেন; উভয়ে স্নানান্তে দ্বিপ্রহরে হরিনামামৃত পান করিতে করিতে পদব্রজে

বাটীর ঘরে আসিয়া দেখেন যে এক বিষন্ন বদন জীর্ণ-শীর্ণ ক্লান্ত যুবক হতাশ-ভাবে ব্যাকুলান্তঃকরণে বসিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ দয়ার্দ্রচিত্তে যুবকের পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, সে আজ তিন দিন যাবত অনাহারে রহিয়াছে। তিনি ব্যস্তভাবে দ্বার খুলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটি ঝি ছিল; রমণী বাবু তাহাকে সত্বর খাদ্যদ্রব্য আনয়নার্থ বাজারে পাঠাইয়া দিয়া যুবক নরেনকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে ঝি খাদ্যদ্রব্য লইয়া ফিরিল। তিনি নরেনকে পরিতোষ সহকারে আহারাদি করাইয়া বিশ্রামার্থ একটি কক্ষ দেখাইয়া দিয়া আপনাদিগের নিত্যকর্ম্মার্থ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। তুমি সুখী হও, দুঃখী হও যেরূপেই হউক তোমার দিন কাটিয়া যাইবে। আমাদের নরেনেরও দিন কাটিতে লাগিল। বৃদ্ধ রমণীমোহন বাবু নিজের অমায়িক ও সদাশয়তা গুণে, এলাহাবাদ অঞ্চলে প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় নরেন একজন ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়ে প্রথমে অল্প বেতনে সামান্য একটি সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; পরে আপনার কার্য্যদক্ষতাগুণে সে ক্রমশঃ সেই ব্যবসায়ীর একজন বিশিষ্ট অংশীদার রূপে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল।

রমণীমোহন বাবু নরেনের প্রতিভা ও নম্রতাগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। সে অন্যত্র চাকুরী করিলেও তাহাকে অন্য বাসায় থাকিতে দেন নাই, তিনি তাহাকে নিজ বাসাতেই পূর্ব্বের ন্যায় আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "সঙ্গ দোষে—শতগুণ নাশে"; নিরুপমা এখন আর দেবপ্রতিমা দেখিলে মস্তক নত করে না; বৃদ্ধ পিতামহ ও বৃদ্ধা পিতামহীর দুইবেলা সন্ধ্যাহ্নিকাদি পূজার্চ্চনাকে ভৌতিককাণ্ড বলিয়া উপহাস করে; শালগ্রাম-শিলাকে নুড়ীর সামিল করিয়া নিজের জ্ঞান গরিমার তারিফ করে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, পৌত্রীর এতাদৃশ জ্ঞান গরিমায় যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেও, নিরুপমার ইহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। তাঁহারা তাহাকে ২।৩ বার দেশে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কান্নাকাটিতে মুগ্ধ হইয়া স্নেহময় পিতামহ আর তাহাকে দেশে পাঠাইবার নাম পর্য্যন্তও করিতেন না। পুত্র কমলকৃষ্ণ সময়ে সময়ে পিতামাতাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইলেও কন্যা নিরুপমার ন্যায় অতটা সভ্য হইতে পারেন নাই। তবে কন্যার সম্বন্ধে তিনি এতটা জানিতে পারিতেন না,—কারণ স্নেহময় পিতামহ পৌত্রীর দোষের বিষয় পুত্রকে কিছুই না জানাইয়া গুণের কথা বলিতেই

পঞ্চমুখ হইতেন। বৃদ্ধা মাতাও পুত্রকে দুদিনের জন্য আগত দেখিয়া আর ও সম্বন্ধে তেমন কিছুই উচ্চবাচ্য করিতেন না; তবে নিরু যে বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাই তিনি পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিতেন। বাস্তবিক নিরুপমা এখন ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; আগত যৌবনের জোয়ার তাহার কূলে কূলে আসিয়া পৌঁছিতেছে, অথচ বিবাহের নাম পর্যান্তও নাই!

(৪)

নরেন শিক্ষিত যুবক, তাহার সহিত যে বিদুষী নিরুপমার সদ্ভাব হইবে না তাহা কে বলিল! নরেনের সহিত নিরুপমার প্রায়ই পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয় লইয়া চর্চ্চা হইত কিন্তু তর্কস্থলে নরেন সর্ব্বদাই প্রাচ্য সাহিত্য দর্শনেতিহাসেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিত। এবম্বিধ আলোচনায় প্রাচ্য সাহিত্যা-নভিজ্ঞা নিরুপমা মধ্যে মধ্যে এ সমস্ত বিষয়ের উপযুক্ত প্রমাণাদি প্রয়োগ করিতে পারিত না বলিয়া, সে নরেনের নিকট প্রায়ই তর্কযুদ্ধে পরাজিতা হইত।

নরেনও নিরুপমাকে নিজ কৌলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসিনী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ছিল; তাই সে প্রাচ্য সভ্যতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া নিরুপমাকে পুনরায় নিজ স্বধর্ম্মে অনুরাগিণী করিবার জন্য নানারূপ দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ শাস্ত্রার্থগুলি অতি সরল ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সাধনাতে সিদ্ধি লাভ হয়—ইহা আমাদেরই শাস্ত্রবাক্য এবং এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উদাহরণেরও অভাব নাই। আমাদের নিরুপমাও ক্রমে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে লাগিল। অবশেষে সে শাস্ত্রবাক্যে এতদূর শ্রদ্ধাবতী হইল যে, সে বাহ্যিক চাকচিক্যশালী খৃষ্ট ধর্ম্মের সমুদায় উপদেশ ভুলিয়া গিয়া গাউন, মোজা ছাড়িয়া একেবারে লালবাড়ীতে মজিয়া গেল। এখন সে সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণে থাকিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পূজার্চ্চনায় সহায়তা করিতে লাগিল। মানবের যৌবনকালটা সব চেয়ে বড় বিষম কাল। এ সময়ে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ই সতেজ হইয়া থাকে। তজ্জন্য যে যেমনই হউক তাহার চাঞ্চল্য বাড়িবেই। আমাদের নিরুপমা ও নরেনের তাহাই হইল। একত্রে বসবাসে ক্রমশঃ উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিরুপমা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া আগত যৌবনা; নরেন দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক! আজকাল প্রায়ঃ সর্ব্বদাই নির্জ্জনে তাহারা কথোপকথন করে। একদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ রমণীমোহন বাবু বাহিরে যাইবার জন্য বহির্দ্বারের অর্গলমুক্ত করিতে যাইয়া

দেখেন—তাহা পূর্ব্ব হইতেই মুক্ত! তখন বাটীর কেহই উঠে নাই অথচ দ্বার অর্গলমুক্ত কেন? তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে পুনরায় নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া গৃহিণীকে উঠাইলেন এবং সন্দেহের কথা জানাইলেন। গৃহিণী পার্ব্বতী দেবী নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিরুপমাকে ডাকিতে যাইয়া দেখেন যে তাহারও শয়নকক্ষের দ্বার খোলা! গৃহের আসবাব পত্র ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অথচ নিরুপমা নাই! রমণীমোহন বাবুও গৃহিণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন; সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইলেন। নরেনের শয়নকক্ষে যাইয়া দেখেন, তাহাও তথৈবচ! বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না—লোকনিন্দার ভয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নীরব রহিলেন।

(৫)

পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা জেলার এক গণ্ডগ্রামে নরেন নিরুপমাকে লইয়া বসবাস করিতেছে। মাদকের মোহে যাহা করা যায়, তাহা সেই সময়েই ভাল লাগে কিন্তু নেশা ছুটিয়া যাইলে আর ভাল লাগে না। নিরুপমাও মোহের ঘোরে নরেনের সহিত চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এখানে আসিয়া কয়েকদিন বাদেই তাহার নেশা কাটিয়া গেল। সেই স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীর বক্ষে যে কি শেলাঘাত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল! অবশেষে সে একদিন নরেনকে বলিল,—দেখ ভাই নরেন আমি আর এরূপ ভাবে থাকিতে পারি না, তুমি চল আমায় পিতামহের আশ্রয়ে রাখিয়া আসিবে। তিনি সদাশয় পুরুষ, আমার এ চাঞ্চল্য অবশ্যই তিনি ক্ষমা করিবেন। ভাই,—যাহা বৈধ নয়,তাহা কদাচ শান্তিদায়ক নহে, এ কয়দিনে ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি।

নরেনও এ কয়দিন বড় অন্যমনস্ক ছিল। সেও যে বৃদ্ধের বুকে শেলাঘাত করিয়া আসিয়াছে! তবে সে পুরুষ—মনোভাব মনেই রাখিয়াছিল কিন্তু আজ এ বালিকার মুখে একি কথা! 'যাহা বৈধ নয়, তাহা কদাচ শান্তি দায়ক নহে';—এই কথাই উত্তরোত্তর তাহার প্রাণে ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, আবেগভরে বলিল,—নিরু, নিরু—ঠিক বলেছ, যাহা বৈধ নয়, কদাচ তাহা শান্তিদায়ক নহে; বড় ভালবেসেছিলাম নিরু তোমাকে, কিন্তু তাহা ত বৈধ নয়। মনে করেছিলাম তোমায় বিবাহ করিয়া স্বামী স্ত্রীর মত থাকিব, কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। তুমি ব্রাহ্মণতনয়া আর—আর আমি শূদ্র; স্বর্গে ও নরকে কদাচ মিলন হয় না—হইবার নহে। যদি পরজন্মে ব্রাহ্মণ হই

তবেই এ মিলন বৈধ হইবে; নচেত—। আর বলিতে পারিল না, নরেন হতাশ-প্রেমে পাগলের ন্যায় হইয়া গেল।

নিরুপমা নরেনকে সান্ত্বনা দিয়া গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল;—নরেন, আমারও তাহাই ইচ্ছা—ইহা অবৈধ; ইহাতে আত্মা কদাচ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম আর এ জীবনে এ দেহ কাহাকেও দান করিব না। যদি পরজন্ম থাকে, যদি আত্মা অবিনশ্বর হয়, তবে সেই পরজন্মে তুমি আমার হইবে—আমি তোমার হইব—নচেত যাহা বৈধ নয় কদাচ তাহা শান্তিদায়ক নহে। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সরস্বতী।

মতিমালা।

(৩)

মতিমালা তাঁহার জননীর নিকট যে সমুদয় সংশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি স্বামীগৃহে ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আচার, ব্যবহার, সেবা, যত্ন, পরদুঃখকাতরতা, বিনম্রবচন প্রভৃতির দ্বারা অতি সহজেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন, এবং সকলেই নিজের অজ্ঞাতসারে নববধূর বশীভূত হইয়া পড়িল। মতিমালা তাঁহার জননীর চেষ্টা ও যত্নে যথাসম্ভব লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে স্বামীর তৃতীয় পক্ষের পত্নী হইয়াছেন, সে কথা তাঁহার মনে কখন ভ্রমেও উদিত হইত না। মতিমালা তাঁহার মাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন—

"ক্লীবং বা দুরবস্থাং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে, স্বামী ক্লীব হউন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউন, রুগ্ন হউন অথবা বৃদ্ধ হউন, সুখী হউন অথবা দুঃখীই হউন, কোনও কালে কোনও কারণে স্ত্রী তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিলে মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

মতিমালা জানিতেন,—

"ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থব্রতানিচ;
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমার্চ্চয়েৎ।"

এবং সমবয়স্কা সঙ্গিনীগণকে শিক্ষা দিতেন যে, স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা,

স্বামীই গুরু, স্বামীই সমুদয় ধর্ম্ম, তীর্থ ও ব্রত ;—কায়মনোবাক্যে একমাত্র স্বামী-সেবা, স্বামীর অর্চ্চনা দ্বারা স্ত্রীলোক সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বতীর্থ, ও সর্ব্বব্রতাদির ফল লাভ করে।

হরিহর বাবু মতিমালার আচার, ব্যবহার, ও যত্নে পরম প্রীত হইলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে সাংসারিক সমস্ত বিশৃঙ্খলা হইতে নিরাকৃত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতঃই কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইতে লাগিল।

বিবাহের বৎসরেই ভগ্নীর পরামর্শানুসারে পুত্র কামনায় দুর্গোৎসব করিলেন। বিশ্বজননীর করুণায় অথবা হরিহর বাবুর ভাগ্যফলে তিন বৎসরের মধ্যে একটি পুত্রসন্তান মতিমালার অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিল। সংসারে আনন্দের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল।

(৪)

বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি বৈপরীত্য সমাবেশ ;—আলোকান্তেই অন্ধকার, আনন্দের পার্শ্বেই নিরানন্দ, সুখের অন্তরালেই দুঃখ ;—দেবতার পার্শ্বেই দানব ! হরিহর বাবু তামাকটি পর্য্যন্ত পান করেন না, আর তাঁহার সহোদর গঙ্গাধর বাবুর উদরটি আবগারির গুদাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গাধর বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাবিংশতি বৎসর ;—ইতিমধ্যে হরিহর বাবুর তৃতীয়পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও, গঙ্গাধর বাবুর এ পর্য্যন্ত প্রথমপক্ষও হয় নাই। বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের ন্যায় অটল, অথচ বেশ্যাপল্লীর সর্ব্বমন্দিরে, সর্ব্বঘটে বিরাজিত থাকেন বলিয়া তাঁহার একটি খ্যাতি ছিল এবং আমাদিগের গুণময় গঙ্গাধর বাবুও তজ্জন্য মনে মনে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন।

বিবাহরাত্র হইতেই গঙ্গাধর বাবু মতিমালার অসামান্যরূপে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মতিমালাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইলেই অন্নাধিক নানাপ্রকার ইঙ্গিত করিতেন ; কখনও বা মৃদুহাস্যে তাঁহার প্রতি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া ধীরে ধীরে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন। মতিমালা এ সকল তাঁহার মাতলামির অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিতেন।

আজ ৺শারদীয়া পূজার বিজয়া ; আজ মা আনন্দময়ীর অনুকম্পায় ঘরে ঘরে আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত ; আজ বাঙ্গালী সকল বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া জগন্মাতার কৃপায় সকলেই এক মায়ের সন্তান বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে ;—তাই এই শুভদিনে চিরশত্রুকেও বক্ষে টানিয়া লইতে বাঙ্গালী দ্বিধাবোধ করিতেছে না।

হরিহর বাবু পুত্র কামনায় যথারীতি চারিবৎসর দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গত বৎসর ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন, তন্নিমিত্ত ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এ বৎসর মাতার আবাহনে সমর্থ হন নাই; সুতরাং বিগত দিবসত্রয় অহল্যা দেবী বড়ই অন্যমনা ছিলেন। অদ্য তাঁহার একটি বিশিষ্টা আত্মীয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মতিমালা অন্তঃসত্ত্বা না হইলে অবশ্য তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন।

মতিমালা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একাকিনী স্বীয় শয়নকক্ষের বাতায়নে বসিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজী, সুনীল চন্দ্রাতপতলে কিরূপ স্বর্ণ মুকুট ধারণ করিয়া আবেগ ভরে টলিয়া টলিয়া মৃদু সমীরণের সহিত অব্যক্ত মধুর স্বরে আলাপ করিতেছে; এবং সেই সঙ্গে কুলায় প্রত্যাগমনোন্মুখ বিহগকুল কিরূপে প্রকৃতি বিরচিত সান্ধ্য-বন্দনা দ্বারা দিগন্ত মুখরিত করিতেছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে নূতন ঝি আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল।

মতিমালার বড় একটা পত্রাদি আসিত না। আধুনিক-শিক্ষিতা মহিলাগণের ন্যায় পত্রলেখার নেশা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং এরূপ অসময়ে পত্র পাইয়া ঈষৎ বিস্মিতা হইলেন এবং পত্রগ্রহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি ?—কে দিয়েছে নূতন ঝি ?"

নূতন ঝি ঈষৎ সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল —"ছোট বাবু দিয়েছেন।"

নূতন ঝির উত্তরে নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন "ছোট বাবু পত্র দিয়েছেন !"

মতিমালা দেখিলেন,—পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র; পাঠ করিলেন,—"বৌ-দি ! প্রাণ যায় বড় কষ্ট;—ঝি, চাকর, সরকার কেউ নেই; সব ছুটি নিয়ে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখতে গেছে;—তুমি আমাকে দয়া করে বাঁচাও। ইতি—তোমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি—ঠাকুর-পো।

মতিমালা পত্রপাঠ করিয়া তাহার কোনও মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া, নূতন-ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অসুখ হয়েছে ?—সরকার বাবু কোথায় গেলেন ?"

"তা জানি নি মা ঠাকরুণ; সরকার বাবু-টাবু কেউ বাড়ীতে নেই। ছোটবাবু আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন; তাঁর বড় অসুখ !

মতিমালা বিস্মিত ভাবে উত্তর করিলেন "তা আমি বৌ মানুষ; আমি গিয়ে কি ক'রব'?—তুই বা ডাক্তার বাবুকে খপর দিয়ে আয়, তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

একটু চিন্তা করিয়া নূতন ঝি উত্তর করিল,—"আমি তো ডাক্তার বাবুর বাড়ী চিনি না।

"তবে মা সরকার বাবু কোথায় দেখ;—আমি তোকে জল খেতে পয়সা দেবো।

ছোট বাবু ব'লছিলেন যে সরকার ম'শাই রাত ১০টার আগে ফিরবেন না।

মতিমালা বড়ই বিপদে পড়িলেন। নূতন ঝিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "খোকা আর ঝি কি এখনও ফিরে নাই?''

"সে তো পিসীমার সঙ্গে খোকাকে নিয়ে ফিরবে।"

"ছোট বাবু কোথায় আছেন?"

তাঁর নিজের শো'বার ঘরে।"

মতিমালা কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন এবং পত্রখানি হস্তে করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে নূতন ঝি বলিল "ছোট বাবুর বড় অসুখ; শীঘ্র আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন; দেরি করতে মানা করেছেন।"

মতিমালা ভাবিলেন অকস্মাৎ কেন এরূপ হইল!—যদি অসুখ খুব বাড়িয়া যায়;—ভগবান না করুন যদি কিছু ভাল-মন্দ হয়, লোকে কি বলিবে! তিনি আসিয়াই বা কি বলিবেন! যখন ঠাকুর ঝি নাই তখন আমাকেই লোকে সম্পূর্ণ দোষী করিবে। এখন আমি কি করি?—আর আমি যাইয়াই বা কি করিব? আমার দ্বারা তাঁহার কি উপকার হইতে পারে?—আহা, আজ যদি ঠাকুর'পোর স্ত্রী থাকিত!"

মতিমালাকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া নূতন ঝি পুনর্ব্বার বলিল "ছোটবাবু—যন্ত্রণায় ছটফট করছেন;—কি করবেন?"

মতিমালা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, নূতন ঝির অনুবর্ত্তিনী হইলেন পত্রখানি বাতায়ন পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

উভয়ে গঙ্গাধর বাবুর শয়ন কক্ষের দ্বারদেশে উপনীতা হইলে, মতিমালা কহিলেন—"জিজ্ঞাসা কর, কি অসুখ করেছে; আর বড়বাবু কিংবা সরকার বাবু আসবার পূর্ব্বে আমার দ্বারা কি ব্যবস্থা হতে পারে।"

গঙ্গাধর বাবু তাঁহার পালঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল যে সাগ্রহে কাহারও প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে সন্নিবদ্ধ ছিল, তাহা মতিমালার ন্যায় অদূরদর্শিনী অপ্রাপ্ত বয়স্কা রমণীও বুঝিতে পারিলেন। নূতন ঝি মতিমালার কথাগুলি

গঙ্গাধর বাবুকে জানাইল ; অধিকন্তু বলিল "বৌ ঠাকুরণ একলা কি ক'রবেন ? আমি দেখে আসি কেউ এলো কিনা।" এই বলিয়া মতিমালা নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। গঙ্গাধর বাবু চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া সকলই লক্ষ্য করিতেছিলেন ; এক্ষণে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "বড় কষ্ট বৌ-দিদি, বড় কষ্ট,—জ্বলে গেলুম !—একবার আমার বুকটায় হাত দিয়ে দেখতে।"

অকস্মাৎ কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় মতিমালার বক্ষের ভিতর যেন গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। তিনি ভয়চকিতনেত্রে প্রত্যাগমনোন্মুখী হইলেন ; অমনি গঙ্গাধর বাবু পলক মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎবেগে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় পালঙ্গে উপবেশন করাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই হরিহর বাবুকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস-সি।

সাধক কবি তুলসীদাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

দেখিতে দেখিতে বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া তুলসীদাস যৌবনে পদার্পণ করিল। তাহার দেহের সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইল, অপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণতা লাভ করিল। এখন তুলসীদাস একজন সুপুরুষ, তাহার উপর তাহারি সেই ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার ও বেশভূষা তাহাকে অতীব সৌন্দর্য্য-শালী করিয়াছিল। যুবক যখন বন্ধু দুঃখীরামের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, নদীতীরে স্নান করিতে যাইত, তখন সকলে তাহার সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তুলসীর নম্রতা ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ যাহাতে মানবজীবন ধন্য করে, যাহাতে সে লোকসমাজে আদরণীয় হইতে পারে, গুরুদেব তাহার জন্য নানা প্রকার সৎশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—যদি পুত্র লেখাপড়া শিক্ষায় পারদর্শী হইতে না পারিত, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে যদি বিদ্যার্জ্জনে বালক ক্ষমতাবান না হইত, তাহা হইলে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাহাকে সৎস্বভাব সম্পন্ন করিয়া সামাজিক বিষয়ে সুনিপুণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশিষ্টভাবে সামাজিক ভাবাপন্ন হওয়াও তখন একটা মহৎ গুণ বলিয়া পরিগণিত

হইত। ধর্ম্মভাবের ভাবুক হইয়া সামাজিকতায় পটু হইলেও তখন সংসার পরিচালনের ভাবনা থাকিত না—লেখাপড়া যত হউক আর নাই হউক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক হইত, নতুবা অন্যান্য জাতি সকলের নিকট তাহার মান-মর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় থাকিত না, এইজন্য তাহার অভাব অভিযোগেও কোনপ্রকার সাহায্য প্রাওয়া মহাদায় হইত।

নৃসিংহদেব যখন দেখিলেন—বালকের লেখাপড়ায় তত মতি নাই; তখন যাহাতে সে উত্তরকালে জীবন-সংগ্রামে কোনপ্রকার কষ্ট না পায়, যাহাতে তাহার সংসারযাত্রা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্য দিয়া একপ্রকার সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপ দশকর্ম্মান্বিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টা বিফল হইল না, যৌবনে তুলসীদাসের বালকত্ব ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দশকর্ম্মে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম সে একপ্রকার "চলনসই" রকমে সমাধা করিতে বেশ পারক হইয়া উঠিলে, নৃসিংহদেব তাহাকে শিষ্য-যজমানের গৃহে সময়ে সময়ে কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যুবকও অতিশয় ভক্তির সহিত তাহাদের কাজকর্ম্ম, পৌরহিত্য করিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিতে লাগিল। পুত্র কাজের লোক হইলে, সে শিষ্যশাবক রক্ষায় পারদর্শী হইলে পিতা আত্মারাম দ্বিবেদীও নিজের শিষ্য যজমানের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন।

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, নিজের নিতান্ত আপনার জন রাম রঘুনন্দন ইষ্টদেবের পদে মতি স্থির করিতে, পঞ্চাশ বৎসরের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসারের যাবতীয় জঞ্জালজাল কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। জননী হুলসীদেবী বড়ই পতি-পরায়ণা ছিলেন, স্বামীকে সংসারে বীতস্পৃহ দেখিয়া তিনি অনন্যমনে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে, পরকাল চিন্তার পথে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পতির ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্যই স্ত্রী চিরকাল সহধর্ম্মিণীনামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। হুলসীদেবী এখনকার স্ত্রীলোকের মত সে নামে অপযশ ঘোষণা না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মপত্নীরূপে আত্মারামের মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বামীর যাবতীয় অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন; সেইটুকু সময় সন্তানবৎসলা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য দেবদেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাটাইতেন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস জানিতে

পারিলেন কেন, তিনি জনক-জননীর দ্বারা প্রতিপালিত না হইয়া তাঁহাদের কুল-গুরু নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। পিতা-মাতার কি কর্মভোগ, গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহাদের কি মনোকষ্ট বুঝিতে পারিয়া ধর্মভীরু বালক সেই মর্মান্তিক দুঃখ দূরীকরণের জন্য শরীরের যাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি নৃসিংহদেব কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটী করিতেন না। পিতামাতা ও নৃসিংহদেব যুবকের সুললিত স্বভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বালক লেখাপড়া শিখিল না—হয়ত কুচরিত্র হইবে, পিতামাতা ও পালন কর্ত্তার নামে কলঙ্ককালিমা মাখাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়াছিলেন কিন্তু হৃদয়দেবতা ভগবান, রামচন্দ্র তাহাদের সে ভাবনা দূর করিয়াছেন। বালককে সৎপথগামী করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সৎস্বভাব সম্পন্ন ধার্ম্মিক পুত্রের পিতা হইতে পারা যে দেবতার অতুলনীয় আশীর্ব্বাদ, তাহা কে না স্বীকার করিবে, কয়জনের ভাগ্যে আজকাল এ সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে?

তুলসীদাস যাহার তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন না, প্রতিবেশী মণ্ডলে কোন বালকের সহিত তাহার মনোমালিন্য না থাকিলেও দুঃখীরামের সহিত তাহার যেরূপ প্রাণের মিল ছিল, এমন আর কাহারও সহিত ছিল না। একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, একত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনে দুইটি যুবক যেন এক হইয়া গিয়াছিল, একটীর অদর্শনে আর একটী যারপর নাই কষ্ট অনুভব করিত। আজীবন সংসর্গের পর মানব এইরূপেই আপনার হইয়া যায়, ইহাকেই আমরা বন্ধুত্বের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করি।

প্রতিদিন স্নানের পর তুলসীদাস পিতামাতা ও গুরুদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া তবে অন্য কাজে বাহির হইতেন। শিষ্য যজমানের বাটী পূজা করিতে যাইবার সময় তুলসী সকলের অগ্রে এই কাজ সমাধা করিয়া হৃদয় আনন্দ-আপ্লুত করতঃ তবে অন্য কার্য্যে গমন করিত, তাহাতে তাহার দেবার্চ্চনায় বেশ মন লাগিত, হৃদয় ভক্তিরসে ভরিয়া যাইত। যজমানের বাড়ীতে বেশী কাজ কর্ম্ম পড়িলে তুলসী বন্ধু দুঃখীরামকে সঙ্গে লইয়া যাইত এবং উভয়ে মিলিয়া কাজ সুসম্পন্ন করিত। তুলসীদাস কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়া পূজা করিয়া চালকলা আহরণ, দক্ষিণা গ্রহণ করিত না, সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই ভাবেই তিনি পূজা করিতেন, তাই শিষ্য-যজমানেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত,

তাহাকে পূজা করিতে আসিতে দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। দুই একটী ঘরের পূজা ভিন্ন বালক তুলসীদাস দক্ষিণা লাভের জন্ত বহু ঘরের পূজায় ব্রতী হইত না ; পূজা ত আর বালকের ক্রীড়া নহে যে মন্ত্রহীন পূজা করিয়া যজমানের অমঙ্গল করিবে? এই জন্তই সময়ে সময়ে তাহার প্রিয় বন্ধু দুঃখীকে সঙ্গে লইতে হইত।

আত্মারামের বয়স হইয়াছে ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন হইতেছে ; জরাব্যাধি ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যের বিধানানুসারে তাঁহার দেহপিঞ্জর অধিকার করিতেছে ; আর বেশীদিন জীবিত থাকিবার আশা নাই। আত্মারাম পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া তাহার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন, গুরুদেব তুলসীকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন, হুলসীদেবী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইলেন। কিন্তু যখন পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, আর গুরুদেব নিকটে রহিয়াছেন, তখন তাহার চিন্তার কারণ কি? এ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত একদিন না একদিন কালের কোলে মিশিয়া যাইবে, তথাপি স্ত্রী হইয়া, অর্দ্ধাঙ্গিণী সতী হইয়া কে কবে স্বামীর দেহত্যাগ কল্পনা করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে? হুলসীদেবী স্বামীকে জরামৃত্যুর কবলস্থ দেখিয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। তুলসীদাস পিতার অন্তিমসময় উপস্থিত দেখিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, গৃহস্থের নিয়মানুসারে চিকিৎসাও করাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দুরন্ত কাল কোন বাধাই মানিল না। একদিন শীতের অপরাহ্ণে, সূর্য্যদেব যখন পাটে বসিতেছেন, দক্ষিণায়ন উত্তীর্ণ হইয়া যখন উত্তরায়ন আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে আত্মারাম আত্মজনে ফাঁকি দিয়া, হৃদয় মধ্যে আত্মারামে আত্মসমর্পণ করিয়া, পার্থিব পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামের পদতলে মোক্ষলাভ করিলেন।

নৃসিংহদেব প্রিয় শিষ্য আত্মারামের মৃত্যুতে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু তুলসী ও হুলসীর মুখ চাহিয়া তিনি শোক সম্বরণ করিলেন। প্রিয় শিষ্যের ঔর্দ্ধদাহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার শবদেহ তুলসীতলায় রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে রামনাম অঙ্কিত করিয়া দিয়া "রাম নাম সত্য" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন।

অনেকে বলেন—তখনকার নিয়মানুসারে হুলসীদেবী হাসিতে হাসিতে স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও পুস্তকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এজন্ত হুলসীদেবী যে একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া এবং স্বামীর অনুমতি "তুমি তুলসীকে সংসারী করিয়া তবে আমার নিকট আসিও" এই বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্ত

আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন—আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম।

শব যথাবিধি সৎকার করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন। নৃসিংহদেব নিজের অবস্থানুসারে পালকপুত্র তুলসীদাসকে অশৌচ মুক্ত করাইলেন।

স্বামী স্বর্গগত হইলে স্ত্রীজাতি আর তাহার জীবনে তত আস্থা রাখে না। যাহার জন্ত এ নারীজন্ম, তিনিই যখন চলিয়া গেলেন, তখন আর জীবনে সুখ কি? তবে থাকিতে হয় তাই থাকে, তাহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া ব্রতচর্য্যব্রতাবলম্বিনী হইয়া যতদিন না দেহের অবসান হয়, ততদিন ত থাকিতেই হইবে, তাই জীবন্মৃত হইয়া পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিবার জন্য এক প্রকার জীবন ধারণ করে। তুলসীদেবীও সেইরূপ মন-মরা হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এখন ত আর তাঁর মরণে ভয় নাই, তাই গুরুদেবের আদেশে পুত্রকে নিকটেই রাখিলেন। কিছুদিন পরে জননীর বাৎসল্যে, গুরুদেবের যত্নে, বন্ধুবর্গের সান্ত্বনাবচনে তুলসী পিতার দুর্ব্বিসহ শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইল। কিন্তু সংসার বিরাগী, শোক-দুঃখ-মোহাতীত নৃসিংহদেব যেন পুত্রসম শিষ্য আত্মারামের শোকে দিন দিন বড়ই কাতর, বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি ত্যাগী হইয়াও আত্মারামের ন্যায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি শিষ্যের জন্য ভোগী-সংসারী হইয়া এতদিন বান্দাজেলার এই নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয় শিষ্যের অভাবে তাহার এ আবাস যেন কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি মনে পড়িয়া নৃসিংহের ন্যায় সংযমী মহাপুরুষের হৃদয়ও বিচঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি এইবার মহাপ্রস্থান করিয়া আত্মারামের নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস পাইলেন, হিমালয়ের পাদদেশে তাঁহার চিরশান্তিময় আশ্রমে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন, প্রিয় শিষ্য আত্মারাম ছাড়া নৃসিংহ কখনই এ অন্ধকার-পুরে থাকিতে পারিবেন না; এই জন্য কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া নৃসিংহদেব যুবক তুলসীদাস ও তুলসী-দেবীকে সংসারের পথে পাকা করিয়া দিবার জন্য আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস চিরকালই আমোদপ্রিয়, জননী ও গুরুদেবের আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়া বন্ধু দুঃখী তেওয়ারীর সহিত বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। পুত্রকে নিকটে পাইয়া আত্মজে আত্মারামের দর্শনলালসা মিটাইয়া, তাহার স্মৃতির পূজা করিয়া সতীও একপ্রকার দুঃখ-কষ্টে কাল কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। *

১ম—বিরাজার রাজা যিনি কোথা তাঁর ধাম?
তাঁর পুত্রের শত্রু যিনি চা'র অক্ষরে নাম।
পূর্ব্বার্দ্ধ থাকুক তোলা তোমার শত্রুঘরে;
শেষার্দ্ধ লয়ে রহ সুখেতে সংসারে।

২য়—মোমারামমকাদরে হয়াগদলমস্তষাঃ।
এই কয়টি যার কাছে আছে, যাইনে গো তার বাসা।
কাছে নাই যার ঐগুলি ভাই হইব গো তার দাস,
সমস্তটি ভাঙ্গিয়ে দিলে বলিব সাবাস্।

৩য়—পাক করি পরিশ্রান্ত কাহার কামিনী?
শ্বশুরে ইচ্ছয়ে হায়! একি কথা শুনি।

৪র্থ—কোন বীর মহীতলে দু'টি ভাব ধরে,
মেয়ে এক দিকে আর পুরুষ অপরে।

৫ম—আট লাইনে একটি কবিতা লিখুন।

প্রশ্নোত্তর।

শ্রীগিরিজাকান্ত শর্ম্মা, সিলেট। ইনি বৈশাখ মাসের ১ম ও ২য় প্রশ্নের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা সাদরে মুদ্রিত করিলাম। বৈশাখ—১ম প্রঃ উঃ—ষড়ানন, দুর্গা, ভৈরব ও রাহু। ২য় প্রঃ উঃ—সময়। জ্যৈষ্ঠ—১ম প্রঃ উঃ—যাঁতা। ২য় প্রঃ উঃ—হার (আহার, বিহার, প্রহার)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, পাবনা। জ্যৈষ্ঠ—১ম প্রঃ উঃ—যাঁতা।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, কলিকাতা। বৈশাখ—২য় প্রঃ উঃ—সময়। জ্যৈষ্ঠ—১ম প্রঃ উঃ—যাঁতা। ২য় প্রঃ উঃ—হার। ইনি জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩য় প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠাইয়াছেন।

প্রবাসী।

যে তরণী আরোহিয়া এই নবদেশে
এসেছিনু হর্ষভরা লোহিত উষায়,

---

* বার মাসের প্রশ্নের সমস্ত বা আংশিক মীমাংসা করিতে পারিলে বৎসরান্তে প্রশ্ন মীমাংসার তারতম্যানুসারে নগদ টাকা বা প্রশংসাপত্র বা স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং যিনি যে প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন, তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যার আলোচনায় নামধামসহ প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নসকলের মীমাংসার অধিকার একমাত্র আলোচনার গ্রাহকদিগের রহিল। যাঁহারা গ্রাহক নহেন তাঁহাদের উত্তর বা নাম ধাম কিছুই প্রকাশিত হইবে না বা পুরস্কারের দাবীও গ্রাহ্য হইবে না। ম্যানেজার।

সে আজি গিয়াছে কোথা দুরান্তরে ভেসে
অজ্ঞাত সঙ্গীর মাঝে ত্যজি মোরে হায়!
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু গরজে ভীষণ
চারি পাশে ধুধু করে প্রান্তর বিশাল
হেথায় কাটিতে হবে এ দীর্ঘ জীবন
হাসি কাঁদি শতকর্ম্মে ব্যাপি দীর্ঘকাল।
স্বাধীন বিহঙ্গরাজ সোনার পিঞ্জরে
সুখাদ্য পানীয় লভি কম কর হ'তে
তবু বৃথা থাকি থাকি কাঁদি গৃহ তরে
উড়ে যেতে চায় কারা ভাঙ্গি কোন মতে।
তেমনি লভিয়া সুখ স্নেহ ভালবাসা
এ বিদেশে বন্ধুহারা কাতর হৃদয়
আবদ্ধ বিহঙ্গ সম তবু করে আশা।
কারা ভাঙ্গি নিজগৃহে হইতে আশ্রয়।

১১ই আষাঢ়ের ঘোষণামত
পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম।

প্রথম পুরস্কার ৫৲ পাঁচ টাকা। মিসেস্ শৈবলিনী সেন। C/o কাপ্তেন রনজিৎ সেন, এম, বি, আই, এম, এস। শ্রীরামপুর। ইনি ভি, পি, ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ও নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুরস্কার ৩৲ তিন টাকা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু। একটিভ্ সার্ভিস্, মেসোপোটেমিয়া। ইহাকে বুকপোষ্টে—পত্রিকা পাঠান হইয়াছিল, পুস্তক মধ্যস্থ পুরস্কারের রসিদ পাইয়া আমাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। আমরা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়াছি।

তৃতীয় পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য। নগদা সিমলা, ময়মনসিংহ। ইনিও ভি, পি, ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ও নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

নিবেদন—আমরা গত মাসে সকলকে ভি, পি, করি নাই মাত্র কয়েকজনকে ভি, পি, করিয়াছিলাম কিন্তু অধিকাংশই ফেরৎ আসিয়াছে—তজ্জন্য আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। এবারে আর সকলকে ভি, পি, করিলাম না। যাঁহাদের বার্ষিক সাহায্য বাকি আছে তাঁহারা দয়া করিয়া মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবেন, অন্যথায় আগামী মাসে আমরা ২৶৹ আনা চার্জ্জে পত্রিকা ভি, পি, করিব। অনরেজেষ্টারী ভি, পি, পার্শ্বেল বা বুকপোষ্টপ্রথা উঠিয়া যাওয়ায় ৴৹ আনা স্থলে আরও ৶৹ আনা মাশুল বাড়িয়াছে। সুতরাং ভি, পি, বুকপোষ্ট রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলে ৶৹ আনা পড়িবে। অতএব অনর্থক ৶৹ আনা খরচ না বাড়াইয়া ২৲ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিবেন প্রার্থনা।

আলোচনা ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

(কোন সভায় পঠিত)

আমরা আজ যে মহাপুরুষের নাম লইয়া সমবেত হইয়াছি, তিনি নিজে বড় সভাসমিতির পক্ষপাতী ছিলেন না; সুতরাং প্রথমেই মনে হইতেছে এ সভায় বিশেষ কোন একটা মহৎ কাজ হইতে পারে না।

ধর্ম্ম-সভার কথা আমরা কহিয়া থাকি বটে, কিন্তু সভা করিয়া ধর্ম্ম হয় না—মানুষের অন্তরে যখন ধর্ম্মভাব আবির্ভাব হয়—তখন সভাসমিতি করা, বক্তৃতা করা, প্রবন্ধ পাঠ করা, তাহার পক্ষে অধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

তবে কি সভা সমিতির আবশ্যকতা নাই? আছে,—ধর্ম্মের জন্য নয়, আলোচনার জন্য। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালোচনা দুইটির পার্থক্য খুবই বেশী। এমন কি একটির সহিত আর একটির সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্ম অন্তরের, আলোচনা বাহিরের; একটি মানুষকে মৌনী করিয়া দেয়, অপরটি তাহাকে বাচাল করিয়া তোলে। একটি অচঞ্চল অটল বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; অপরটি বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধুলিতে সমাচ্ছন্ন। একটি মানুষের অহঙ্কারী ও পণ্ডিত্য গর্ব্বের বহু উর্দ্ধে, অপরটি অনেক সময়ে পুঁথিগত। তবে এক একজন মহাপুরুষ সময়ে সময়ে ছাড়পত্র লইয়া লোকশিক্ষার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহাদের আলোচনা কিছু বিশেষ রকমের। আমাদের সে ছাড়পত্র নাই সুতরাং আমি ধর্ম্ম আলোচনা করিতে বসিলে কেবল যে কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র হইবে সে বিষয়ে অনেকে নিশ্চিত থাকিতে পারেন; তবে রামকৃষ্ণকে কি ভাবে বুঝিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রামকৃষ্ণদেব কি ছিলেন, তাহা অনেকে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বলেন তিনি নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। কেহ বলেন—তিনি ভক্ত ছিলেন, কেহ বলেন তিনি ভক্ত জ্ঞানী দুইই; কেহ বলেন তাঁহার সবিকল্প সমাধি হইত। কেহ বলেন তাঁহার সমাধি নির্ব্বিকল্প। এ সব কথায় রামকৃষ্ণের অতটা পরিচয় দিক আর নাই দিক যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহাদের পরিচয়ই বিশেষভাবে দিয়া আসিতেছে। রামকৃষ্ণ না হইলে রাম-

কৃষ্ণকে বুঝিতে পারা যায় না; যাঁহারা মহাপুরুষ, সংসার তাঁহাদের চিরকালই ভুল বুঝিতেছে ও বুঝিবে; তাহা না হইলে যে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না।

মানুষ—দেশ কাল অবস্থার দাস। তোমার কাছে যাহা সত্য, আমার কাছে তাহা মিথ্যা। তোমার কাছে যাহা মিথ্যা, আমার কাছে তাহা সত্য। আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই; আজ যাহা নাই কাল যে তাহার উদ্ভব হইবে না এ কথাই বা কে বলিতে পারে? আমাদের সত্য পরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন যাঁহারা অপরিচ্ছিন্ন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—তাঁহাদিগকে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচিত, সেজন্য গর্ব্বও করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ নই অথচ গলায় একগাছি পৈতা আছে বলিয়া ব্রাহ্মণের প্রাপ্যটুকু কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে ছাড়ি না। নামে হিন্দু কিন্তু ধর্ম্মমতে খৃষ্টান, মুখে আস্তিক কিন্তু কাজে কথায় চার্ব্বাককে ছাড়াইয়া যাই; আজকালকার ধর্ম্ম—লোক দেখাইবার জন্য! মনের এক একটা অদম্য বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যও অনেকে অনেক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

এই অবস্থায় যখন আর্য্য ধর্ম্মের মহান সমুদ্রের বেলাভূমি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের অসংখ্য তটিনীর চঞ্চল নর্ত্তনে আবিল হইবার উপক্রম করিয়াছে তখন আধুনিক যুগের অবতার স্বরূপ রামকৃষ্ণের উদ্ভব। তিনি বুঝাইয়াছিলেন তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার মতের উপর নির্ভর কর, পরকেও পরের মতের উপর নির্ভর করিতে দাও, কৃপাময়ের কৃপায় সকলেই আপনার ভুল বুঝিতে পারিবে। সাধন হয়—"কোণে, বনে, মনে" দুইশত লোক জড় করিয়া হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া, অল্প সাধনে, গুরুগিরি বা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবার প্রয়োজন নাই, তিনি পিপীলিকার পদশব্দও শুনিতে পান। তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হও, বাহ্যিক উপবীতের গর্ব্ব করিও না! কেন না আত্মা উন্নত হইলে উপবীতের আবশ্যকতা থাকে না; সংসারি! তোমারও নিরাশার কারণ নাই। সাধন কর্ম্ম কর; যাহার হুঁস আছে সেইই মানুষ—ভগবানে আত্মসমর্পণ কর, তিনিই সব করিয়া দিবেন। পণ্ডিত! তোমারও আড়ম্বর ছাড়িয়া দাও কেন না জ্ঞান পরিপক হইলে আড়ম্বর থাকে না—আড়ম্বর অল্পজ্ঞানেরই লক্ষণ।

রামকৃষ্ণের উপদেশগুলি অতি সহজ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। সে সব উপদেশগুলির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই, দেশে উপদেশের অভাব নাই,

উপদেশ মানিয়া চলিবার লোকেরই অভাব। উপদেশ মানিয়া চলিব বলিলেই চলা যায় না; তাহাকে মানিবার একটা বিশেষ সময় আছে।

মানুষ স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক—সকলেই পাপকে ঘৃণা করে। তস্কর চুরি করিবার সময় যদি ভাবে আমি একটা পাপকার্য্য করিতেছি তাহা হইলে আর তাহার চুরি করা হয় না। হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের সময় বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে। অধর্ম্ম করিতেছি জানিয়া অধর্ম্ম করা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ; জ্ঞান হইলেই সে অধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। ধর্ম্মজগতে জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হয় না—এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ মূলক। "মিথ্যা কথা বলিও না" এ উপদেশ সকলেই শুনিতেছেন তবুও সকলে মিথ্যা বলেন কেন ইহার কারণ এই যে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যাকে প্রত্যক্ষ করে নাই। মিথ্যার স্বরূপ তাহাদের অজ্ঞাত। মিথ্যা কি তাহা যদি লোকে সম্যকরূপে প্রাণ দিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে আর সে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না, মিথ্যা কথা অনেক সময়ে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তাহাকে আনন্দ দিয়া সত্যের রূপ ধারণ করে বলিয়াই সে মিথ্যা বলিতে চায়!

আমরা সকলেই ধর্ম্মপথে চলিয়াছি। পথে নানা আসক্তি, নানা বাসনা, নানা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিতেছে; আমরা আত্ম-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি না। আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছি, হুঁস্ থাকিতেছে না। এই জন্যই রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যাহার হুঁস আছে সেইই মান্-হুঁষ।

বিচিত্র সংসারের বিচিত্র কর্ম্মে জড়িত হইয়া আমাদের অপ্রতিষ্ঠিত মন কেবলই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। যাহা স্থির সত্য কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইব। ভগবানের উপাসনা সকলেই করিতে প্রস্তুত; সকলেই—যাহা সার, যাহা অক্ষয় অমৃত, তাহাই পাইতে চায়—কিন্তু চঞ্চল মন তাহাদের আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। ভগবানের উপাসনা করিতে গিয়া তাহারা অর্থের উপাসনা করে, বাসনার পূজায় মাতিয়া যায়; আমরা মুখে বলি—ঈশ্বরই সকলের মূল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিকৃত স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাই—অর্থ সকলের মূল। মুখে বলি—ঈশ্বর আরাধনায় পরমানন্দ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অর্থের আরাধনায় পরমানন্দ প্রাপ্ত হই! যদি সংসারে আসক্তির বশবর্ত্তী না হইতাম, তাহা হইলে দৃষ্টি আরও দূরের জিনিসকে উপলব্ধি করিতে পারিত।

আজ শক্তি নাই কিন্তু ভাব আসিয়া আজ চঞ্চল মনে ঈশ্বরের রহস্য উপলব্ধি করাইতেছে; তাই কখন অর্থ, কখন কাম, কখন যশ ও অভিমানের পূজা করিতে

ছুটিতেছি। একদিন আসিবে যখন সকলকেই একের দিকে ছুটিতে হইবে। আমরা মানুষ, এই হুঁসটুকু থাকিলেই যথেষ্ট হইল। সিদ্ধি সকলের হয় না, দল বাঁধিয়া লোক সিদ্ধি পান করিতে পারে কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হুঁস চাই; যাহার হুঁস নাই, সে ফোঁটা তিলক কাটিয়া যতই আড়ম্বর করুক না কেন তাহার সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

ধর্ম্মকথাটী শুনিলেই অনেকে মনে করেন—যেন সেটা বৃদ্ধ বয়সের বা কোন সময় বিশেষের জিনিস। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ধর্ম্মের কোন একটা বিশেষ সময় নাই। সত্যইত, মানুষ স্বধর্ম্মাচরণ সব সময়েই করিবে। যাঁহারা বলেন বেদান্তের মায়াবাদ দেশটাকে উৎসন্ন দিয়াছে—তাঁহারা ভ্রান্ত। মায়াবাদ যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা বেদান্তের অভিপ্রেত নয়। জগৎ মিথ্যা—একথা আমি যদি বলি তাহার অপেক্ষা মিথ্যা আর কি থাকিতে পারে? সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক একথা শুনিয়া যদি কেহ তাহার আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে থাকিতে পারে? যে সংসারে আসক্ত সে গভীর অরণ্যেও সংসারের যন্ত্রণা অনুভব করে, যে অনাসক্ত তাহার পক্ষে সংসারই শ্মশান।

আর্য্য ধর্ম্ম আত্মার উন্নতির জন্য; সকল সময়েই তাহা পালনীয়। সংসার আসক্তি সকলকেই ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহাই মানুষের কর্ত্তব্য। তবে যদি এই দুর্ভিক্ষের দিনে অর্থসঞ্চয়ের আশায় সংসার ছাড়িতে চাও তাহা হইলে তুমি লোভী, তোমার আসক্তি কমে নাই। সংসারে সুখ না পাইয়া যদি তাহা ছাড়িতে চাও, তাহা হইলে তুমি স্বার্থপর—সুতরাং আসক্ত। সংসারের প্রত্যেক কর্ম্ম করিয়া যাও, অথচ তাহাতে আসক্ত হইও না। ভোগ্য বস্তুর মাঝখানে থাকিয়াও বৈরাগী হও। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। যেখানে ভয়ের কারণ আছে—সেইখানে নির্ভীক হওয়াই প্রকৃত নির্ভীকতা; ভয়হীন স্থানে নির্ভীক হওয়া না হওয়া দুইই সমান। অনাসক্তি ও বৈরাগ্য না থাকিলে কোনও মহৎ কাজই হইতে পারে না। ঈশ্বরলাভ—বহু দূরের কথা। ধ্রুব বা চৈতন্য সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান নাই, ঈশ্বরলাভেচ্ছাই তাঁহাদের সংসার বন্ধন ঘুচাইয়া দিয়াছিল। ব্রহ্মাগ্নিতে সবই ভস্ম হইয়া যায়; সে অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে সংসার কেন, অরণ্যও তাহাতে ভস্মসাৎ হইবে। শুধু সংসার ছাড়িলে হইবে কি, হায়! সংসার যে বাহিরে নয়, সংসার মনে।

এই ধর্ম্মপথ দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ, সকলেই ইহার উপর দিয়া চলিয়াছি, কোথায়

ইহার আদি, কোথায় বা অন্ত কে বলিতে পারে? এই পথের উপর দিয়া সকলকেই চলিতে হইবে। নানা প্রলোভনে, নানা আসক্তিতে, আমাদের গতি প্রতিহত হইতেছে; কিন্তু আবার আমরা সে প্রলোভন দূরীভূত করিয়া অগ্রসর হইতেছি। সারাজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা একটিও নিরর্থক নয়; দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিবার জন্য দুঃখ আসিয়াছে, মাথার উপর দিয়া বিপদের ঝঞ্জা বহিয়া গিয়াছে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে চিত্ত সবল হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবলই বিপদের বিভীষিকা, কেবলই দুঃখ, দারিদ্র্য, জরার নিষ্ঠুর আস্ফালন। চিত্ত যখন সবল হইবে, তখন বিপদ কিছুই নয়, দুঃখ যন্ত্রণা ছায়াবাজির মত মিথ্যা। এইরূপে অন্তরের যত প্রকার দুর্ব্বলতা আছে সবগুলিই আমাদের দেবতা বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতেছেন, যে গুলির খবর জানি না তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আজ মনে হইল আমি কোন একটা বিশেষ প্রলোভনের হাত এড়াইয়াছি; কাল দেখিলাম সেই প্রলোভনই অদম্য শক্তিতে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; ধর্ম্মপথে ফাঁকি দিয়া চলিবার উপায় নাই। জীবন আলোচনা করিয়া দেখ—ফাঁকি দিয়া লোককে ঠকাও নাই, আপনাকে ঠকাইয়াছ, ধর্ম্মপথে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছ তাহা কেবল অকপট আত্মশক্তির জন্য।

এই পথ ধরিয়া চলিলে জড়তা, আলস্য, বর্জ্জন করিতে হইবে; তাহাতে দেহের অবনতি হইবে না। ধর্ম্মপথে থাকিয়া কাজ করিতে গেলে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবসা করিতে বসিবে না; শুধু দক্ষিণাটুকুর জন্য পূজা হোম করিতে যাইবে না; প্রশংসা বা হাততালির জন্য বক্তা হইবে না। সব কাজই করিতে হইবে, না করিয়া নিস্তার নাই। আলস্য, জড়তাকে প্রশ্রয় দিলে অবনতিই হইবে। কর্ম্ম চাই—যে কর্ম্মে প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা করিয়া যাও—যাহাতে অবসাদ, যাহাতে আত্মদুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠে তাহা বর্জ্জন কর। কর্ম্মদ্বারাই আমরা জ্ঞান লাভ করি—কর্ম্মই ব্রহ্ম।

উপনিষদ বলিতেছেন;—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।"

আর্য্যধর্ম্ম কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেয় নাই। রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ পড়িয়া ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আর্য্যধর্ম্ম বলিতে চায় আত্মার উন্নতি সাধন কর, তাহার আবার সময় কি অসময় কি? সংসারে থাকিতে হয় থাক কিন্তু আত্মা যেন জাগ্রত থাকে,

তাহা হইলে সংসার তোমার অবনতির কারণ হইবে না ; দাসত্ব করিতে হয় কর, কিন্তু দাস হইও না। ক্ষমতা যদি জাগ্রত থাকে পাপকর্ম্মেও পাপ নাই। আত্মা যখন জাগ্রত নন, তখনই পাপ পুণ্যের সৃষ্টি।

সেই জন্য রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সংসারী হইতে হইলে নির্লিপ্ত সংসারী হওয়াই উচিত। নির্লিপ্ত না হইলে বাস্তবিক ভাল করিয়া সংসারও করা যায় না। কাতর হইলে সংসার করিবে কে? তবে সে বল নাই—একথা বলিতে পার। বল প্রার্থনা কর, যিনি বল দিবার—তিনিই দিবেন। আমাদের চাহিতে হইবে, চাহিলেই পাইব, তাই তিনি কল্পতরু।

ধর্ম্মপথ বিভিন্ন। তুমি খৃষ্টান হও, মুসলমান হও, বৌদ্ধ হও, ঈশ্বর লাভ করিবে। সাম্প্রদায়িক বিশেষে সংকীর্ণতার লক্ষণ এ কথাও রামকৃষ্ণের উপদেশে একাধিক বার আবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছেন যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, অন্তরে অন্তরে অনেকে মহম্মদের শিষ্য। হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে ইহা সর্ব্বগ্রাসী, হিন্দুধর্ম্মই বলিতেছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈবভজাম্যহং।" সকলের ধর্ম্মপথ বিভিন্ন। তোমার আমার ধর্ম্মপথও বিভিন্ন। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া আজ পৈশাচিক আনন্দে মত্ত রহিয়াছি, তবুও তুমি স্বর্গের দেবতা এবং আমি নরকের কীট হইতে পারি। অসংখ্য পার্থক্যের মধ্যে কোনও একটা বিশেষ সাদৃশ্য হয়ত আজ তোমাকে ও আমাকে এত নিকটবর্ত্তী করিয়াছে। সকলের প্রকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া কে কোন পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে কে বলিতে পারে।

তুমি ব্রাহ্মণজাতি হইয়াও শূদ্র হইতে পার এবং আমি শূদ্রজাতি হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারি। তুমি বলিবে ব্রাহ্মণের শক্তি তোমাতে আছে, আমাতে নাই। আমি বলিব ব্রাহ্মণের চিহ্নটুকু তোমাতে আছে—শক্তি প্রচ্ছন্ন। আমাতে ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই—শক্তি প্রকট। ধর্ম্ম জগতে চতুর্ব্বর্ণ গুণ ও কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছিল সামাজিক চতুর্ব্বর্ণ তাহারই অনুকরণ। সামাজিক বর্ণ লইয়া সমাজে গর্ব্ব কর ধর্ম্ম জগতে করিও না। সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব ধর্ম্মপথে চলিয়াছে, তিনিই গুরুরূপে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গুরু কখনও পিতৃরূপে, কখনও মাতৃরূপে, ভ্রাতার সাহচর্য্য-প্রশ্রয়ে, কুটুম্বের আদরে, সমাজের তাড়নায়, কখনও রাজার মুর্ত্তিতে, কখনও পুলিশের শাসনে, কখনও বা বিবেকের কঠোর আদেশে, নানা প্রকারে নানা ভাবে গড়িয়া পিটিয়া আমা-দিগকে একটা বিশেষ পথের উপর দিয়া চালিত করিতেছে।

এ জ্ঞান সব সময়ে থাকে না ;—সত্য কথা। আমাদের বল নাই, রামকৃষ্ণ বলিতেছেন—বল চাও, বল পাইবে।

তিনি সকলকেই আশা দিয়াছেন। তুমি মূর্খ বেদ-বেদান্তের কথা বলিতে পার না, ভাবিও না তুমি ভগবানের কাছে তুচ্ছ। সাধু লোকেরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই দর্শন ; যাহা জানিয়াছেন তাহাই বেদ ; যে জানার পর আর জানা নাই, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার নাই—তাহাই বেদান্ত। বেদান্ত পড়িলে হইবে কি? কেবলই তাহা তর্কের সৃষ্টি করিবে। তাঁহাকে জানিতে গেলেই বেদান্ত কি তাহাও না পড়িয়া জানা যায়, শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াও লোকে মূর্খ হয়। ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াও লোকে অধার্ম্মিক হয়। তাঁহাকে জানিতে চাও কিছুই অনবগত থাকিবে না। তুমি দর্শন পড়িয়া বলিবে—তাহারা পরস্পর বিরোধী কিন্তু যে দর্শন করিয়াছে সে বলিবে—সবই একের অঙ্গ, তাহারা বিরোধী নয়, যাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিক তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠের আবশ্যকতা কি? তাঁহারাই যে শাস্ত্রকর্ত্তা!

অতএব মানুষ অগ্রসর হও, সাধনা কর। সাধনা করিতে চাহিলে তিনিই তাহা বুঝাইয়া দিবেন। বেহুঁস হইও না, জাগিয়া থাক।

রামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনী আধুনিক যুগের উপযোগী। আমরা স্ব স্ব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া যেখানে একটা সংশয়ে পড়িয়াছিলাম সেইখানে আমাদের দেবতা রামকৃষ্ণের মুখ দিয়া যে কথাগুলি আমাদের শুনাইয়াছেন তাহাতে আমাদের ধর্ম্মগতির বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কথায় নবশক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা রামকৃষ্ণকে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন। যাঁহারা নবশক্তি লাভ করেন নাই তাঁহাদের প্রকৃতি ভিন্ন ; তাঁহাদের জন্য অন্য গুরু আছে। আমরা অনেকেই তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে বর্ত্তমানযুগের গুরুস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম। আশা করি শ্রোতৃবর্গ আমার ভ্রম মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

আমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই কামনায় আগুন লাগিয়া উত্তম ক্ষার হইয়াছে—মনের ময়লা কাটিয়াছে।

ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখের অধীন হইয়াছে। আমিত্বের সাজ খুলিয়া ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। এখন যে 'আমি' আসিয়াছিলাম—সেই 'আমি'। ইহাতে 'আমি'ও নাই আমার ও নাই—ইত্যাদি কোন বিভক্তিই নাই। কেবল শূন্য 'আমি'—পূর্ব্বে বিশ্বগ্রাস হইতে বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা সর্ব্বজনীন শক্তিতে জীবনের সাফল্য লাভে হাস্যমুখ।

এখন বুঝিলে কেমন 'আমি'। না বুঝিয়া থাক,—স্থির হও;—ঠিক পথ বাছ—সত্যকে ধর, ঠিক বুঝিবে—না পার বুঝাইয়া দিব। পলাণ্ডু দেখিয়াছ—যাহাকে লোকে পেঁয়াজ বলে। একটা হাতে করিয়া দেখ—সে তোমার মত! পাতলা কাগজের মত—খোসা গুলি তাহা হইতে এক একটি ছাড়াও;—শুধু ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিও না;—দেখ সে গুলির ভিতর দিয়া যেন ওধারের জিনিস ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে দেখা যায়।—তারপর এক একটি খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে দেখিবে, শেষ একটি কলিকা—বীজকোষ! সেটি আর ছাড়ান যায় না। তখন পরিত্যক্ত খোসাগুলি আর তাহাতে লাগাইয়া আগেকার মত গোটা পেঁয়াজ কিন্তু করা যায় না। তবেই বুঝ্‌লে আগেকার 'আমি' খোসাশুদ্ধ পেঁয়াজ খোসায় মোড়া—আমিত্বে বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধনদৌলৎ, জমিদারী, রাজ্য, আবার মন, ইন্দ্রিয়—বাসনা প্রভৃতিতে মোড়া;—আর এখনকার গুড় বা গুরু প্রাপ্তির পর;—'আমি' ঐ খোসা ছাড়ান পেঁয়াজ! শুদ্ধ সত্ত্বময় কলিকা! সে নিজে মজিয়া অপরকে সুখী করে। ইহারই নাম আমিত্ব শূন্য 'আমি'! ইহারই নাম বিশ্বপ্রেমে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎকর্ষ! ইহকালের প্রেমশক্তি পরকালের প্রেম শান্তির সূচনা।

এই আগেকার আমি কত জন্ম কাটাইয়া আসিলাম। সিন্ধু তরঙ্গের মধ্যে পতিত ভাঙ্গা কাঠের মত কত ডুবা কত উঠা তাহার ঠিকানা নাই। কত পাহাড় পর্ব্বত ঢলিয়া পড়িল, কত মরুভূমি সাগরে মিশিল, কত সাগর শুকাইয়া মরুভূমি হইল, কত গ্রহ তারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিল—লুকাইল, কিন্তু সবে 'আমি' এ কি কৌতুক! মনে থাকিলেও চোকে বা হাতে কিছু নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে কত খাল বিলে পড়িলাম কত কাঁটায় জড়াইলাম—কত আগুণে পুড়িলাম—তবু আমি গুড়কে 'গুরু' জ্ঞানে লইলাম না। লইলেও, তাঁহার কথা শুনিলাম মাত্র—যে আমি সেই আমি—কাজ করিলাম না। তাই এত ভ্রম ও এত ভ্রমন, ঐ ভ্রমেইত ভ্রমণ অর্থাৎ আসা যাওয়া, আমি হওয়া, আমিত্বের রসে ডুব দেওয়া! এইরূপ ডুবিয়া, হাঁপাইয়া যদি 'গুড়'কে আশ্রয় করি—গুরু জ্ঞান করিতে পারি, তবেই

আমি 'আমি' হইতে পারিব। গুড়ের চটচটে ভাব থাকিবে না, প্রেমের সুধারস আসিবে। এখন বুঝিলে—কে আগের 'আমি', আর কে শেষের 'আমি'? আমি দুই-ই! আগের আমি হইতেই শেষের আমি গঠিত। আবার কার্য্যগুণে শেষের আমি হইতে আগের আমিতে যুগে যুগে পর্য্যবসিত। তবেই বুঝ—কে 'আমি'।

'আমি', ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠনের ন্যায়—এখন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলাম। এ ভিন্নত্বের মূল কে? মূল সেই গুড় বা তাহার মিষ্টতা অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন গুরুরূপী পরব্রহ্ম! গুরুকে এই ভাবেই ভাবিতে হয়। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর, গুরু পরব্রহ্ম! আবার শাস্ত্র বলিতেছেন—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরোবে নমঃ॥

তবেই বুঝ—সেই গুড়ের মিষ্টতা জিহ্বা হইতে অন্তরের কতদূরে ঘা দেয়। আবার শুন—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্‌পদং দর্শিত যেন তস্মৈ শ্রীগুরোবে নমঃ॥

ইহার অর্থ বুঝিলে? এ বুঝা আগের আমির বোঝা! ইহা বুঝিতে শেষের আমি অর্থাৎ আমিত্ব শূন্য হইয়া যখন আমি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় নির্ম্মল ও তরল (চকচকে) হই, তখন যে উপাধিশূন্য আমি, সেই আমিই ইহা বুঝিতে পারে। কেন না ইহাতে আপনার হৃদয়কে দেখিতে হয়। তাহাতে যে পরব্রহ্ম উপাস্যদেব যে রূপে মন ভুলিয়া যায়, প্রেমে চোকে জল গড়ায়, ভাবে অঙ্গ অবশ হয়, সেই রূপ, সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে আছে, গুরু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই আমি কে, তাহা দেখাইয়া দেন। গুরু দেখান সকলকে, কিন্তু দেখিতে পারে, ধরিতে পারে পূজিতে সমর্থ হয়, খাওয়াইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে কৃতার্থ হয়, পদসেবায় জন্ম সফল করে, শুধু সেই আমি, অর্থাৎ আমিত্বশূন্য নিরুপাধী আমি। নতুবা কোথায় কে? সব ছায়া বাজী; সব ভূতের বোঝা; সব হাটের কেনাবেচা; সব রঙ্গালয়ের অভিনয়। এখন বুঝিলে—গুরু কি ও কাহার প্রসাদে আমি 'আমি' হই? আরও বুঝিলে কি—কে 'আমি'? 'আমাকে' সামান্য ভাবিও না। আগের আমিও সব করি ও করিতে পারি—নিজেকে পাঁকে ডুবাই, বিষ খাওয়াই, তবে পারি না কি? তাই বলি যে 'আমি' সামান্য নই। আবার শেষের 'আমি'ও সামান্য নই—এ আমি কাচ হইতে মণি, গোষ্পদ হইতে মহাসিন্ধু

হইয়া, ভূতল হইতে আকাশে উঠিয়াছি। গুরুদত্ত মহামন্ত্রের বিশ্বাসে—তাঁহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে হৃদয়স্থ মনোজ্ঞ, মনোনীত চিৎঘন মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, চিনিয়াছি ধরিয়াছি, তাই আমি আজ সে আমি নই—সামান্য নই—সব করিতে পারি। মুখে অগ্নি জ্বলে, তাই ঋষিরা যা বলিতেন, তাই হইত। দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন। ঐ দেখ দুর্ব্বাসার অমোঘ বাক্যে ইন্দ্র স্বর্গভ্রষ্ট। শমীকপুত্র বালক শৃঙ্গীর মহাবাক্যে পরীক্ষিত তক্ষকদষ্ট। অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুর অভিশাপে দশরথের পুত্রত্বপ্রাপ্তি ও মৃত্যু। আবার এ দিকে দেখ পরব্রহ্ম শ্রীকণ্ঠ বৈকুণ্ঠকান্ত ব্রহ্ম সম্মান রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য হাসিতে হাসিতে বক্ষস্থলে ভৃগুপদ ধরিয়াছেন। সেই আমি এখন বুঝ কে আমি। আমি সাধন-সমরে সর্ব্বজয়ী—ক্ষত্রিয় হইয়া, সংসারী হইয়া—ক্রমে ঐ গুরুবলে—মনকে আপনার করিয়া হৃদয়ে পরব্রহ্মকে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি, সেই আমি বিশ্বামিত্র বাকবজ্র ঋষি—ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের জন্য, দ্বিতীয় স্বর্গের জন্য, দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে অগ্রসর। বুঝিলে ক্ষুদ্র আমি কত বড় ও আমি কে? আবার ওদিকে দেখ, বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইলে কি হইবে—বৈকুণ্ঠকান্তের পার্ষদ হইলে কি হইবে; জয় বিজয় আমিত্বে ডুবিয়া অগ্নিমুখ ঋষি বাক্যে বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট! একক্ষেত্রে আমিত্বে ডুবা—ও আমিত্ব শূন্য অবস্থার ফল দেখ। বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইলে কি হইবে? অন্যায়ের হাটে—সত্যের অসম্মানে তাহারা ডুবিয়া গেল, আর ন্যায় সত্যের সম্মান রক্ষায় উলঙ্গ ঋষিরা জয়ী হইলেন।

তাই বলি এই আমি দেখিতেছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অগণ্য নগণ্য—কিন্তু মনে করিলে আমি সবই পারি। আগুণ সকল স্থানেই জ্বলে জানত, কিন্তু মূল এক আগুণ। একটি দীপশিখা হইতে অন্য দীপশিখার উৎপত্তি—তবেই হইল, আগুণ না হইলে আগুণ জ্বালাইতে পারে না। কাঠে কাঠে ঘসিলে আগুণ জ্বলিলেও, কাঠের ভিতর অপ্রত্যক্ষ অগ্নি থাকেই; তেমনি তোমার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ এক শক্তি আছেই, না থাকিলে তোমার জন্মই হইত না। বীজ যতই শুষ্ক হউক,—তার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে জীবনাশক্তি অঙ্কুর থাকেই—মৃত্তিকা তাপ জল বায়ু পাইলেই তাহা জাগিয়া উঠে—তখন তাহা সুবৃহৎ কাণ্ডশাখা মহীরুহে পরিণত হয়। দেখ তাহার অপ্রত্যক্ষ শক্তির তেজ! তেমনি তোমার তেজ গুরুর তেজে মিশাইয়া দাও। গুরুকে আপনার মত—পরব্রহ্ম না ভাবিলে, তিনি পরব্রহ্মকে হৃদগত উপাস্য দেবকে দেখাইলেও কেহ দেখিতে পায় না। ইহার ভিতরে আবার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। শুন নাই—এক গোয়ালিনী নিত্য

গুরুকে দুধ দিয়া আসিত। বর্ষাকাল, একদিন দিনরাত বৃষ্টিতে তাহার গ্রামের ও গুরুর গ্রামের মধ্যস্থ নদী দুকূল ছাপিতেছে। গোয়ালিনী গুরুর দুধ লইয়া তীরে ;—গুরু নারায়ণ, দুধ না হইলে সেবা হইবে না ; গোয়ালিনী স্থির থাকিতে না পারিয়া গুরু বলিয়া নদীর জলে পা দিল, ক্রমে এক পা—দু পা ;—বা জলের উপর দিয়া বেশত যাওয়া যায়—গোয়ালিনী 'গুরু' বলিয়া সেই দুকূলহানা নদীর উপর দিয়া অসিক্ত অবস্থায় দুধের কেঁড়ে কাঁকালে লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত"—দেখ বিশ্বাস! ইহা গল্প হইলেও—সত্য ভাবিও—আবার এক সত্য ঘটনা শুন। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়াছ ;—তিনি মাকে মহাগুরু মনে করিতেন। বাটীতে ভ্রাতার বিবাহ ;—বিবাহের দিন প্রাতে চিঠি পাইলেন, মা লিখিয়াছেন—না আসিলে এ বিবাহে তাঁহার সুখ হইবে না। মাতৃ আজ্ঞায় ঈশ্বর ছুটিলেন—পুরোভাগে শ্রাবণের দামোদর নদ, নৌকা ওপারে গিয়াছে, তাহার আশায় থাকিলে আজ আর বাটী যাওয়া হয় না। অনেক লোক নৌকার অপেক্ষায় তীরে দণ্ডায়মান, যুবক ঈশ্বর মাকে গুরুজ্ঞানে সেই নদের জলে ঝাঁপ দিলেন ;—সকলে ভাবিল মৃত্যু নিশ্চয়! কিন্তু মৃত্যু কোমল আলিঙ্গনে আশ্রয় দিয়া সেই উত্তাল তরঙ্গ ও ঘূর্ণি জল হইতে ঈশ্বরকে ওপারে লইয়া গেল—দেখ গুরুভক্তি ও বিশ্বাস! এইরূপ ভক্তিও চাই,—সৎগুরুও চাই ;—ভক্তি না থাকিলে সৎগুরু পাইলেও মানুষ ক্রমে ভক্তি পাইয়া মানুষ হয়।

তুলসী দাস বলিয়াছেন—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান কর উপদেশ।
কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব আগ্‌ করে প্রবেশ!

আবার আর্য্যঋষিগণ কি বলিতেছেন শুন—

'গ'কার সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফ পাপস্য দাহকঃ।
'উ'কার শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্ম গুরুস্মৃতঃ॥ (তন্ত্র)

ওরে বাপরে! এ গুরু পাব কোথা, কালানুসারে সবত সজ্জায় ঢাকা—চিনিতে গেলে আসলে নকল উঠিবে। না ;—চোকে বা জ্ঞানে ও গুরু পাব না। শুনিয়াছি প্রকৃত ব্যক্তি সহজে ধরা দেন না। পাগল সাজেন। ঐ দেখ শুকদেব উলঙ্গ হইয়া পরীক্ষিতের মৃত্যুসভায় যাইতেছেন, ছেলেরা ধুলা কাদা গায়ে দিতেছে, তিনি কেমন হাসিতেছেন?

তবেই না চিনিলে সব ফস্‌কাইয়া গেল। কেন ভয় কি? জ্ঞান বিবেক মধ্যে একবার মনের গুরু হইয়া তাহাকে স্ববশে আন ;—পবিত্র করিয়া তোমার

উপর উঠাইয়া লও,—তখন তাহাকে গুরুভাব, সে তোমাকে তোমার হৃদয়স্থ পরব্রহ্মকে দেখাইয়া দিবে। এইরূপ হইলে মাত্র ভক্তিতে তোমার আমিত্ব ঘুরিয়া যাইবে। তখন দেখিবে আধ্যাত্মিক ভাবের শক্তি কত!

নতুবা সেই বিশ্বাসের কথা ভাব, গুরুকে গুরু ভাবিয়া ভক্তি ঢালিয়া দাও। তখন দেখিবে তুমি তাঁহার হইয়া গিয়াছ। তিনি যেরূপই হউন—তোমার কাজ হইয়া গিয়াছে—তখন শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি হইয়া হৃদয়স্থ চিত্তরঞ্জন চিৎঘন নিরঞ্জনকে দেখিয়া ধরিয়া তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ 'স্বামী' ভাবিয়া নিজে 'স্ত্রী' হইয়া মাধুর্য্য রসে ভগবৎ ভক্তিতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পঞ্চরসের ভাব দেখিতে পাইবে। ইহার পূর্ব্বপূর্ব্বটি হইতে উত্তর উত্তরটি ক্রমে ভগবানের নৈকট্য লাভ করিয়া এখন প্রথম চারিটি শেষের মধ্যে মিশিয়া যায়—তখন পরাশান্তি। বৃন্দাবনে গোপীরা ইহাই পাইয়াছিলেন।—তাঁহার সঙ্গে প্রেমের হ্রদে ডুবিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ হইলে কি আগের 'আমি' কি শেষের 'আমি' কোন জ্ঞানই থাকিবে না। তখন—

"তারা আমি স্বখাদ পুকুরে ডুবে মরি।"

অথবা—

"লাভ না পেলাম লাভ না খেলাম
মলাম ভূতের বেগার খেটে।"

বলিয়া কাঁদিতে হইবে না। এখন মনে কর সাধকের—সেই গান—

এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা? এখন কে 'আমি' ও কি হইতে পারি—বুঝিলে ত?

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সেন।

শক্তি-সাধনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় ছেলের চাতুরী।

বড় ছেলে সর্ব্বেশ্বরের মন গোড়া থেকেই ভাল নয়। তিনি কাহার ভাল দেখিতে পারেন না, কাহাকেও সাহায্য করিতে বা কাহারও অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে তিনি আদৌ ভাল বাসেন না। নিজের পরিবার এবং ছেলে দুইটি ভাল থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিলেই তাঁহার আনন্দের সীমা

থাকিত না। সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ এমনি ছোট, মন এমনি নীচ ভাবাপন্ন।

প্রমোদা তাঁহার প্রাণের প্রনয়িণী, তাঁহার বাক্য সর্ব্বেশ্বর জীবনে কখনও অবহেলা করেন নাই। পিতামাতার কথা, সহোদর ভ্রাতার কথা, পিসিমার কথা বরং ঠেলিতে পারা যায়, কিন্তু প্রনয়িণীর বাক্য লঙ্ঘন করা অতীব অন্যায় ও কাপুরুষের কার্য্য, সে আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া দিয়া অপর একজনকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে; তাহার কথা না রাখিলে ধর্ম্মসঙ্গত পাপ হইবে যে। পিতামাতা কাশী গমনের পর সর্ব্বেশ্বর এইরূপে নিজের মদগর্ব্বে কাজ করিতে লাগিলেন। মনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, পিতামাতার ভয়ে এতদিন তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কোন কাজ করিতে পারেন নাই—এইবার বাধাবিঘ্ন ঘুচিয়াছে, বুড়াবুড়ি কাশী চলিয়া গিয়াছে—এইবার সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদার দম্ভ দেখে কে? দুই তিন মাস যাইতে না যাইতেই দেবানন্দ ও উমাকালীর এত সাধের সাজান সংসার, ধর্ম্মভাবে উজ্জ্বলীকৃত এমন পবিত্র ভবন বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হইয়া গেল, বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল। আত্মীয়স্বজন যাহারা এতদিন এ সংসারে গুরুর মত আদর পাইয়া আসিতেছিল, দেবানন্দ যাহাদিগকে পূজা-ভোগ দিয়া দেবতার মত সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, আশ্রিত বলিয়া যাহাদিগকে একটা দিনের জন্য কোনও কথা বলেন নাই—পাছে তাঁহারা হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন। আজ কয়েক মাস মাত্র তাঁহারা এস্থান পরিত্যাগ করিতে না করিতেই তাঁহাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার, যেরূপ বচন-বাণ স্বামী-স্ত্রীতে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই পলাইতে পথ পাইতেছেন না, ইহারই মধ্যে অনেকে এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; সকলেই বলিতেছেন—এরূপ সুখ অপেক্ষা চির দুঃখ বরং প্রার্থনীয়। সর্ব্বেশ্বর ও উমা-কালীর পবিত্র বংশে এমন দুর্বৃত্ত পুত্র কেমন করিয়া জন্মিল?

রামেশ্বর দাদার ও বৌদিদির ব্যবহার দেখিয়া প্রথম প্রথম দুই একটি হিত-কথা বলিয়া পিতামাতার কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কথা দাদা ও বৌদিদির ভাল লাগে নাই; তাঁহারা বলেন—তোমার যদি এত দয়ার শরীর, তাহা হইলে নিজের খরচে উহাদের প্রতিপালন কর না। পিতা কি এমন জমীদারীর আয় রাখিয়া গিয়াছেন যে এত গুলি লোক চিরজীবন বসিয়া খাইবে; পিতার বিদায় পত্রাদির আয় যথেষ্ট ছিল, তাহাতে তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন। এখন আর সে আয় নাই, তবে ঐ সকল নিষ্কর্ম্মা লোকের অন্ন হইবে কিসে? বিশেষতঃ আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ, ভগবান হাত-

পা দিয়াছেন, বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়া মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন, পশুত আর নয় যে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, খাটিয়া খাক্ না। পরের স্কন্ধে কতদিন আর এরূপ করিয়া চলিবে, যেরূপ দিন কাল পড়িতেছে, তুমি তার কি জানিবে ভাই, আস্‌কে খাও ফোর ত গনণা?

পিতার আত্মীয়-স্বজনত বিতাড়িত হইল কিন্তু শ্বশুরকুলের সম্পর্কে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছে, শাশুড়ী-শ্যালক-শালী প্রভৃতির কলরবে ভট্টাচার্য্য-সংসার আবার নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। প্রমোদা তাহাদের তুষ্টিসম্পাদন করিতে, তাহাদের সেবাযত্ন করিতেই ব্যস্ত—অপর সকলে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাক—তাহাতে প্রমোদার যায় আসে কি? সংসারে পরিশ্রম করিবার কেহ নাই, কেবল দাক্ষায়ণী ও পুরাতন ঝি, সেই সদেগাপের মেয়ে চঞ্চলা। চঞ্চলা বাস্তবিক চঞ্চলা, সে বহুদিন এ বাড়ীতে দাসীত্ব করিতেছে, দেবানন্দ ও উমাকালীর মত প্রভুর অধীনে তাই, নতুবা অন্য স্থান হইলে একদিনও তথায় থাকিতে পারিত না, সে যেমনি মুখরা—তেমনি চঞ্চলা। এখন পাছে বিতাড়িত হয়, তাই নূতন কর্ত্রীর মনযোগাইতে ব্যস্ত, অন্য কাজ করিবার সময় তাহার কোথায়! কাজেই দাক্ষায়ণীকে এই বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধেই বহন করিতে হইতেছে। রামেশ্বর দাদার ও বৌদিদির বিচার ব্যভিচার দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইতে লাগিলেন—বড় ভাই পূজনীয় বলিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। দাদার শ্যালক মহিমচন্দ্র গণ্ডমূর্খ, এত বড় মিন্সে কখন লেখাপড়ার ধার দিয়াও যায় নাই, মা সরস্বতীর সহিত তাহার চিরবিবাদ হইলেও পোষক-পরিচ্ছদের বেশ আঁটা-আঁটা ভাব—সদাই বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত, যেন একটী ক্ষুদ্র নবাব! দিদি ছোট-ভাইটীকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাহাকে আদর দিয়া ক্রমশঃ মাথায় তুলিতেছেন, সে এক সর্ব্বেশ্বরকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। মহিমচন্দ্র প্রনয়িণীর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া সর্ব্বেশ্বরও তাহাকে বেশী কিছু বলিতে সাহস করেন না, পাছে মানময়ীর মানের কিছু লাঘব হয়। এখন শাশুড়ী সর্ব্বেশ্বরী কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, যাহা না করিবেন, কিছুতেই তাহা হইতে পারিবে না। অতিশয় দরিদ্র-গৃহের গৃহিনী কখনত এরূপ কাণ্ড কারখানা, এত অধিক আয়ের সংসার স্বচক্ষে দেখেন নাই; এরূপ আহারাদির ব্যবস্থা; এত দাস-দাসী লইয়া সংসার চালান, তাহার জীবনে ত কখন হয় নাই, কাজেই এত বড় একটা সংসারের কর্ত্রী হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইলে তাহার মস্তিষ্ক ত-গরম হইয়া উঠিবেই, তাই প্রমোদার জননী ভবতারিণীর মেজাজ সদাই

খিটাখটে, মন অহরহঃ রোষভারাক্রান্ত; সকলেরঃনিকট এই ভাব কিন্তু কন্যা-জামাতা ও পুত্রের নিকট সদাই যোড়হস্ত।

দাক্ষায়ণী প্রত্যহ বেলা বারটা অবধি সংসারের কাজ করিয়া তারপর গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা-ভোগের উদ্যোগ করিয়া দেন, রামেশ্বর স্বহস্তে পাক করিয়া দেবতার তুষ্টিসম্পাদন করেন, ভিন্ন গোত্রে দেবতার ভোজন হয় না বলিয়া দাক্ষায়ণীর দ্বারা এ কার্য্য হয় না, উমাকালী স্বহস্তে যাহা করিতেন, এখন রামেশ্বর তাহাই করেন, তদ্ব্যতীত গৃহের পূজা ও যজমানের কার্য্য সমস্তই তাঁহাকে করিতে হয়। দাক্ষায়ণী সংসারের কাজ করিয়া পরে অতিথিশালায় যে কয়টী অতিথি অবস্থান করেন, তাহাদের পাকাদির যোগাড়, কেহ অশক্ত হইলে স্বহস্তে তাহাদের রন্ধন করিয়া দিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া অপরাহ্ণে রামেশ্বরের সহিত আহারাদি করেন। ব্রাহ্মণের বিধবা রাত্রে কোন দিন কিছু জলযোগ করেন, কোন দিন করেন না। রামেশ্বর ঠাকুরের শীতলের দ্রব্যাদি প্রসাদ পাইয়া রজনী যাপন করেন। তাহাদের কিরূপ হইতেছে, তাহারা খাইতে পাইতেছে কি না, সুখে কি দুঃখে আছে, বড় দাদা ও বৌদিদি তাহার কিছুমাত্র সংবাদ গ্রহণ করেন না।

রামেশ্বর তাহার জন্য দুঃখিত নহেন, কারণ তিনিত দাদার মুখাপেক্ষী নহেন! হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ আছে, দেবতার আশীর্ব্বাদে তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল, শাস্ত্রপাঠে সদাই প্রাণে আনন্দ, তবে দাদা ও বৌদিদির কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে কেন? তিনি আহারাদির পর সময় পাইলে অতিথিশালায় যে কয়জন অতিথি থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত অবিশিষ্ট সময় ধর্ম্মালোচনায় কাটাইয়া দিতেন, সংসারের কোন কথায় থাকিতেন না, পাছে কোনরূপ গর্হিতাচরণ দেখিলে কোন কথা বলিয়া ফেলিতে হয়, তাহার দরুণ পাছে দাদা ও বৌদিদির মনে কোন কষ্ট হয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে কয়েকখানি ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ আর বাহির দিকে কয়েকখানি মাটীর ঘর, বড় একখানি আটচালায় অতিথিগণের থাকিবার স্থান, পার্শ্বে ভোগের গৃহ, তাহার পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণের একটী ক্ষুদ্র মন্দির। তখনকার দিনে খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হইলে এরূপ বাসভবন পল্লীগ্রামে কাহার থাকে না! বড় দাদা ও বৌদিদি পুত্র-কন্যা লইয়া অন্দরের ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস করেন, আর দেবানন্দ ও উমাকালী বাহিরের যে দুইটী ঘরে থাকিতেন, রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণী তাহাতেই অবস্থান করেন। অন্দরের

পাকশালা একটী স্বতন্ত্র গৃহ, তাহাও সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও কন্যা হেমলতা, কাকা ও ঠাকুরমার বড়ই অনুরক্ত, তাহারা সর্ব্বদাই রামেশ্বর ও দাক্ষায়ণীর নিকট থাকে; মা, মামা ও দিদিমা ডাকিলেও যায় না, তবে পিতা আসিয়া যখন ডাকেন, তখন ক্ষুদ্র বালক ও বালিকাটী বাবা কলিকাতা হইতে বোধ হয় কোন নূতন খাবার দ্রব্য আনিয়াছেন, এই লোভে পিতার সাড়া পাইবামাত্র ছুটিয়া যাইত, যাহা হয় কিছু নূতন জিনিস পাইত, লইয়া আবার ভবানী কাকার কাছে, হেমলতা ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খেলা করিত—বাড়ীর ঐ সকল অন্তঃপুরের সঙ্গ তাহাদের ভাল লাগিত না।

বংশের দুলাল ভবানীকে রামেশ্বর প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতেন, খাওয়ার সময় সে পাতে না বসিলে তাঁহার খাওয়া হইত না। বালকের হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ, তাহার কে আপনার আর কে পর, সে ভালবাসার ভিতর দিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল, তাই ভবানী কাকাকে না দেখিলে, তাহার কাছে প্রত্যহ বৈকালে প্রথমভাগের সেই কর-খল মুখস্থ না করিলে তাহার মন ভাল থাকিত না, পড়ায় আগ্রহ বাড়িত না। কাকাও তাহাকে খাওয়াইয়া বুকে করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন, তারপর তাহাকে পড়া শিখাইতেন, বংশাবলীর সকলের নাম, গাঁই গোত্র কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন, বালক তোতাপাখীর মত অল্পদিনের মধ্যে তাহা এত কণ্ঠস্থ করিয়াছিল যে আজকাল এম-এ উপাধিধারী যুবকও তাহা পারে না। কারণ আজকাল এ সব শিক্ষা, নিজের বংশাবলীর ইতিহাস আর কেহ কণ্ঠস্থ করে না, তাহার স্থানে ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহাদের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে, বাঙ্গালী আজ ঘর ছাড়িয়া পরের হইয়াছে।

হেমলতা কাকার কাছে সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তীর গল্প শুনিয়া তারপর দাক্ষায়ণীর কাছে গৃহকর্ম্ম শিখিতে যাইত, সে বালিকা হইলেও এই সকল যে অবশ্য করণীয় তাহা এখন হইতেই তাহার অন্তরফলকে অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রমোদা একমাত্র বধূ, বড় আদরের হইলেও শাশুড়ীর সহিত কখনও এ সকল কার্য্যে এমন করিয়া যোগ দেন নাই। দরিদ্রের কন্যা হইলেও ধনবানের পুত্রবধূ হইয়া তিনি অহঙ্কারেই মাতিয়া থাকিতেন—হাবভাবেই দিন কাটাইতেন, তাহার পর যেটুকু সময় পাইতেন, অতি সন্তর্পণে আসিয়া এক একদিন শাশুড়ীর সহিত গৃহকর্ম্মে যোগ দিতেন এবং যতদূর সম্ভব উমাকালী তাহাকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু শিক্ষায় যাহার মনস্থির হয় না, সে কতক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে? অমনোযোগী হইলে উমাকালী নিজের কর্ম্ম পণ্ড হইবে ভাবিয়া বধূমাতাকে নিজের গৃহকর্ম্মে

যাইতে বলিতেন, প্রমোদা চলিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। উমাকালী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সংসার-কার্য্যে সুনিপুণা করিতে পারেন নাই।

এখন শাশুড়ী নাই, প্রমোদাই এখন কর্ত্রী, সকলেই তাহার ভয়ে জড়সড়। রামেশ্বর বড় দাদা ও বৌদিদিকে দেবতার মত মান্য করেন, তাঁহাদের কোন কাজের প্রতিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস নহে, তাই তাঁহারা যাহা করেন, অপ্রতিহত প্রভাবে তাহা সমাহিত হয়। এমন সাধু-প্রকৃতি ছোট ভ্রাতার উপরও সর্ব্বেশ্বর ও প্রমোদা সন্তুষ্ট নহেন। সদাই খিট্ খিট্ করিয়া থাকেন, বলেন—ধর্ম্মকর্ম্মে ঐরূপ ভাবে সমস্ত দিন কাটাইলে চলিবে না, উপায়-উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইবে, বসিয়া খাওয়া আর কতকাল চলিবে?

জমীদারীর প্রজাগণ কর্ত্তা মহাশয়ের আমলে বেশ সুখে ছিল, একদিনের জন্য উৎপীড়িত হয় নাই, এখন নূতন জমীদারের হস্তে পড়িয়া তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বর হুকুম দিয়াছেন—প্রজার কিছু থাক আর নাই থাক, তাঁহারা খাইতে পাক আর নাই পাক, জমীদারের খাজনা পূর্ব্বের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে না। কর্ত্তার সময় অন্যরূপ আয় ছিল, তাই তিনি খাজনা ফেলিয়া রাখিতেন, আমার সময় তাহা হইবে না, গোমস্তা মহাশয়কে কড়া হুকুম দিয়াছেন—যে প্রজা খাজনা না দিবে, তাহার নামে বাকী খাজনার নালিশ কর, তাহার হাল গরু বেচিয়া টাকা উসুল কর। জমীদারের গোমস্তা ত এক একটী যমের দূত, উৎপীড়ন ত তাহারা কথায় কথায় করিয়া থাকে, তাহার উপর জমীদার কর্ত্তৃক যদি উৎসাহিত হয়—তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? গোমস্তা তড়িৎ ঘোষ এখন উৎপীড়নের চরম দেখাইতে লাগিল। দরিদ্র প্রজাগণের নামে নালিশ, তাহার পর টাকা আদায়ের সময় তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, মানুষের হৃদয় লইয়া কেহ সেরূপ করিতে পারে না।

প্রজাগণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। তাহারা প্রথমে বড় বাবুর কাছে আসিয়া নালিশ করিল, কত কান্নাকাটী করিল, পাষাণ-হৃদয় সর্ব্বেশ্বর সে কথায় কাণ দিল না, প্রজার সে দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হইল না। তারপর তাহারা ছোট বাবু রামেশ্বরকে করযোড়ে সমস্ত নিবেদন করিল; কোমল হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ রামেশ্বর প্রজাগণের দুঃখে গলিয়া গেলেন, তিনি দাদার কাছে তাহাদের জন্য অনেক করিয়া অনুনয় বিনয় করিলেন, তাহাতে প্রজার পক্ষে কোনও ফল ত ফলিলই না—পরন্তু তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হইল, তিনি শুনিলেন—বসিয়া বসিয়া খাইতেছ, কোন খোঁজ ত রাখ না, প্রজারা খাজনা না দেওয়ায় জমীদারীর দেনা

হইয়া পড়িয়াছে, এইবার দেনার দায়ে বাস্ত পর্য্যন্ত টান ধরিবে, তখন থাকিবে কোথায়? তথাপি রামেশ্বর বলিল—দাদা উহাদের পীড়ন করিলেই কি খাজনা আদায় হইবে, না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? উৎপীড়ন না করিয়া বরং ভাল কথায় কাজ ভাল হয়।

তোমাকে আর সে পরামর্শ দিতে হইবে না, আমি তোমার অপেক্ষা বেশী বুঝি, যখন দেনার দায়ে ঘর বাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইবে—তখন বুঝিতে পারিবে করুণার ছড়া তখন কোথায় থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই। বৃথা অগ্রজের সহিত বচসা করিয়া মস্তিষ্ক গরম করা ভাল নহে, দাদা অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝেন; তিনি প্রজাগণকে অন্তরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। সেদিন বৌ-দিদির নিকটও তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হইল। মহিমচন্দ্র ভগ্নীপতির ও ভগ্নীর আস্কারায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেও সেদিন রামেশ্বরকে দুই এক কথা বলিতে লাগিল, রামেশ্বরের তাহা সহ্য হইল না; যাহার খায় তাহারই সহিত এইরূপ ব্যবহার! রামেশ্বর সেদিন বেশ দুই কথা তাহাকে কড়া করিয়া শুনাইয়া দিলেন। তাহাতেই প্রমোদা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল,—ইহার একটা প্রতিকার না করিলে চলিবে না, মহিম কি উহার খায় না পরে, যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমার ভাইকে গালি দেওয়া। সর্ব্বেশ্বর আসিলে প্রমোদা সেই সকল কথা নানা প্রকারে রসান দিয়া স্বামীর কর্ণে ঢালিয়া দিল, সর্ব্বেশ্বর আরও ২।১ দিন এইরূপ কত অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়াও কিছু বলেন নাই, আজ আর রাগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ছোট ভাইকে ডাকিয়া যাহা ইচ্ছা হইল—তাহাই বলিলেন! আরও বলিলেন—রামেশ্বর, ঐরূপ করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া আর সকলের সঙ্গে ঝগড়া করা হইবে না, উপায়ের চেষ্টা দেখ, যজমান চরাইয়া আর কতদিন চলিবে? ওদিকে জমীদারীর দুই হাজার টাকা দেনা হইয়াছে—অর্দ্ধেক তোমাকে দিতে হইবে, নতুবা উহা বিক্রয় হইয়া যাইবে, আর অতিথিশালা বন্ধ করিয়া দাও, আমি উহার বৃথা খরচ আর বহন করিব না, কতকগুলা অকর্ম্মাকে আর অমন করিয়া প্রশ্রয় দিব না।

রামেশ্বর মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—দাদা! আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছেন, মহিমঃআমাকে সময়ে সময়ে অনেক সম্বন্ধ ছাড়া কথা শুনাইয়া দেয়, কোন দোষ না থাকিলেও আপনার ও বৌদিদির তিরস্কার শুনিতে পারি কিন্তু মহিমের অযথা কথা কি শুনিতে পারা যায়, এজন্য অনেক সহ্য করিয়া আজ দুইচার কথা বলিয়াছি। ইহাতে আপনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন কেন?

জমীদারীর দুই হাজার টাকা দেনা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে হইবে বলিতেছেন, আমি অত টাকা কোথায় পাইব ভাই! যদি জমিদারী রাখিতে না পারেন, বিক্রয় করিয়া ফেলুন—আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। অতিথিশালা তুলিয়া দিতে পারিব না, পিতার অমন একটা মহৎকীর্ত্তি জীবিত থাকিতে তোলা হইবে না। তবে আপনি যদি উহার ভার না লয়েন—আমি যজমানের কাছে ভিক্ষা করিয়া উহা চালাইব। সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—জমীদারী বিক্রয়ে তবে তোমার মত আছে?

রামেশ্বর—যদি ক্রমশঃ দেনা হয়, তাহা হইলে অমত করিয়া কি করিব?

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—আচ্ছা তাহাই হইবে; অতঃপর অতিথিশালার ব্যয় আমি আর দিব না, তুমি উহা যেরূপে পার চালাইও। সর্ব্বেশ্বর রাগে মুখভার করিয়া চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরও সন্ধ্যার আলো জ্বালিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোমালিন্য।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এ জগতে দুই প্রকারেই নাম বজায় রাখিতে পারা যায়—ভাল কাজেও নাম থাকে, মন্দ কাজেও নাম থাকে। তবে ভাল কাজে যে নাম রাখিয়া যায়, তাহার স্মৃতি আজীবন লোকে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রীতিচন্দনে পূজা করিয়া থাকে, সেই মহৎ আদর্শ তাহাদের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেয়, আর মন্দ কাজে যাহার কীর্ত্তি বজায় থাকে, নাম জগৎব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, রসনায় লোকে তাহার নাম উচ্চারণ করে বটে; তবে ঘৃণার সহিত; এবং সে আদর্শ যতই জগৎ হইতে লোপ পায়—তাহার চেষ্টা করে। পুত্র-কন্যাকে তাহার আদর্শ অনুকরণ করিতে নিষেধ করে।

দেবীপুরে দেবানন্দ যে আত্মকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে যেরূপ স্নেহের-চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের আপদে বিপদে ঠিক আপনার মত যেরূপ সাহায্য করিতেন, তাহা আজীবনে কেহ ভুলিতে পারিবে না; চিরদিন তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সেই অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার জনে জনে ঘোষণা করিবে, সেই দেবোপম ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি চিরকাল গ্রামবাসী

আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাগণ হৃদয়মন্দিরে রাখিয়া দেবতার মত পূজা করিবে, পুত্রকন্যাগণকে সেই পবিত্র দেব-দম্পতীর আদর্শ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিবে। আর তাঁহারই পুত্র হইয়া সর্ব্বেশ্বর যে কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, যেরূপ অন্যায় আচরণে অভ্যস্ত হইয়া টাকার বলে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহাও লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে না, তবে পূজার পরিবর্ত্তে তাহার নাম করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, টাকার ভয়ে প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনে অজস্র গালী দিবে এবং তাহার আদর্শ কোনও প্রকারে পুত্রকন্যার হৃদয়ে বদ্ধমূল না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। সৎকীর্ত্তি ও অসৎকীর্ত্তিতে এইরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ।

সর্ব্বেশ্বর এখন অতুল ধনের অধীশ্বর—টাকার অহঙ্কারে তিনি এখন ধরাকে সরার মত দেখিতেছেন, টাকার জন্য কোন কুকর্ম্ম করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। দেবীপুরবাসী তাহার অত্যাচারে দিন দিন বড়ই উৎপীড়িত হইতে লাগিল, সকলেই বলিতে লাগিল—এমন দেবকল্প ব্রাহ্মণের বংশে এমন কুলাঙ্গার পুত্র কেন জন্মাইল? প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের কোন প্রকার ক্ষমতা দেখান চলে না, ক্ষমতা দেখাইতে গেলেই হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে, টাকার বলে শেষে প্রবলেরই জয়জয়কার হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, নির্ধনীর উপর ধনীর উৎপীড়ন, ইহা কলিকালেরই বিধি। কোন প্রকারে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। তবে যদি দরিদ্রের বন্ধু, বিশ্বের নিয়ন্তা ভগবান এদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি সদয় হইয়া যদি দুরাত্মা জমীদারের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন—তবেই রক্ষা, নতুবা আর উপায় নাই। সকলে অনন্যোপায় হইয়া উর্দ্ধমুখে বিশ্বকর্ত্তা ভগবানকে সর্ব্বেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহাদের আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

মানুষের যখন সময় ভাল হয়, তখন বুঝি কোনরূপ বাধাবিপত্তি—কোনরূপ আপদ বিপদে তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই সর্ব্বেশ্বর প্রজাবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের এত অভিশাপ, এত মনঃক্ষুণ্ণের মধ্যেও আপনার অপ্রতিহত প্রভাব অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল, একপদও টলিয়া পড়িল না, বা কিরূপ পিতার পুত্র হইয়া কিরূপ ভাবে লোকের সহিত ব্যবহার করিতেছে, তাহা একদিনের জন্য চিন্তা করিল না, অবাধে পাপসঞ্চয় করিতে লাগিল।

ধার্ম্মিক প্রবর রামেশ্বর ভ্রাতার ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। কাশীতে পিতামাতাকে এ সকল বিষয় জানান কর্ত্তব্য কিনা বিবেচনা করিলেন,

তারপর মনে মনে বলিলেন—পিতামাতা এখন উপযুক্ত পুত্রের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; ধর্ম্মে-কর্ম্মে চিত্ত স্থির করিয়া জীবনে শান্তি অনুভব করিতেছেন। এ সময় তাঁহাদিগকে আবার সংসার চিন্তায় ফেলিয়া পরকাল চিন্তার পথ রুদ্ধ করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। দাদার এ সকল অত্যাচার শুনিলেই তাহাদের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিবে, হয়ত তাঁহাদের শান্তির বদলে প্রাণে বিষম অশান্তির উদয় হইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় বাধা প্রদান করিবে। অতএব এখন আর এ সকল বিষয় তাঁহাদের কর্ণ-গোচর করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যে যেমন কাজ করিবে, কিছুদিন পরে সেই তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করিবে, তাহার জন্য আর বিব্রত হইলে চলিবে কেন? যখন এত বুঝাইয়া, এত মনতি করিয়াও তাহার মন ফিরাইতে পারিলাম না, তখন ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তিনি মানবকে ধ্বংসের দিকে লইয়া গেলে, কাহার সাধ্য তাহাকে ফিরাইয়া আনে? রামেশ্বর ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এখন আর তাঁহার সহিত দাদার তত সদ্ভাব নাই, যে কোন সৎযুক্তি দিলে তিনি শুনিবেন বা সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন। এখন মহিমচন্দ্রই যে তাঁহার পরামর্শদাতা, তাহারই পরামর্শে যে দাদা এখন উঠেন বসেন, অপরের সৎপরামর্শ এখন তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে না?

বাহিরে প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার ত হইতেছেই, এমন দিন নাই, যে দিন একটী না একটী প্রজার হাহাকার রামেশ্বরের কর্ণে না পৌঁছে। তাহার উপর তাহার বিষয়-আশয় ফাঁকি দিয়া নিজের করিয়া লইবার জল্পনা-কল্পনাও ভগ্নীপতি ও শ্যালকের মধ্যে প্রত্যহ চিন্তিত হইতেছে। অমন লাভের জমীদারী, অমন নিরীহ প্রজা, কোথায় তাহার ঋণ, আর কোথায়ই বা তাহার অনাদায়, তথাপি প্রজার নামে দোষ দিয়া, তাহাদের উৎপীড়ন করিয়া, ছোট ভাইকে ফাঁকি দিবার জন্য এতটা চক্রান্ত চলিতেছে।

রামেশ্বর ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাঁহার কোনও প্রকার অবিশ্বাস নাই। বড় দাদা গুরু, তাহার প্রতি অবিশ্বাস রামেশ্বর ভুলেও মনে স্থান দিতে পারেন না। এই জন্য জমীদারী বিক্রয় হইয়া গেল, রামেশ্বর বুঝিলেন—নিশ্চয়ই দেনা হইয়া থাকিবে, নতুবা জমীদারী কে ইচ্ছা করিয়া বিক্রয় করে। সরল হৃদয় রামেশ্বর ত জানেন না যে তাহা বিক্রয় হইয়া প্রকারান্তরে সর্ব্বেশ্বর বিনামী করিয়া ফেলিলেন। সরল চিত্তে এ পাপচিন্তা একদিনের জন্যও উদয় হইল না।

রামেশ্বর এখন অতিথিশালার সমস্ত ভার নিজেই বহন করেন; তজ্জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। পিতার যজমানবর্গ যখন শুনিলেন—তাহাদের গুরুর কীর্ত্তি সর্ব্বেশ্বর নষ্ট করিতেছে এবং তজ্জন্য রামেশ্বর বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তখন তাহারা সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামেশ্বরকে উহা বজায় রাখিতে উৎসাহিত করিলেন। রামেশ্বর এখন তাহাদের পরামর্শ মত কাজ করিয়া অতিথিশালাটীকে বজায় রাখিয়াছেন, দাদার নিকট এ বিষয়ের এক কপর্দ্দক সাহায্য গ্রহণ করেন না। সমস্ত দিন শিষ্য-যজমানের কাজ করিয়া, নিজের পূজা আহ্নিক, দেব সেবাতেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, তার পর অতিথিশালার কাজে অবশিষ্ট সময় ক্ষেপণ করেন। আর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করে না, কেবল পিসিমা দাক্ষায়ণী তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়, তিনি একমাত্র রামেশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া এতদিন দাদার কীর্ত্তি কিছুতেই নষ্ট হইতে দেন নাই। এ জন্য বাটীর সকলেই তাঁহার প্রতি সময়ে সময়ে অতিশয় কোপ প্রকাশ করেন কিন্তু দাক্ষায়ণী তাহাদের সে সকল কথায় কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন না।

অতিথিশালা কোন দিন অতিথি শূন্য থাকে না, দুইচারি জন অতিথি তথায় প্রায়ই অবস্থান করে, দেবানন্দের ভাগ্য এরূপ সুপ্রসন্ন। অনেক সিদ্ধ সাধকও দেবানন্দের অতিথিশালার নাম শুনিয়া ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের পদার্পণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবন যে অতিশয় পবিত্র, ইহার রেণু যে স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও মূল্যবান তাহা দেবানন্দ জানিতেন আর জানেন তাঁহার প্রিয় পুত্র ধার্ম্মিক—রামেশ্বর! তাই তিনি বুক দিয়া এই সকল মহাত্মাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। এ সকল মহাত্মার অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করা, তাহাদের সঙ্গলাভে চরিতার্থ হওয়া কি কম সৌভাগ্যের বিষয়! সর্ব্বেশ্বর তাহা বুঝিত না, তাই সে ইহার ত্রিসীমানায় আসিত না—ঐ সকল সর্ব্বত্যাগী মহাত্মাগণের মলিন বেশভূষা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিত।

দাক্ষায়ণীকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হয়; এরূপ অত্যাধিক পরিশ্রম একজন স্ত্রীলোক কখনও করিতে পারে না। যদিও চঞ্চলা সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করে কিন্তু তাহার সাহায্য বাহিরের, শূদ্রের মেয়ের দ্বারা অন্য কাজ হয় না, কাজেই দাক্ষায়ণীকে একহাতে সাতঘোল ধরিতে হইত; রান্না করা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবেশন পর্য্যন্ত। বেলা বারটা অবধি এই কাজ করিয়া দেবতা ও অতিথি সেবার কাজে ব্যাপৃত হওয়া কতদূর কষ্টকর, তাহা যে করে সেই

জানে, দাক্ষায়ণী তখনকার ধার্ম্মিকা ব্রাহ্মণের বিধবা তাই, এখনকার হইলে যে কি হইত—তাহা বলা যায় না।

রামেশ্বর পিসীমাতার এরূপ অত্যাধিক পরিশ্রম দেখিয়া এক একদিন বড়ই কাতর হইতেন, পাছে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, পাছে তিনি কোনরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু শুধু দুঃখ প্রকাশ করিলে কি হইবে, সংসারে কাজকর্ম্ম করিবার লোক ত আর কেহ নাই? ব্রাহ্মণের ঘরের ব্রহ্মচারিণী, কর্ম্মকুশলা, দাক্ষায়ণী বাল্যকাল হইতে এ সংসারে না থাকিলে, ভট্টাচার্য্যের এ সংসার এতদিন ছারখারে যাইত। রামেশ্বর পিসীমাতাকে পরিশ্রম একটু কম করিতে বলিলে তিনি বলিতেন—পরিশ্রম করিয়া সকলকে খাওয়ানইত আমাদের কর্ম্ম, ইহাতে আমার তত কষ্ট হয় না; তবে তুমি একটা বিবাহ কর না, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়, নতুবা এইরূপ করিয়াই দিন কাটাইতে হইবে—আমার ভাগ্য বুঝি আর ফিরিবে না, দাক্ষায়ণী বড় মনোকষ্টে সময়ে সময়ে রামেশ্বরকে এইরূপ কথা বলিতেন। স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া রামেশ্বর বিবাহ করিতে নারাজ। এই জন্ম দাক্ষায়ণী বলিতেন—বাবা! তুমি প্রমোদাকে দেখিয়া হতাশ হইয়াছ কিন্তু ঐরূপ স্ত্রীলোক কি সকলেই, তাহা হইলে কি হিন্দুর সংসার কখনও চলিতে পারিত। দাক্ষায়ণী কখন নিজের অহঙ্কার মুখে প্রকাশ করিতেন না। বিধবা অবস্থায় খাটিয়াই তাহার সুখ, তাই অহোরাত্র কেবল খাটিয়া শরীরের শান্তি অনুভব করিতেন। হিন্দুগৃহের গৃহকর্ত্রী মা ব্রহ্মচারিণী, তোমার পদে কোটী নমস্কার, এ পবিত্র হস্তের শীতল স্পর্শ না থাকিলে, তোমাদের পরম রমণীয় সুশৃঙ্খলা না থাকিলে কি হিন্দুর সংসার এত পবিত্র, এত সুখের আস্পদ হইত।

পিসীমার কথায়, প্রতিদিন তাঁহার উত্তেজনায় রামেশ্বরের চিত্ত সময়ে সময়ে বিবাহ করিবার জন্ম উৎসুক হইত, আবার কোন দিন মুখরা প্রমোদার দাদার প্রতি ভর্ৎসনা শুনিলে, তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলে, বিবাহে এমন বিরক্তি আসিত যে প্রাণান্তে আর তাহা করিতে ইচ্ছা যাইত না।

অতিথিশালা এখন বেশ চলিতেছে, দাদার সাহায্য না পাইলেও আর কোন প্রকার অনাটন হইতেছে না। তাঁহার পিতার এক জন শিষ্য-পুত্র সংস্কৃত শিক্ষার মানসে তাঁহার নিকট শিক্ষিত হইতে আসিয়াছেন! রামেশ্বর তাহাকে ছাত্ররূপে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি প্রভৃতি শিক্ষা দেন; দেবতা ও অতিথি সৎকারে পিসীর সাহায্য জন্ম গ্রামের একটী প্রবীণা ব্রাহ্মণী স্বইচ্ছা আসিয়া

যোগদান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের আত্মীয় স্বগোত্রীয় কাজেই এখন এ সকল কাজ বেশ ভাল চলিতেছে। কিন্তু দাদার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে, সকলেই সর্বেশ্বরের অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া তাহাকে মনে মনে কত তিরস্কার করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেবানন্দের অপবাদ যে রটিতেছে না তাহাও নহে। পিতাপুত্র যে এক, একজনকে টানিয়া ধরিলে প্রকারন্তরে আর একজনের উপরও যে টান পড়ে, কান টানিলে মাথা যে আপনি নমিত হইয়া পড়ে!

দেখিয়া শুনিয়া রামেশ্বরের আর দেশে থাকিতে প্রাণ চায় না। কোন প্রকারে দেশ ত্যাগী হইয়া বংশের এ কলঙ্ক শ্রবণ হইতে রক্ষা পাওয়াই শ্রেয়। বড় ভাইয়ের দুর্নাম, পূজনীয় পিতার বৃথা নিন্দা, সৎপুত্র কে কবে কাণে শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিয়াছে! অকারণ হইলে তিনি তাহাদের জিহ্বা টানিয়া বাহির করিতেন কিন্তু দাদা যে ইহার মুল, তাহাদের দোষ কি? মানুষ আর কত সহ্য করিবে?

দিন দিন বড়ই অসহ্য হইলে রামেশ্বর একদিন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিলেন! অন্য সময় হইলে যাইতে পারিতেন না, কারণ দেবসেবা ও অতিথি সেবা তাহার গলায় রহিয়াছে কিন্তু তিনি না থাকিলেও এখন উহা অচল হইবে না—সমভাবেই চলিয়া যাইবে দেখিয়া তিনি কিছু দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। ইহা সংসার বৈরাগ্য নহে, প্রতিদিন বংশের এ দুর্নামশুনা তাহার পক্ষে অসহ্য, তাই স্থান ত্যাগ করিয়া কিছু কম পড়িলে আবার আসিবেন—ইহাই মনের বাসনা।

সম্পাদক।

শান্তি।

নির্ম্মল অন্তরে শান্তি নিবসয়ে সদা;
মনে ময়লা হলে তার সুখ আছে কোথা?
ঈর্ষা দ্বেশ পরিপূর্ণ হয় যাঁর মন;
ক্রোরপতি হলেও শান্তি না মিলে কখন।

মিস্ চঞ্চল্ গাঙ্গুলী।

IMPERIAL LIBRARY

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

(কলিকাতা ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নে পঠিত।)

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আসিয়া কি কি অনিষ্ট করিয়াছে ও আমরা কি কি লাভ করিয়াছি, ইহা দেখানই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য সভ্যতা বলিতে বুঝিব—ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সভ্যতা ছিল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিতে বুঝিব—ইংরাজ রাজত্বে আমাদের যে সভ্যতা দাঁড়াইয়াছে তাহাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া আমাদের মনকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেহ যখন সবল ও সক্রিয় অবস্থায় থাকে, সে সময় কোন রোগ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু যখন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেই সময়েই রোগ আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়। আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়েই সতেজ ও সক্রিয়ভাবে থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

ইংরেজ যখন তাহার কল-কারখানা, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি লইয়া আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু ইহাই আমাদের গৌরব নহে, যখন আমরা উপলব্ধি করিব যে, ঐ ঐশ্বর্য্য আমরা বিস্তার করিতেছি তখন আমাদের মোহ ছুটিয়া যাইবে। এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে, এইখানেই পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য সভ্যতাকে পরাস্ত করিয়াছে। আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কুঞ্চিত করিয়া রাখাই পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই এখন আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। নিদ্রার পর প্রথম সূর্য্যালোক যেমন চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া পুনরায় দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে, সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের চক্ষে যে ধাঁধাঁ লাগাইয়াছে, তাহার জন্যই এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে

নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। পাশ্চাত্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎ ও প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আসিয়া কিরূপ একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, অগ্রে কলিকাতায় একটি কি দুইটি বিদ্যালয় ছিল, এখন দেখিতে পাওয়া যায় চারিদিকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সামাজিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে দেখিলে আমরা দেখি এখন স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু পরিবর্ত্তন হইলেই যে উন্নতি হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি ও কোন্ কোন্ বিষয় অবনতি হইতেছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আজকালকার লোকের শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয় দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, আধুনিক লোক পূর্ব্বকালের লোক হইতে অনেক বিষয়ে হীন। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশের সহিত আমাদের পরিশ্রম বাড়িয়াছে। আজকাল যে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম আছে, তাহা এ দেশের পক্ষে কিছুতেই উপযোগী বলা যায় না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন বাবু ছিলেন কিন্তু এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সকলেই বাবু হইয়া পড়িয়াছেন; এখন কি ভদ্র, কি ইতর, উপার্জ্জনশীল হইলেই গাড়ী পাল্‌কী ব্যতীত একপাও চলিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আসিয়া যেমন একপক্ষে অনেক উপকার করিতেছে, তেমনি অন্যপক্ষে আমাদের অনেক জিনিষ নষ্ট করিয়াও দিতেছে। পাশ্চাত্য দ্রব্য গ্রহণে বাধা নাই কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের দেশীয় জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলি কেন? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্য হইতে আমাদিগকে এমন একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইবে—যাহাতে আমরা প্রকৃত সভ্যপদবাচ্য হইতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই আগেকার লোকেরা এখনকার লোকদের ন্যায় বিলাসপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহাদের অভাব অল্প ছিল, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা

আমোদে থাকিতেন, কিন্তু এখনকার লোকদিগের মুখের দিকে চাহিলেই বেশ বুঝা যায়, কি যেন একটা দুর্ভাবনার চিহ্ন লেপিত রহিয়াছে। এখন দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য হইয়াছে, সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লোকে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। লোকের ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের অনেক অপকার করিতেছে। এখন যেরূপ শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে ইহা যে সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকদের রাজকার্য্যোপযোগী জ্ঞানলাভে সমর্থ করিতে পারাই যেন আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর প্রধান অভিপ্রায়। এ শিক্ষায় সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত হিতসাধন হয় না। আজ আমাদের গৌরবান্বিত সেই আর্য্যসমাজই বা কোথায় আর এখনকার চায়ের পেয়ালাধারী চশমাপরা সভ্যবাবুদের সমাজই বা কোথায়? কোন লেখক লিখিয়াছেন—"সেকালের লোকেরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রথম কাকের কা কা শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিতেন কিন্তু এখনকার লোকেরা, প্রাতে খানসামা আসিয়া চা চা করিয়া না ডাকিলে বাবুদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পাশ্চাত্যভাব আমাদের হিন্দুসমাজের কি অধঃপতনই না ঘটাইয়াছে!

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যেমন আমরা অনেক জিনিস হারাইয়াছি, তেমনি আবার অন্যপক্ষে আমরা অনেক লাভও করিয়াছি; শিল্প, বিজ্ঞান, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আমরা উন্নতি লাভও করিয়াছি। এদিকে গণিত-শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজ-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রথম উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ; মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমাদের শাস্ত্রসমূহ অপ্রচারিত অবস্থায় ছিল। তৎপরে ইংরাজ প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য জাতি আমাদের সেই সমস্ত অমূল্য শাস্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করিয়া ইংরাজি ও বহু পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই প্রকারে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে আমরা অনেক নূতন ভাব পাইয়াছি। এ ভাব ও শিক্ষা ইংলণ্ডই দিয়াছে। মুসলমানগণ ভারতকে এ শিক্ষা দিতে পারে নাই। ঐহিক সুখ, স্বাধীনতা, স্বদেশ ও স্বজাতির উপর আমাদের অনুরাগ বাড়িয়াছে। এ অনুরাগ আমরা ইংরাজের কাছেই শিক্ষা করিতেছি। ভারতবাসিগণ চিরদিন ভাবিয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীতে পার্থিব সুখের জন্য আসেন নাই পরন্তু ঐশ্বরিক চিন্তার জন্যই আসিয়াছেন; সংসার, সমাজ, স্বদেশ

তাঁহাদিগের চিন্তায় কখন প্রবিষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য ভাব আমাদের চক্ষে ফুটাইয়া দিয়াছে। আমাদিগের দৃষ্টি এক নূতন বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। এখন ঐহিক সুখ ও উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন আমরা বুঝিয়াছি সংসারকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে সংসারের কার্য্য করাই প্রধান ধর্ম্ম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার খারাপ দিকটাই বেশী লইতেছি, ভালর দিকটা চাহিয়া দেখিতেছি না। আমরা এখন বিলাতের আচার ব্যবহারই অনুকরণ করিয়া আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারকে ঘৃণা করিতেছি; আমরা এখন নমস্কার করিতে গিয়া Shake-hand করিয়া ফেলি। কেমন আছেন বলিতে গিয়া Good-morning বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বসি। আমরা এই সমস্ত জিনিস লইয়াই এখন মারামারি করিতেছি কিন্তু পাশ্চাত্যের স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর দিকে চাহিয়াও দেখিতেছি না। আমরা ধান্ ভান্‌তে গিয়া শিবের গীত গাহিয়া ফেলিতেছি।

রাজা রামমোহন হইতে বাঙ্গালার সব আটঘাট খুলিয়া গিয়া একটা বিলাতি ভাবের বন্যা আমাদের দেশটাকে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। অশনে, বসনে, ভাবে, চিন্তায় এখন আর আমরা বাঙ্গালী নাই। সেই জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ খুঁজিতে হইলে, আমাদিগকে রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে দাশরথী রায় হইতে চণ্ডিদাসের সময় পর্য্যন্ত খুঁজিতে হইবে। আমরা এতটা বিলাতি ভাবে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি যে আমরা মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বসিয়াছি। গ্রন্থকার রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "একাল আর সেকাল" নামক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে,—সে কালের লোকেরা বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজি মিশাইয়া কথা কহিলে কৌতুক করা বোধ করিতেন কিন্তু এখন আমরা গম্ভীর ভাবে ঐ সব কথা ব্যবহার করিতেছি। "আমার Father এর রাত্রে বড়ই Fever হইয়াছিল সেই জন্য Doctor কে একটা Call দিয়াছি। এ বিড়ম্বনা কেন? হয় সমস্তটা ইংরাজিতে বলা হউক, নয় সবই বাঙ্গালায় বলুন। কিন্তু আমরা যতই বিলাতি ভাবাপন্ন হই না কেন, আমরা এখনও বাঙ্গালী আছি। আমাদের প্রাণের মধ্যে যে প্রাণ সেটা এখনও খাঁটী বাঙ্গালী।

অনেকে বলেন যে আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। অনেক নব্য সাহিত্যিক, ইংরাজি সাহিত্য হইতে নকল করিতে গিয়া কেবল হাস্যাস্পদই হইয়াছেন। তাঁহারা নকল করিয়াছেন বটে কিন্তু কিছুই

আপনার করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন নাই। যাঁহারা আপনার করিয়া গড়িয়া লইতে পারিয়াছেন তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট ঋণী নহেন।

রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে তাই বলিয়া যে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট ঋণী একথা বলিতে হইলে, আমরা বলিব যে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে সাহিত্য হইতে যাহা কিছু লইয়াছেন তাহা আপনার প্রাণের সঙ্গে সমীকৃত করিয়া, নিজস্ব করিয়া বাঙ্গালার প্রাণের জিনিস করিয়া হাজির করিয়াছেন। এক্ষেত্রে রবীবাবু বিলাতি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও বিলাতের কাছে ঋণী নহেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগমনে যে আমাদের সাহিত্য বিশেষ ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য যে আজ এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা কেবল মাত্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই। দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্য কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা দেখিতে পাই কবি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবল মাত্র সংস্কৃতের প্রভাব ছাড়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হইত না। পরে বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের গ্রন্থে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্রের অনেক ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা অনেক ইংরাজি কবিতার ভাবানুবাদ। ইহা ছাড়া তাঁহার "বৃত্রসংহার" নামক কাব্যে Milton এর Paradise Lost এর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। তবে হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে যাহা কিছু লইয়াছেন তাহা দেশীয় ভাবের সহিত সংযোগ করিয়া তুলিয়াছেন; পাশ্চাত্য সাহিত্য যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিদাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা এতকাল চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর বসিয়া নাই, এখন আমরা আমাদের জিনিসকে আদর করিতে শিখিয়াছি। আমাদের জিনিসের যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আমাদের নিশ্চেষ্টভাব দূর করিয়া দিয়াছে, আমাদের মোহাবরণ উন্মোচন করিয়া, চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবের ঋণ।

সংসারে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য নাই—যিনি ঋণগ্রস্ত নহেন এবং মনুষ্যজন্মের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দায়মুক্ত হইতে পারেন। তবে সংসারে আসিয়া যতদূর সম্ভব আপনাকে ঋণমুক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করা উচিত এবং যথাসাধ্য ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পরজন্মে অনেক বিষয় ঐশ্বরিক দয়া লাভ করিয়া সুখী হইতে পারা যায়।

মানবের ঋণ অনেক, তন্মধ্যে শাস্ত্রে কয়েকটি বিশেষ ঋণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাং মাতৃণাং তথা।
ভার্য্যা পুত্র গুরুণাঞ্চ অতিথিনাং তথৈব চ॥
বৃক্ষাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব নৃপাণাঞ্চ ভুব স্তথা।
ঋণঞ্চ দ্বাদশবিধং কথ্যতে বহুদর্শিনা॥ (প্র, উদ্ভট)

দেব, ঋষি, পিতা, মাতা, পুত্র, গুরু, অতিথি, বৃক্ষ, গরু, নৃপ, পৃথিবী ও ভার্য্যা; মানবগণ এই বার জনের নিকট ঋণী হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা জলদান ও শস্যোৎপাদন এবং শরীরপোষণ দ্বারা দেবগণের নিকট; যাগ-যজ্ঞাদি হোম ও উর্দ্ধঘৃত বর্ষণ দ্বারা ঋষিগণের; শরীরপালন ও বিদ্যা অধ্যাপনের দ্বারা পিতার; বহু যত্নে ও বিবিধ কষ্টে প্রতিপালন দ্বারা মাতার; সর্ব্বদা সদুপদেশ ও হিতসাধনের দ্বারা গুরুর নিকট সকলে ঋণী হইয়া থাকে।

বৃক্ষসকল নিজের স্বার্থশূন্ত হইয়া পরের উপকারার্থে মানবদিগকে ছায়া ও ফলপ্রদান করিয়া জীবনধারণ করে এবং মরিলেও নিজের দেহ দগ্ধ করিয়া মানবগণের পাককার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, এইজন্ত মানবগণ বৃক্ষের নিকট ঋণী হয়। রোপণ, জলসেচন ও বেড়া দিয়া উত্তমরূপে পালন করিলে বৃক্ষের নিকট অঋণী হওয়া যায়।

গরুসকল বন্ধ ঘাস পাতা ভোজন করিয়া আপনার সন্তানকে দুগ্ধ না দিয়া মানবগণকে দুগ্ধ দান করতঃ জীবন রক্ষা করে, উহারাও স্বার্থশূন্ত হইয়া পরের উপকার করে বলিয়া গরুর নিকট মানবগণ ঋণী হইয়া থাকে। উহাদিগকে যত্নের সহিত খাদ্যাদি দান ও প্রতিপালন করিলে মানবগণ গরুর নিকট অঋণী হইয়া থাকে।

নৃপতিগণ চোর, ডাকাত ও বিবিধ উৎপাত হইতে রক্ষা করেন বলিয়া রাজার নিকট মানবগণ ঋণী হয়; কর দান করিলেই অঋণী হইয়া থাকে।

পৃথিবী মানবগণের বিবিধ দৌরাত্ম্য সহ্য করে বলিয়া পৃথিবীর নিকট সকলে ঋণী হয়। সত্য, পুণ্য, ধর্ম্ম ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই পৃথিবীর নিকট অঋণী হইয়া থাকে।

যজ্ঞ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবগণের, তপস্যা ও গুরুবৃত্তি দ্বারা ঋষিগণের, গয়াতে পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃগণের, জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা মাতৃগণের *, পুত্র উৎপাদন দ্বারা ভার্য্যার, বিদ্যা অধ্যাপনা দ্বারা পুত্রগণের, পূজা ও পরিতুষ্ট দ্বারা গুরুগণের এবং ভক্তিসহকারে সেবা দ্বারা অতিথিগণের নিকট সকলে অঋণী হইয়া থাকে।

যিনি পর্ব্বদিনে পবিত্র হইয়া অব্যাহিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তিনি অঋণী হইয়া সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত দ্বাদশটী ঋণের মধ্যে চারিটি ঋণ প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"ঋণং চতুষ্টয়ং পুংষাং পিত্রোর্ভার্য্যা সুতস্য চ।"

পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রের—পুরুষগণের এই চারি প্রকার ঋণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই চারিটি ঋণ সকলেরই একান্তভাবে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইবার প্রথা পূর্ব্বকালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু আজকাল এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রথার হ্রাস হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের অবনতি, তীর্থ-মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা, এবং পল্লীগ্রামে জলাশয়ের অভাব, আজকাল বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মানবগণ শাস্ত্র ব্যতীত আরও অনেক রকমে ঋণগ্রস্ত হয়। সেই সমস্ত ঋণ সজ্ঞানে পরিশোধ করা একান্ত উচিত। কেন না, ঋণাবস্থায় মানবের মৃত্যু হইলে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন তাহাকে বারম্বার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব মানবগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে অঋণী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীভবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

* এই কার্য্যটী সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক মানবের কষ্ট-স্বষ্টে সম্পন্ন করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

অধ্যাত্ম-গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়—বিষাদযোগঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ। ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণি পুষ্পকৌ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডীচ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ১৮
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

অন্বয়ঃ।—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং শঙ্খং দধ্মৌ, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং শঙ্খং দধ্মৌ, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ (ভীমঃ) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ, কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং শঙ্খং দধ্মৌ, নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ শঙ্খৌ দধ্মতুঃ। হে পৃথিবীপতে! পরমেষ্বাসঃ কাশ্যশ্চ (কাশিরাজঃ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

বঙ্গানুবাদ।—হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন, ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ বাজাইলেন, নকুল সুঘোষ শঙ্খ বাজাইলেন, সহদেব মনিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন! ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রেরা শিখণ্ডী, বিরাট, দুর্জ্জয় সাত্যকি, সুভদ্রাতনয় মহাযোদ্ধা অভিমন্যু, হে রাজন্! সেই বীরগণ সঘনে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন।

টিকা।—হৃষীকেশঃ, শ্রীকৃষ্ণ, কূটস্থ-চৈতন্য আজ্ঞাচক্রে; স্থান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অন্তর্লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ শঙ্খ-ধ্বনির শব্দ মিলিত হইলে যে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হয়, এক পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ সেইরূপ। ধনঞ্জয়, অর্জ্জুন—তেজতত্ত্ব; স্থান মণিপুরচক্রে, নাভিস্থল হইতে সরলরেখা টানিলে যেখানে ঐ শলাকা মেরুদণ্ডকে বিদ্ধ করে, মণিপুরচক্র সেই স্থানে অবস্থিত। অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত শঙ্খ। ভীম, বায়ুতত্ত্ব, অনাহত

চক্রে বা হৃদপদ্ম ; স্থান স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে ঐ শলাকা যে স্থানে মেরুদণ্ডকে বিদ্ধ করে সেই স্থানে অনাহত চক্র বা হৃদপদ্ম। ভীমের শঙ্খকে পৌণ্ড্র বলে। মহাশঙ্খ নর-কপালের অস্থিদ্বারা জপমালা রচিত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির—আকাশতত্ত্ব ; বিশুদ্ধ চক্রের স্থান কণ্ঠ হইতে ঐ শলাকা চালিত করিলে যে স্থানে উহা মেরুদণ্ডকে বিদ্ধ করে, সেই স্থানে বিশুদ্ধ চক্র অবস্থিত। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম অনন্ত বিজয়। নকুল—রসতত্ত্ব ; স্বাধিষ্ঠান চক্রের স্থান লিঙ্গমূল। ইহার শঙ্খের নাম সুঘোষ। সহদেব—ক্ষিতিতত্ত্ব ; মূলাধার চক্রের স্থান গুহে। ইহার শঙ্খের নাম মনিপুষ্পক।

উপরোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের নাম পঞ্চতত্ত্বের নির্দ্দেশ ; তাহাদের প্রত্যেকের স্থান ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—মূলাধারে—সহদেব (ক্ষিতিতত্ত্ব), স্বাধিষ্ঠানে—নকুল (রসতত্ত্ব), মণিপুরে—অর্জ্জুন (তেজতত্ত্ব), অনাহত—ভীম (বায়ুতত্ত্ব), বিশুদ্ধে—যুধিষ্ঠির (আকাশতত্ত্ব); আজ্ঞাচক্রে—শ্রীকৃষ্ণ (কূটস্থ-চৈতন্য), কাশিরাজ—প্রজ্ঞা ; অভিমন্যু—সংযম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি), সুভদ্রা—মঙ্গলশক্তি, দ্রৌপদী—কুলকুণ্ডলিনী ; দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা। ইহারা পঞ্চ-মহাভূতের বিকার। বিরাট—সমাধি। দ্রুপদ—তীব্রমনবেগ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল দিয়া, একটি নাড়ী ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে ; ঐ নাড়ীর নাম সুষুম্না নাড়ী। উহা উপরি উক্ত ছয়টি পথকে বিদ্ধ করিয়া গিয়াছে। ক্রিয়া কালে চক্রে চক্রে বায়ু উঠিতে ও নামিতে থাকে ; তাহাতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয়। আজ্ঞা চক্রে দৃষ্টি স্থির রাখিলে নানা বর্ণ দর্শন হয় এবং মনটিও স্থির হওয়ায় নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়। প্রথমে মূলাধার হইতে মত্তভৃঙ্গের গুন গুন শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, ঐ শব্দকে সহদেবের মণিপুষ্পক নামক শঙ্খের ধ্বনি কহে। তার পরে স্বাধিষ্ঠান চক্র হইতে বেণুর শব্দ শোনা যায়, ঐ শব্দকে নকুলের সুঘোষ শঙ্খের ধ্বনি কহে। তারপর মনিপুর চক্র হইতে বীনার ধ্বনি শোনা যায়, উহা অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি। তারপর অনাহত চক্র হইতে বৃহৎ ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, উহা ভীমের পৌণ্ড্র নামক শঙ্খের ধ্বনি। পরে বিশুদ্ধ চক্র হইতে মেঘগর্জ্জনের শব্দ শোনা যায়, উহাকে যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয় নামক শঙ্খের ধ্বনি কহে। শেষে পঞ্চশঙ্খের পঞ্চধ্বনি মিলিত হইয়া এক প্রকার শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি বলে। ঐ ধ্বনি আজ্ঞাচক্র

হইতে উঠে। সাধনমার্গে সাধক যত অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার মন একাগ্র হইতে থাকে আর তত ঐ সকল শব্দ তিনি স্পষ্টরূপে শুনিতে পান এবং ঐ নিনাদ দীর্ঘকাল স্থিতি করে।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অন্বয়ঃ।—সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভশ্চ পৃথিবীং চ ব্যনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯॥

হে মহীপতে! অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে সতি তদা কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ব্যবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ। ২০॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই শব্দ পৃথিবী ও আকাশকে ধ্বনিত করিয়া সকল কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

বিপক্ষদল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত এবং শস্ত্রসম্পাত নিমিত্ত উদ্যত দেখিয়া অর্জ্জুন আপন গাণ্ডীব ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক তখন হৃষীকেশকে কহিলেন। ২০॥

টিকা।—ঘোষঃ, শব্দনিনাদ। অনুনাদয়ন্, প্রতিধ্বনিত করিয়া। ব্যদারয়ৎ, বিদীর্ণ করিল। কপিধ্বজঃ, জিহ্বাকে তালুতে তুলিলে কপিধ্বজ অবস্থা হয় (গুরুমুখে); অর্জ্জুনের রথের ধ্বজাতে কপিমূর্ত্তি ছিল। ধনুরুদ্যম্য, মেরুদণ্ডের নাম ধনু। ক্রিয়াকালে বক্ষঃস্থল প্রসারণ করিয়া বসিলেই মেরুদণ্ড ধনুকের আকার ধারণ করে (গুরুমুখে)।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—ক্রিয়া কালে ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে সাধক অবশ হইয়া পড়েন। মূলাধার ও বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান ঐ শব্দে পূর্ণ হয়। প্রবৃত্তি বিষয়ে ছুটিতে থাকে; নিবৃত্তি সাধককে ব্রহ্মমুখী করে। বাসনা, কামনা প্রবল থাকে বলিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না; প্রাণ ক্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। নাদের সঙ্গে ইহা হয়।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ সমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যত্রতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে র্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে অচ্যুত! যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ নিরীক্ষে অস্মিন্ রণ সমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্; যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতা তান্ যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে (তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়।

বঙ্গানুবাদ।—হে অচ্যুত! রণ কামনায় এখানে যত বীর উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বীরের সহিত আমি যুদ্ধ করিব একবার আমি সেই শূরগণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিব। যাঁহারা দুষ্টবুদ্ধি কৌরব-হিতার্থী রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদেরও আমি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিব। অতএব যাবৎ আমি ইঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করি তাবৎ তুমি দুইদলের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর।

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন উবাচ, এ স্থলে গীতা বা কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের সূচনা। অর্জ্জুন, মায়াবদ্ধ জীব অর্থাৎ সাধকই সেই মায়াবদ্ধ জীব। অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণ, কূটস্থ-চৈতন্য; জ্যোতিঃ স্থির থাকিয়া সাধকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেয় না। উভয় সেনাদল—প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ। সেনয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়—মধ্যস্থলে রথ রাখ, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মধ্যস্থলে মনকে রাখিতে হইবে। কৈর্ম্ময়াসহযোদ্ধব্যম্—ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত অথবা পাপবুদ্ধির সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে অর্থাৎ আমি প্রবৃত্তিমার্গে গমন করিব অথবা নিবৃত্তিমার্গে গমন করিব।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সাধক আপন মনে চিন্তা করেন কোন্ বৃত্তিগুলির সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবশেষে তিনি অবধারণ করেন কোন্ গুলি তাঁর শত্রু আর কোন্ গুলি তাঁর মিত্র। সাধনকালে সাধকের তিনটি অবস্থা আসে (১) আদ্যাবস্থা (২) মধ্যাবস্থা (৩) অন্ত্যাবস্থা। প্রথমাবস্থাতে গুরুপদেশ মত ক্রিয়া করিতে করিতে সাধক কূটস্থ জ্যোতিদর্শন করেন। দ্বিতীয় অবস্থাতে, সাধকের জ্যোতি দর্শন ও অলৌকিক শব্দ শ্রবণ ঘটে, তদ্বারা তিনি অনেক কূট প্রশ্নের উত্তর পান, মনের সংশয় ভঞ্জন হয়। তৃতীয় বা শেষ অবস্থাতে সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীর সাহায্যে উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া সাধক সমাধি প্রাপ্ত হন। কুলকুণ্ডলিনীকে কিরূপ জাগ্রত করিতে হয়, গুরুমুখে শ্রোতব্য।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ—হে ভারত! গুড়াকেশেন এবং উক্ত হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ! এতান্ কুরু পশ্য ইতি উবাচ।

বঙ্গানুবাদ।—সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত! জিতনিদ্র অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্য স্থলে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সম্মুখে উত্তম রথখানি স্থাপন করিয়া, হে পার্থ! সমাগত কৌরব দলকে দেখ, এই কথা বলিলেন।

টিকা।—সঞ্জয়—দিব্যদর্শন। ভারত—বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া যিনি আত্মচিন্তা করেন। গুড়াকেশ, জিতনিদ্র—অর্জ্জুন। উভয় সেনার মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির মধ্যস্থলে; সংসারচিন্তা ও আত্মচিন্তা এই দুইয়ের মধ্যে। রথোত্তমম্, স্থিতিস্থানে—কামপুরে, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞার মধ্যস্থলে। শেষোক্ত স্থানটির নাম রথোত্তম।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—ক্রিয়াকালে সাধক দেখেন তাঁহার অনুকূলে নিবৃত্তিগুলি আর প্রতিকূলে প্রবৃত্তিগুলি। একদিকে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, মুমুক্ষুত্ব; অপর দিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, সংশয়, ভয়, আলস্য, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি। একদল বলিতেছে—সংসারচিন্তা কর, বিষয় ভোগ কর, ইহাতে আনন্দ আছে। অপর দল কহিতেছে—সংসারচিন্তা ও বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তা কর, সংসার চিন্তায় ও বিষয় ভোগে সুখ নাই, কেবলই দুঃখ, আত্মচিন্তাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের লেশমাত্র নাই। এ অবস্থায় সাধকের মন সন্দেহ দোলায় দোলায়মান। পরিশেষে গুরুর কৃপাতে আত্মজ্যোতি দর্শন হইলে সাধক উত্তম স্থান অধিকার করিয়া সমাধি মগ্ন হয়েন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অথ পার্থ, তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি পিতৄন্, পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্ তথা সখীন্, শ্বশুরান্, সুহৃদশ্চ এব স্থিতান্ অপশ্যৎ।

বঙ্গানুবাদ।—অনন্তর অর্জ্জুন দেখিলেন সেই সেনাদলের মধ্যে পিতৃগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, বন্ধুগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ, সকলে দণ্ডায়মান আছেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সাধন সময়ে সাধকের মনে নানা প্রকারের বৃত্তি উঠে। এক একটি বৃত্তি হইলে নানাবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। সেই বৃত্তিগুলির সহিত সাধকের একটা না একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে, সকলেই যেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা আপনার লোক। সেই সেই বৃত্তিগুলিকে সেই জন্য পিতামাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পিতামহ, পৌত্র, আচার্য্য,মাতুল ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান বন্ধুনবস্থিতান্
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদম ব্রবীৎ। ২৭

অন্বয়ঃ।—সঃ কৌন্তেয়ঃ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদং অব্রবীৎ।

বঙ্গানুবাদ।—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেই সমস্ত বান্ধবগণকে রণস্থলে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ও বিষণ্নমনে এই কথা বলিলেন।

টিকা।—কৌন্তেয়—কুন্তীতনয় অর্জ্জুন। সর্ব্বান্ বন্ধূন্-ইন্দ্রিয়গুলি; আত্মীয়-স্বজন—আপনার লোক, কারণ তাহাদের নিকট হইতে সাধক জ্ঞান ও নানাবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাল্যকাল হইতে সেই বৃত্তি গুলির সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছেন এজন্য তাহাদের প্রতি একটা মায়া জন্মিয়াছে।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধককে ঐ ইন্দ্রিয় গুলির নাশ করিতে হইবে, ভোগ লালসা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাধক তাহা করিতে অক্ষম; সাধক দেখিতেছেন তাঁহার বাল্যসখা ইন্দ্রিয় গুলির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, ভোগলালসা ত্যাগ না হইলে যোগী হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইন্দ্রিয় গুলির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে এই কথা ভাবিয়া তিনি আকুল, বিষণ্ণ ও কাতর।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্‌,
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অর্জুন উবাচ—হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি।

বঙ্গানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে।

টীকা।—স্বজনান্—আত্মীয়গণ, ইন্দ্রিয়গণ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—পরশ্লোকে দেখ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯

অন্বয়ঃ।—মে শরীরে বেপথুশ্চ রোমহর্ষশ্চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীবধনু খসিয়া পড়িতেছে এবং আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে।

টীকা।—বেপথু—কম্প মে শরীরে, রোমহর্ষশ্চ জায়তে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। গাণ্ডীবঃ স্রংসতে—গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—এই অবস্থা লাভ করিলে সাধকের মন অতিশয় চঞ্চল হয়, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয়, মুখ পরিশুষ্ক হয়, কম্পন ও রোমাঞ্চ হয়, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে। সরল ভাবে "সমংকায় শিরোগ্রীবং" হইয়া আসনে বসিয়া থাকিলে মেরুদণ্ড ধনুকের আকার ধারণ করে, ক্রমে পৃষ্ঠদেশ টন্ টন্ করিতে থাকে, অধিকক্ষণ সরলভাবে বসিয়া থাকা যায় না, তখন মেরুদণ্ড আর ধনুকের মত বাঁকা থাকে না, শরীর এলাইয়া পড়াতে সম্মুখের দিক ঈষৎ 'কোঁজা' হয়। ইহার নাম গাণ্ডীব খসিয়া পড়া।

নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—অবস্থাতুং ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। হে কেশব! বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।

বঙ্গানুবাদ।—আর এরূপ অবস্থায় থাকিতে পারি না, আমার মন অস্থির হইতেছে। হে কেশব! আমি চারিদিকে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি।

টিকা।—বিপরীতানি নিমিত্তানি—অমঙ্গলের লক্ষণ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সাধকের ব্যাকুলতা আসে, মন অতিশয় চঞ্চল হয়, তিনি চারিদিকে অমঙ্গলের লক্ষণ দেখেন। পূর্ব্বে শান্তিলাভের আশা ছিল এখন সে আশা ভরসা নাই বরং দারুণ যন্ত্রণা ভোগের উপক্রম।

ক্রমশঃ

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ।

সাধককবি তুলসীদাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

উপযুক্ত শিষ্য পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়—নৃসিংহদেব ত্যাগী, ভক্ত, উন্নতমনা, সাধনমার্গে উন্মাদন প্রাপ্ত প্রিয় শিষ্য আত্মারামের বিরহে বড়ই কাতর হইলেন। কাহার কাছে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও কার্য্যগুণে মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত। যাহাকে লইয়া এতদিন তিনি সংসারবিরাগী হইয়া গৃহস্থের আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপে পুনরায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাহার বিহনে আসর সমস্ত শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

স্বামীশোকাতুরা জননীর মলিন বদন; মায়ামোহের অতীত, পরম জ্ঞানী, উদাসীন শ্রীগুরু নৃসিংহদেবের সংসারীর ন্যায় মায়ামুগ্ধতা—শিষ্য বিয়োগে তাঁহার সকল বিষয়ে মায়াহীনতা, কাতরতা, তুলসীদাসকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। বন্ধু দুঃখীর সহিত নানা প্রকার হাস্য-কৌতুকে তিনি পুজনীয় পিতৃদেবের শোক-জ্বালা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতেছিলেন, একে একে বন্ধুর অকৃত্রিম সখ্যতায় ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতেছিলেন। যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে দুঃখীর সহবাসে কাল কাটাইতেন ততক্ষণ শোকের দারুণ বহ্নি তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে পারিত না। কিন্তু যখনই গৃহে আসিয়া তাহাদের শোকের অবস্থা সন্দর্শন করিতেন তখনই যেন সেই দেবোপম পিতৃমূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে খেলাইয়া বেড়াইত, পিতার বিরহ শোক নবীভূত হইয়া অন্তর কন্দরে দারুণ বৃশ্চিক দংশনের যাতনা আসিয়া তাহার ধীর প্রকৃতিকে বিষম বিচঞ্চল করিয়া ফেলিত। তুলসীদাস বাটীতে অবস্থান করিতে পারিতেন না, গৃহত্যাগ করিয়া বন্ধুর সহবাসসুখ উপভোগ করিতে [illegible] যাইতেন।

দুঃখীর বাটীতে কেহ ছিল না ; অতি শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর এক দূর সম্পর্কীয়া মাতুলানী আসিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছিল ; দীন-দয়াল ও তদীয় পত্নীর মৃত্যুর পর দুঃখী ইহারই দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি তখন ভারতবর্ষে সংসার পরিচালনের জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না। দীনদয়ালের যে যৎসামান্য জমীজমা ছিল তাহার আয়ে মাতুলানী ভাগিনেয়ের ভরণ পোষণ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া-ছিলেন। তারপর দুঃখী বড় হইলে তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হইলে সে তুলসীদাসের সহিত যাজ্য ক্রিয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সহায়তা করিত। সুখে দুঃখে, দুঃখীর সংসার এক প্রকার হাসি খেলায় চলিয়া যাইত।

তুলসীদাস ও দুঃখী তেওয়ারীতে এক প্রাণ, এক আত্মা। প্রকৃত বন্ধুত্ব হইলে যেরূপ ভাবে দুইটি আত্মা একত্র বদ্ধমূল হয় ; উভয়ে সুখ, দুঃখ, আপদ, বিপদ অনুভব করে, এই দুইটি যুবকের মধ্যে ঠিক সেইরূপ প্রাণের প্রণয় ভাব উন্মীলিত হইয়া উভয়কে এই দারুণ দুঃখের মধ্যে আনন্দের আসন প্রদান করিয়াছিল। তুলসীদাস জননীর করুণ আর্ত্তনাদে গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিলেই দুঃখীর ভবনে পলায়ন করিত ; এমন কি, দুই এক দিন তথায় রাত্রিবাসও করিত। পতি-বিরহ-বিধুরা জননী, রাত্রে পুত্রকে কাছে না দেখিয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিত, কিছু-তেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত না। প্রাতঃকালে অঞ্চলের ধন তুলসী গৃহে আসিলে আবার তবে আহারাদি উদ্যোগ করিতেন। তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে, জননী গুরুগৃহে দৌড়িয়া যাইতেন এবং তুলসী কোথায় বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

নৃসিংহদেব তুলসীর ভাবগতিক দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন, এ সময় সে যদি বিগড়াইয়া যায়, যদি গৃহত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি হুলসীকে লইয়া মহা বিব্রতে পড়িবেন, তাহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। তাহাদের মায়ায় পুনরায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আত্মারাম যেরূপে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, হুলসী দেবীও বুঝি তাহাকে সেইরূপ বাঁধে। অতএব তুলসী যাহাতে আর গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র রজনী যাপন না করে—মায়ের অঞ্চলের নিধি তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া, তাহার অনু-গত পুত্র হইয়া যাহাতে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, সে বিষয়ে আর উদাস থাকিলে চলিবে না। দুঃখিনী হুলসী দেবী যে বজ্রসম শোক পাইয়াছে, তাহার উপর পুত্রের অদর্শন তাহার অসহ হইলে কি জানি অভাগিনী কি করিতে কি

করিয়া ফেলিবে। এই সময় তুলসী যাহাতে গৃহে স্থায়ী হয়, সংসারী হইয়া জননীর সেবা করে—তাহার উপায় করিতে হইবে। নৃসিংহদেব এরূপ উপায় চিন্তা করিয়া গোপনে তুলসীদাসের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলেন। শিষ্যানী হুলসীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে তিনি অতি সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পুত্র সংসারী হইবে—একটি সুন্দরী নববধূ আসিয়া তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণ আলোকিত করিবে, ইহাতে কোন জননী অনভিমত প্রকাশ করেন?

তুলসী দাসের বংশ খুব সম্ভ্রান্ত বংশ এবং সে সময়ের হিসাবে সম্পত্তিশালীও কম নহে। গুরুদেবের শিষ্য-যজমানও তাহার সমস্ত হইয়াছে, আর পিতারও আছেই, এ অবস্থায় তাহাদের সংসার খুব স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়; তুলসী দশ কর্ম্মেও বেশ সুপণ্ডিত এবং সুকর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাকে কন্যাদান করিতে, এমন সর্ব্বগুণযুক্ত পাত্রকে জামাতা করিতে কার না ইচ্ছা হইবে? নৃসিংহ দেব গোস্বামী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অনেক স্থানে তুলসী দাসের জন্য অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনোমত হইল না, শেষে তাঁহার এক অন্তঃরঙ্গ দুঃস্থ শিষ্য দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যার সন্ধান পাইলেন, দীনবন্ধু দরিদ্রতা প্রযুক্ত কন্যাদায়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যা রত্নাবলী অত্যন্ত বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না কিন্তু দীনবন্ধু কোথায় কি পাইবে, কন্যাদায়ে সামান্য অর্থও ত আবশ্যক! ব্রাহ্মণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, এমন সময় নৃসিংহ দেব তাঁহাকে ডাকিয়া তুলসীর সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তুলসী দাসের ন্যায় সৎপাত্রে যে তাহার কন্যাদান ঘটিবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এ জন্য পুলকিত চিত্তে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পাঠক মহাশয় গুরুদেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন—প্রভু! আমার ত কিছুই সংস্থান নাই, তুলসীদাসের জননীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিব কেন?

নৃসিংহদেব কন্যাদায়গ্রস্ত শিষ্যকে অভয় দিয়া বলিলেন—আগামী শুভলগ্নে বিবাহের আয়োজন কর, হুলসী দেবীকে সম্মত করা আমার ভার রহিল।

রত্নাবলীর রূপ কাঁচাসোনার মত, দরিদ্রের কন্যা বলিয়া তাহার গুণও যথেষ্ট ছিল।

নৃসিংহ দেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন—রাজযোটক মিলন হইয়াছে, উত্তর-কালে পতিপত্নী ধর্ম্ম-ধনে বিশেষ রূপে ধনী হইবে, তবে আর কালবিলম্ব কেন?

গুরুদেব হুলসী দেবীকে সমস্ত কথা বলিলেন—তিনি তাঁহার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

হুলসী দেবীও পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে একটি নববধূ আসিয়া তাঁহার ঘর আলো করিবে, সুখে দুঃখে তাঁহার সহায় হইবে, সেবা শুশ্রূষা করিবে, পাত্রী রূপসী হইলে তুলসীও তাঁহার গৃহবাসী হইবে—সে যে বড় সৌন্দর্য্য প্রিয়। কোন বস্তু সুন্দর দেখিলে সে যে একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, কোন সুন্দর মুখ দেখিলে সে যে সহজে তাহার প্রিয় হইয়া পড়ে, প্রিয় বন্ধু দুঃখীর সুন্দর মুখ দেখিয়াইত তুলসী তাহার সহিত এরূপ বন্ধুত্ব করিয়া মজিয়া গিয়াছে। গুরুদেব ত বলিয়াছেন—পাত্রীর রূপ কাঁচাসোনার মত, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না, অঙ্গ সৌষ্ঠব—নিখুঁত, তবে দরিদ্র কিছু দিতে পারিবে না। নাই বা দিতে পারিল, যাহার নাই তাহার কি কন্যার বিবাহ হইবে না? জননী গুরুদেবের কথায় তুলসী দাসকে বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তুলসীদাস জানিতেন—সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য আবশ্যক। এখন না হয় জননী আছেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনিও যখন ইহসংসার ত্যাগ করিবেন, তখন ত সাহায্যকারী একজন পাকা মাঝী এই সংসার তরণীর দাঁড় ধরিবার আবশ্যক হইবে। যে গৃহে গৃহিণীর শীতল হস্তের স্পর্শ নাই, সে গৃহ ত শ্রীহীন, শোভা সৌন্দর্য্য তাহার কোথায়!

যখন সাক্ষাৎ দেবীসমা জননী ও পরম পূজনীয় পালনকর্ত্তা গুরুদেব এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আর ভিন্ন মত করা উচিত নহে। দুঃখীরামও এ সময় আসিয়া যোগ দিল, সেও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বলিল—ভাই তুলসী! ইঁহাদের কথা অবহেলা করিও না। তুলসীদাস আর কোন কথা কহিলেন না।

একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যা রত্নাবলীর সহিত তুলসীদাসের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পুত্র বধূর অলোক সামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, পুত্রের ভাবী সংসার-অনাশক্তির মূলচ্ছেদ হইল ভাবিয়া হুলসী দেবী মনে মনে সুখী হইলেন। রূপের মোহে এ জগতে মুগ্ধ নয় কে? আজন্ম রূপ সৌন্দর্য্যের ভিখারী তুলসীদাস সুখী হইলেন, বয়স্থা রূপসী অর্দ্ধাঙ্গিণী লাভ করিয়া তুলসীদাস পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া পড়িলেন। সংসার ত্যাগের ভাবী আশঙ্কা মায়ের মন হইতে বিদূরিত হইল। হুলসী দেবী আবার সকল উৎকণ্ঠা দূরে ফেলিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ

সহ পূর্ব্বের ন্যায় সংসার করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহদেব তুলসীদেবীর ভাব দেখিয়া এবং তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ পাইয়া স্বামী শোক অনেকাংশে ভুলিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দিবেদীর বংশপরম্পরাগত গুরু, আত্মারাম সস্ত্রীক তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুলসী ও রত্নাবলীকে দীক্ষিত করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। এ মায়াময় সংসারে আর তিনি থাকিবেন না; যাহার মায়ায় মোহিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী সাজিয়াছিলেন; যাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি ত্যাগী হইয়াও ভোগ-বিলাসে এতদিন কাল কাটাইয়াছেন, এখন সেই প্রিয়-শিষ্য আত্মারাম ত আর নাই, আর কাহার জন্য এ বন্ধন। তবে স্বর্গগত আত্মারামের পুত্র ও পুত্রবধূকে দীক্ষিত করা তাহার কর্ত্তব্য, কারণ তাহা না হইলে তুলসীর চিত্তস্থির হইবে না, তুলসীদাসের ভবিষ্যৎ যে খুব সমুজ্জল নৃসিংহ দেব তাহা পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষের দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন।

রত্নাবলী বয়স্থা হইয়াই বিবাহিতা হইয়াছে, তার পর একবৎসর হইল তাহার কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে অতএব শাস্ত্রমতে এই সময়ে তাহাকেও তুলসীর সহিত দীক্ষিতা করিতে পারা যায়, এইরূপ স্থির করিয়া নৃসিংহ দেব তুলসীর নিকট তাহাদের দীক্ষাদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নৃসিংহদেব তাহাদের সকল বিষয়ের কর্ত্তা, তাঁহার কথার অন্যথা করা কাহার সাধ্য নহে। ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় তিনি যাহা বলিবেন—তাহার উপর আর কথা কি? তুলসী দেবী অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা শিরোধার্য্য করিলেন।

তুলসী দাস বহুদিন হইতেই অন্তরে মন্ত্র গ্রহণের আকাঙ্খা পরিপোষণ করিতেছিলেন কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হওয়ায় এতদিন তাহা গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই। এখন সস্ত্রীক দীক্ষিত হইবেন—গুরুদেব ও জননী আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া তুলসীদাস বড়ই পুলকিত হইলেন।

শুভদিন স্থির হইলে নৃসিংহদেব তুলসী ও রত্নাবলীর কর্ণে তাহাদের কুলমন্ত্র "রাম নাম" প্রদান করিলেন। তুলসীদাসের কর্ণে দিয়া যখন সেই স্বর্গীয় সুধার আধার কুলমন্ত্র মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল, ভক্তিবান তুলসীদাস তখন পুলকিত-চিত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধ সাধক নৃসিংহদেবের ন্যায় গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া, সেই দ্বিঅক্ষরযুক্ত সিদ্ধ রামমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তুলসী দাসের দেহ অনবরত ভক্তিরসে কণ্টকিত হইতে লাগিল, ভক্তির অত্যধিক আবেগে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলেন, গুরুদেব যুবকের ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার

বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইল, কালে এ বীজ হইতে যে ফলবান বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, এক সময়ে তাহার দ্বারা যে পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সতী রত্নাবলীও গুরুমন্ত্র লাভ করিয়া প্রাণপণে ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু পাঠক কন্যা জামাতার দীক্ষার দিন উপস্থিত ছিলেন, তিনিও উভয়ের ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। হুলসী দেবীর মনও সে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, পুত্র কন্যা সৎপথগামী হইলে পিতামাতার মন স্বভাবতই এইরূপ হইয়া থাকে।

নৃসিংহ দেবের এইবার সকল দিক মুক্ত হইল, তাহার সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল দেখিয়া তিনি কয়েক মাস পরে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চিরকাল একস্থানে বসিয়া কাটাইলে তাঁহার পারত্রিক কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তোমরা আর আমাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিও না;—আমি এই বার এ স্থান ত্যাগ করিব। রাজাপুরবাসী সকলেই তাঁহার শিষ্য না হইলেও এই যোগীবরকে সকলেই মান্য করিত, তাঁহার স্থান ত্যাগের কথা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। হুলসী, তুলসী ও রত্নাবলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দীনবন্ধু পাঠক তাঁহার গতি কি হইবে ভাবিয়া, গুরুদেবের পদে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—চিন্তা করিও না, ধর্ম্মপথে থাকিলে ভগবান রামচন্দ্র তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিবেন। যে মন্ত্র তোমাদের প্রদান করিয়াছি, নিষ্ঠাভরে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাহা জপ করিলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। "রাম নামে" জীবের সকল আপদ বিপদ বিদূরিত হয়।

নৃসিংহদেব এইরূপে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, আগত-অভ্যাগত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে রাজাপুর গ্রাম ত্যাগ করিলেন। পাখী মায়ার শিকল কাটিয়া উড়িয়া গেল, পুনরায় ধরা দিবার আশা দিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে মায়া শিকল কাটিয়া পাখী উড়িলে আর কি স্বইচ্ছায় ধরা দেয়। মায়ামুক্ত সাধু পুরুষ একবার পলাইতে পারিলে আবার কবে ফিরিবেন ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন ভাবিয়া সকলে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল।

সম্পাদক।

প্রার্থনা।

মাতা যে স্নেহ করে সন্তানে প্রাণপণে,
অর্পিয়া দেহ মন বুকের রক্ত সনে।
পিতা যে দয়া করে আপনি নিঃস্ব হয়ে,
নিষ্কাম ব্রত সে যে নহে গো যশ চেয়ে।
ভাই যে ভালবাসে বোন যে স্নেহ করে,
নিয়ত ভাই বোনে গোপনে প্রাণ ভরে।
পতির শুভ তরে সতী যে দেহ মন,
সতত কুলমনে করে গো বিসর্জ্জন।
ভুবন নাহি জানে সে প্রেম কি মহান,
কেবল চাহিয়া থাকে বিস্ময়ে হতজ্ঞান।
তা সবা হতে শ্রেষ্ঠ তোমার প্রেমদান,
জেনেছি বিশ্বরাজ, হে পিতঃ ভগবান্।
আশীষ দেহ মোরে নীরবে বাসিয়ে ভাল,
আপন প্রিয়জ্ঞানে তোমারে চিরকাল।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

পাড়ি।

করুণ হ'য়ে, রঙিণ হ'য়ে আজ
ফুটুক্ আমার ব্যর্থ সাধন যত,
অস্ত রবির রক্তলেখা মত, বুকের মাঝে
উঠুক্ ভেসে মর্ম্মবাণীর মত।
ছিন্নতারে সুরের ধ্বনি—অন্ধকারের গায়,
পাখীরগানে ডুবে যাক্ সাঁঝের নিরালয়।
নিবল দিনের শেষ আলোটি অস্তগিরি পারে
কোথায় আলো, কোথায় আমার আলো
দিবস শেষের বন্ধু আমার, নিবিড়-গহণ
ধারে।
জ্বালো এবার প্রদীপখানি জ্বালো।
ব্যর্থতরী ভিতরে যবে বিজন বনের ধারে,
পথ দেখায়ে কে নেবেগো সাঁঝের
অন্ধকারে?

কোথায় যাবো, কোন্ অজানা পানে
যাত্রা আমার কোথায় নাহি জানি,
তরি-বাওয়া শেষ হ'ল শেষ খেয়ারই
গানে।
কোথায় এবার বাঁধব তরীখানি?
অন্ধকার যে নৃত্যে মাতে বেতস বন ছায়
কি যেন আজ পথ ভুলালে নদীর কিনারায়
পথ-হারাদের বন্ধু আমার ওগো আমার
সাথী।
সর্ব্বহারার ব্যর্থ সাধন যত,
এমনি করে ছেয়ে ফেলুক নিবিড় কালনিশি
অস্ত রবির রক্ত-বরণ মত।
ডুবুক্ যত দৈন্য, আমার দুঃখ পরাজয়,
এমনি করেই লুপ্ত হোক্ নিশার আঁধিয়ার

শ্রীকালিদাস রায়।

পুত্রহীনা।

ডুবিল চাঁদ উদিল না আর
এ বিশাল বিশ্ব মাঝে,
আসিল ঐ অন্ধকার রাশি
লুখাইল হৃদিমাঝে ॥
যতনের ঐ সাধনার ধন
গিয়েছে সংসার ছেড়ে,
বাসনা যা ছিল হৃদি পুরে
নিয়েছে সে সব কেড়ে;
ভগ্ন কুটীরে বসিয়ে নীরবে
কাঁদিতেছি অবিরত,
বিষাদ চিত্তে জাগিয়া উঠিছে
দুঃখের কণ্টক কত;
দিবস রাতি দুঃখ উঠে ভাতি
শোকের অন্তরে ওঁই;
উথলিছে সে দুঃখের সাগর
বিষম বিপাকে ভাই,
অযুত পান্থ তরী বেয়ে থামে
তরী বেয়ে চলে যায়।

সংসারে কেহ সুখের সাগরে
কেহ বা দুঃখেতে রয়;
নয়নের কোন ভরা অশ্রুজলে
ফুরাইল ভব খেলা;
নিয়েছে কাড়ি যে ও সুখ সম্পদ
হয়েছে সাঁজের বেলা।
এসেছে ঐ রাতি চির দুঃখ জাগি
এ দুঃখ জীবন মাঝে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিবে জাগিয়া
শোক ঐ মাঝে মাঝে;
এ বিশ্ব মাঝারে হয়ে পুত্রহীনা
খুঁজিতেছি সেই পুর,
যেখানে যাই যে করে সব দুঃখ
চির দিন তরে দূর;
পোহাবার আগে এ দুঃখ রজনী
নিয়ে যাও সেই পুরে;
যেখানে সবাই চলে যায় সদা
মানব সংসার ছেড়ে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

প্রশ্ন।*

১। আমি তিন অক্ষর যুক্ত অঙ্গসজ্জা।

আমার প্রথম শব্দটি দারুণ গ্রীষ্মেও বাঙ্গালী বাবুরা দুই বেলাই ব্যবহার করেন।

আমার প্রথমকার দুইটি শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করিলে আমি জগতের মধ্যে অতুলনীয় রূপবান বলিয়া খ্যাতি লাভ করি।

আমার প্রথম ও শেষের শব্দ দ্বারা মৎস্যকুল আকুল হইয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসে।

আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ না হইলে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে না।

আমার প্রথম অক্ষর ছাড়িয়া কেবল মাত্র একটি স্বরবর্ণ ও দ্বিতীয়, তৃতীয় শব্দ লইলে হাস্যরসের অবতরণা করা যায়।

ঐ রূপ প্রথমে অন্য একটি স্বরবর্ণ দ্বারা এমন একটি শব্দ হইবে যাহা সর্ব্ব জীবেই বর্ত্তমান। এখন বলুন দেখি আমি কে এবং যে সমস্ত উপমা দিলাম সেই গুলিই বা কি ?

২। কোন-সময়ে দ্বন্দ্ব হয়ে ছিল দুইজনে
রামভক্ত হনুমান আর অর্জ্জুনের সনে।
গুরুর মস্তকে কেবা পা' দিয়া চলিল,
কোন্ জন সেই যুদ্ধে কৃতিত্ব দে'খাল।
কেন বা সে দ্বন্দ্ব হ'ল কিসের লাগিয়া,
সবিস্তারে বর্ণিয়ারে লিখিনু ভাবিয়া॥

৩। এক বর্ণের দুই ভাই দুই নাম ধরে।
ছোট ভাই প্রবেশ করে বড় ভায়ের উদরে॥
উদরে প্রবেশ করি জীবন করে নাশ।
মুসলমানের ত্যজ্য বস্তু হিন্দুর ঘরে বাস॥

৪। মস্তক, গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি ?

প্রশ্নোত্তর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিশ্র ;—কলিকাতা। ইনি বৈশাখের ২য় প্রশ্ন ও জ্যৈষ্ঠের ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর বহু বিলম্বে পাঠাইয়াছেন বলিয়া আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই তজ্জন্য এবারে তাহা প্রকাশিত হইল।

বৈশাখ ২য় প্রশ্নোত্তর ;—সময়—

---

* বার মাসের প্রশ্নের সমস্ত বা আংশিক মীমাংসা করিতে পারিলে বৎসরান্তে প্রশ্ন মীমাংসার তারতম্যানুসারে নগদ টাকা বা প্রশংসাপত্র বা স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং যিনি যে প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন, তাঁহার পরবর্ত্তী সংখ্যার আলোচনায় নাম-ধামসহ প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নসকলের মীমাংসার অধিকার একমাত্র আলোচনার গ্রাহকদিগের রহিল। যাঁহারা গ্রাহক নহেন তাঁহাদের উত্তর বা নাম ধাম কিছুই প্রকাশিত হইবে না বা পুরস্কারের দাবীও গ্রাহ্য হইবে না। ম্যানেজা'র—আলোচনা।

সর্ব্বস্থানে সাথে সাথে "সময়ের" গতি ;—
গেলে কিন্তু নাহি ফিরে করিলে মিনতি ;
ধনী বা নির্ধন তাহে নাহিক বিচার;
"সময়"—সকাশে হের সম অধিকার।
"সময়"—মাহাত্ম্য যেবা বুঝিবারে পারে,
ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ নিজে বরে তারে,
সময়ের যেবা করে অপব্যবহার
রুষ্ট কাল কাড়ি লয় জীবন তাহার !

জ্যৈষ্ঠ—১। প্রঃ উঃ—যাঁতা—

দ্বি অক্ষরে নাম—"যাঁতা"—অপরূপ রঙ্গ
নিম্নার্দ্ধে পুরুষ ভাব উর্দ্ধে নারী—রঙ্গ
মুখেতে গ্রাসিয়া শস্য উদরে চিবায়,
চূর্ণিত সে শস্য দেয় দেবাদি সেবায়।

২য়ঃ। প্রঃ উঃ—হার—

যুবতীর প্রিয় "হার"—কণ্ঠের ভূষণ,
"আ" পূর্ব্বে "আহার" সর্ব্বপ্রাণীর বাঞ্ছন,
"প্র" পূর্ব্বে "প্রহার" হয় অপরাধী যোগ্য,
"বি" পূর্ব্বে "বিহার" জানি ধনী জন ভোগ্য।

IMPERIAL LIBRARY

আগমনী।

১

পুলক পূরিত হয়েছে ভুবন
হাসিছে প্রকৃতিরাণী,
বরষার শেষে এসেছে শরৎ
আসিছে শরতরাণী।

২

হাসিছে গগন লইয়ে তারকা
হরষিত বিশ্ববাসী,
হরষে মগন প্রবাসী হৃদয়
হেরিতে স্বদেশে আসি।

৩

হাসিছে আজিগো সমগ্র ভুবন
সাজিয়ে মোহন সাজ,
তব আগমন তপন কিরণ
জানায় জগতে আজ।

৪

নিদাঘ বাতাস শরত কালের
ধীরে ধীরে বহে যায়,
তোমার বারতা জানায় জগতে
বহি সুমধুর ভাবে।

৫

দরিদ্র ভিক্ষুক দারিদ্র্য-পীড়িত
একাহারী অসহায়,
দারিদ্রের জ্বালা সেও ভুলে যায়
মাগো হেরিয়ে তোমায়।

৬

শয্যাশায়ী রোগী বসেছে উঠিয়ে
ভুলিয়ে যাতনা সব,
তব আগমনে জেগেছে ভুবন
মাতিয়ে পুলকে নব।

৭

এস মা চামুণ্ডে মহিষমর্দ্দিনী
এসগো জননী মোর,
হেরগো সন্তানে নয়নে মোদের
ঝরিছে আনন্দ লোর।

৮

আয় মা জননী সন্তান ভবনে
ধরি বরাভয় করে,
আগমনী গান গাহিছে সানাই
মধুর আনন্দ ভরে।

৯

ক্ষুধিত তৃষিত ত্রাসিত আমরা
কৃপা কর কৃপাময়ি,
বিতরগো অন্ন, অন্নক্লিষ্ট দেশে
এসগো মা দয়াময়ী।

১০

তুই না আসিলে কে মুছাবে আর
মোদের নয়ন জল,
কাহাকে আমরা শারদ প্রভাতে
হেরিব সকলে বল।

১১

এসগো জননী বিরাজ হৃদয়ে
মোহন মূরতি ধরি,
দাঁড়াগো মোদের নয়নের পরে
প্রাণ ভরে তোর হেরি।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

দশভুজার আহ্বান।

পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?
তাই কি শরৎশশী, উজলিয়া দশ দিশি,
শীতল কৌমুদি হাসি নেহারে জগতে।
বিমল তটিনী বারি, তর তর রব করি,
নাচিয়া নাচিয়া যায় সাগরে মিশিতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

প'রিগলে ফুলমালা দাঁড়াল যামিনীবালা,
উজলিত তারাহার পরিয়া গলেতে ;
ধূসর নীলিমা শাড়ি, তাতে মুকুতার তড়ি,
চিকণ উজল কার খদ্যোত খচিতে ;
পুনঃ কি মা পথভুলি আইলে ভারতে ?

তাই কিগো থাকি থাকি রব করে পিক
চকোর ধাইয়া যায় গাহিতে গাহিতে ;
বিহগ কাকলী স্বরে তব নাম গান করে
মৃদুল পবন বয় কাঁপিতে কাঁপিতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

ঊষার তুষার বিন্দু, মাখিয়া সরোজবন্ধু,
রঞ্জিত সহস্র রশ্মি নবীন রঙেতে ;
পূরব গগনকোলে, উদিল প্রকৃতি ভালে,
অমল উজল ছবি ভাসিল সরিতে ;
শোভা বিটপীর শির, শোভা সরসীর নীর
শোভন কমল চাহে মধুর হাসিতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

হিম অদ্রি-কিরীটিনি, ভূষিতা হিরণ-মণি
সুশস্য শ্যামলা ধরা তোমার ভারতে ;
কত বীর পথভুলি কোথায় গিয়াছে চলি,
দারিদ্র্য দুঃভিক্ষজ্বালা ঠেলিয়া পদেতে ;
আমরা ঘুমের ঘোরে এ বিপদ শিরঃপরে
জানি না মা কতকাল হইবে বহিতে !
শোকার্তের আর্ত্তনাদ পারি না সহিতে ;
নিরাশ শ্মশান সম হেরি চারিভিতে !
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

শরতের মেঘ যেন, বিফল গর্জ্জন হেন,
কতজন 'পারে' চায় সিন্ধু সন্তারিতে ;
কেহ করে নির্য্যাতন, দরিদ্রের প্রপীড়ন,
মলিন বদন কেহ রহে মৌনব্রতে ;
কত জন দেশান্তরে যায় পুনঃ আসে ফিরে
আকুল নয়ন-নীরে কাঁদিতে কাঁদিতে—
জীবন সংগ্রাম স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

পূরবের রীতিনীতি, ভুলিয়া পুরব স্মৃতি,
নূতন জীবন গাড় নূতন বিধিতে ;
নূতন তরণী লয়ে, হইয়া নূতন নেয়ে,
ভরিয়া নূতন পণ্য বাণিজ্য করিতে,
কি নূতন পারাবারে, অনুকূল বায়ুভরে,
চলেছে ভারতজন তোমারে ভুলিতে,
অভিনব হাব ভাব কিনিতে বেচিতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

সে ভারত নাহি আর, ঐ শুন হাহাকার,
হাসা কাঁদা বুঝা ভার অরুণ আঁখিতে ;
মরণের দ্বার খুলি, যেতেছে আপনি চলি,
ন্যায়ের দেউল চুর করি পদাঘাতে ;
পিশাচ তাণ্ডব প্রায়, পুনঃ ওকি দেখা যায়
দেখে শুনে তবু কত ঐ যায় মেতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

ভারতের শিল্পকলা, ভারত বাণিজ্য মেলা,
ভারতের কৃষি, বিদ্যা, চির আঁধারেতে,
ভারতের জ্ঞান ধ্যান, বিবেক বিরাগ প্রাণ
চিরতরে ভাসাইয়া দিয়া কালস্রোতে ;
বস্ত্রাভাবে অতিদীন, অন্নাভাবে তনুক্ষীণ
রোগ শোকে জীর্ণ শীর্ণ মলিন মুখেতে ;
দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা, নয়নে লেগেছে ধাঁধা
বিষন্ন বিবেকহীন কাঁদিতে কাঁদিতে ;
ঐ দেখ দাঁড়াইল তোমার দ্বারেতে ;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে ?

যদি মা আসলে পুনঃ, সন্তানের কথা শুন
ভারতে ভুলিয়া যেন যেও না সম্বিতে!
দশভুজে অস্ত্র ধরি, দানবে দমন করি,
পুনঃ সত্য যুগধর্ম্ম আন আচম্বিতে!
আঁধারে আলোক পশি, নিশিটি হইবে দিশি
হারাধন পাব পুনঃ খুঁজিতে খুঁজিতে;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে?

তোমার এ অন্নাগার, এবে অন্ন মিলা ভার
রতন ভাণ্ডার তব আঁধার নিশিতে,
লুঠিয়াছে কোন চোরে, কে তাহা বলিতে পারে,
মলিন ভারত কাঁদে বিষন্ন মুখেতে;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে?

এস মা যতন করি, রতন মণ্ডপোপরি,
কুসুম আসন পাতি বসিয়া দ্বারেতে;
নিরখিয়া পথপানে আছিগো ব্যাকুলপ্রাণে
চন্দনে চর্চ্চিত জবা রাখিয়াছি হাতে;
আমার সর্ব্বস্ব যাহা দিয়াছ মা তুমি তাহা,
অর্পণ করিব তাহা রাঙ্গা চরণেতে;
শক্তি দাও মহাশক্তি লভি যেন পরাভক্তি
অনন্ত অসীম তব শক্তি লহরীতে
মা মা বলে ডাকি যেন পারিগো মিশিতে;
পুনঃ কি মা পথ ভুলি আইলে ভারতে?

শ্রীসতীপদ মিত্র।

আলোচনার আত্মকথা।

আমি নিয়মিত প্রকাশ হইতে পারি নাই বলিয়া অনেকেই ইহার মধ্যে আমাকে একটু আধটু ইঙ্গিত করিতে ছাড়িতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত (যদিও আমার বৈশাখেই জন্ম) বিধাতার বিধানে শ্রাবণ মাস কোলে করিয়া আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি তথাপি এই চারি মাসে আমি পাঁচটি শাখা বহির্ভূত করিয়া কি একটুও বাহাদুরীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারি না?

* * * * * *

আরও বলিব কি আমার দুর্ভাগ্যের কথা, যে সব গ্রাহক মহোদয়গণ আমাকে এতদিন যথাসময়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবারে তাঁহাদের নিকট বার বার আবেদন নিবেদন করিয়া একবারও তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলাম না।

* * * * * *

পোড়া অদৃষ্টের এমনই দোষ; পূর্ব্বে বেশ অনরেজেষ্টারী প্রথায় দুই টাকা এক আনা চার্জ্জে ভিঃ, পিঃ, করা যাইতেছিল, তাহাতে কোন কোন গ্রাহক দয়া করিয়া আমার ভিঃ, পিঃ, মোড়ক লইয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে বিনা রেজেষ্টারীতে আর ভিঃ, পিঃ, করিবার যো নাই।

* * * * * *

কাজেই ২/০ আনার স্থলে আবার রেজেষ্টারী খরচা ধরিলে ২৷৶০ আনা হয়, এখন ঐ হারে ভিঃ, পিঃ, পাঠাইলে ফেরৎ ভিন্ন অর্থাৎ আমারও প্যাকেট প্রতি ৶০ আনা করিয়া বল হ্রাস এবং গ্রাহকটিরও আশা নাশ—সর্ব্বনাশ। বল মা তারা কি করে নিয়মিত প্রকাশিত হই।

* * * * * *

পূর্ব্বে কয়েকবার জানাইয়াছি, আবার এবারও জানাইতেছি ; আশা করি, এবারে কুম্ভকর্ণের জাগরিত হইবার দিন আসিল। কারণ, ছয় মাস অল্প পূর্ণ হইল।

* * * * * *

যিনি আমার দক্ষিণা মণিঅর্ডারে পাঠাইবেন, তিনি একটু তৎপর হউন, এবং যিনি ভিঃ পিঃতে টাকা পাঠাইতে চাহেন, তিনি একখানি পোষ্টকার্ড খরচ করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

* * * * * *

নচেৎ চুপচাপ থাকিলে আগামী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিব। ২৶০ আনা আমাদের, আর সরকারী বাহককে /০ আনা মোট ২৷৶০ আনা গ্রাহকের খরচ পড়িবে।

* * * * * *

আমাদের সাদর আহ্বান ও কাতর প্রার্থনায় শ্রীমান্ কল্কিদেব আগামী সংখ্যা হইতে আমার কলেবরে আবির্ভূত হইবেন। প্রয়োজন—ভারতকে ধ্বংশ পথ হইতে উদ্ধার করা। সুতরাং তাঁহার প্রীত্যর্থে দুই টাকা দর্শনী পাঠাইতে কেহই অবহেলা করিবেন না। নচেৎ—

বকেয়া গ্রাহক নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতু মিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কি শরীর,
জয় জগদীশ হরে।

উদ্যোগী।

(১)

"দেখ, ঘরে ব'সে ব'সে খেলে গাঙের জলেও কুলোয় না ; তা' তোমার

আর এমনি কি সম্পত্তি আছে, যা ভেঙ্গে খেলে বার মাস ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং দিয়ে চলে যাবে ?"

"আরে পাগলি বকিস্ কেন ? এই ত এক কারবার করলুম, কি হ'ল শুনি ; লাভের মধ্যে যা দু'পাঁচ টাকা ছিল, তাও খোয়ালাম।"

"তাই বলে কি নিশ্চিন্তি হ'য়ে বসে থাকতে হবে ? নাঃ—আর আমি পারি নি ; এমন আল্‌সে লোকের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তোমার ঘর সংসার তুমি দেখ। এই বেলা মানে মানে আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। শেষকালে কেন বদনামের ভাগী হব, আর বলবে ঘরে যা কিছু ছিল, মাগী সব খেয়ে নিলে। এই ত এ বছর চাষে যা ধান হয়েছিল, এরই মধ্যে ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এর পর কি খাবে শুনি ?"

"থাম্ থাম্, আর বকিস্ না। তোরা মেয়েমানুষ, কি বুঝিস্। কলিকাতায় গিয়ে যে চাকরী করব, সে গুড়ে বালি। পনর টাকা মাইনের একটা চাকরী খালি হ'লত পঞ্চাশ খানা দরখাস্ত প'ড়ল, আবার তার মধ্যে অমন দু-দশটা বি-এ, এম-এ, বেরিয়ে গেল। বি এ, এম এ, ছেড়ে কি সাহেব আমার মত ছটাকে বিদ্বানকে চাকরী দেবে ? ব্যবসা করব কিন্তু সেত ছেলেখেলা নয়, দস্তুরমত পুঁজি চাই, খুব ভড়ং করে দোকান সাজাতে হবে, বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি কর, সাহেবি কায়দায় চলাফেরা কর, তবে যদি কিছু হয়, না হ'লে ব্যবসা করে যা সুখ, তা সে দিনে দোকান তুলে দিয়েই টের পেয়েছি। বলে—ভগবান যদি দেয় ত ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়, জানিস্ পাগলি ? মিছে মিছে কেবল কচাকচী করলে আর কি হবে ?

গত বৎসর রমেশ এক মুদিখানা দোকানে কিছু লোকসান দিয়া এখন দোকান তুলিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া আছে। সংসারও যে খুব সচ্ছল তাহা নহে, কয়েকবিঘা ধান জমি আছে, তাহার আয়েই কোন রকমে সংসার চলিয়া যায় ; কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে দেশে অজন্মা হইয়া সকলেরই কষ্টের একশেষ হইয়াছে। রমেশের স্ত্রী কাত্যায়নী স্বামীকে অনেক বুঝাইয়া কারবারে ব্রতী করিয়াছিল কিন্তু অনভিজ্ঞতা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এ বৎসরও শস্যের অবস্থা বড় সুবিধা নয়, দেখিয়া সে বড়ই চিন্তিতা হইল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষে না হয় একবেলা খাইয়াও জীবনধারণ করিতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট ছেলে দুটিকে ত একবেলা খাওয়াইয়া রাখিতে পারে না ! আর তাহাই বা আসিবে কোথা হইতে ? তাই কাত্যায়নী স্বামীকে কোন একটা কাজ-কর্ম্মের

চেষ্টা দেখিতে বলিতেছিল। রমেশ কিন্তু সে ধাতের নহে; তাহার ধারণা—কপালে থাকে, সুখ হবে, নইলে হাজার চেষ্টাতেও কিছু হয় না।

(২)

মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। রমেশের কনিষ্ঠ খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দুই চারি জন নিকট সম্পর্কীয় কুটুম্বের আগমন হইয়াছে। রমেশ তাহার সামর্থ্য মতই আয়োজন করিয়াছিল, তাই বাছাই করা দুই চারি জন কুটুম্বের আমদানী; নচেৎ সূক্ষ্ম হিসাবে ধরিলে শেষের অঙ্কের ৪ গুণেরও অধিক হয়! দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর রমেশ ও তাহার শ্যালক শ্যামসুন্দর উভয়ে নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। কাত্যায়নী সকাল হইতে সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। এতক্ষণে অবকাশ পাইয়া খোকাকে কোলে করিয়া স্বামী ও ভ্রাতার নিকট আসিল। ইচ্ছা, ভ্রাতাকে বলিয়া অলস স্বামীকে কর্ম্মোৎসাহিত করা; নতুবা এত সাধের খোকা দু'দিন বাদে যে না খাইতে পাইয়া মরিবে! মায়ের প্রাণে সে চিন্তা আদৌ সহ্য হয় না; তাই ভ্রাতার নিকট সাংসারিক সমুদয় বিবরণ জানাইয়া ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল। ভ্রাতা শ্যামসুন্দর সমস্তই বুঝিল; ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিয়া রমেশের দিকে চাহিল।

বাস্তবিকই রমেশের অন্তঃসার—শূন্য; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের আত্মীয় কুটুম্বের নিকট তাহা জানাইতে সে একটুও ইচ্ছুক ছিল না। লজ্জায় তাহার মস্তক নত হইল। আপত্তির উপায় নাই, সম্মুখেই যে স্বয়ং শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দাঁড়াইয়া! শ্যামসুন্দর একজন বিজ্ঞ ব্যবসায়ী। যদিও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায়কে জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা নির্দ্দেশিত করিয়াছিল, তথাপি কেহই তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই। তাঁহারা সেই মামুলী এক মুদিখানা দোকানকেই নাড়িয়া চাড়িয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্যামসুন্দর নিজ বুদ্ধিবলে তাহাকে আধুনিক ধরণে সাজাইয়া গোছাইয়া এমনটি করিল যে, দুইদিন না যাইতে যাইতে বাজারে তাহার খুব নাম জাহির হইল। সেই হইতেই তাহার উন্নতির সূচনা হইল, এখন সে মা কমলার একজন প্রিয় সন্তান। রমেশকে লজ্জিত দেখিয়া সে বলিল,—দেখ ভাই, মানুষকে উন্নতিলাভ করিতে হইলে লজ্জা করিলে চলিবে না। মান, অপমান, লজ্জা ত্যাগ করিলে তবে মা কমলার দৃষ্টি পতিত হয়। আর না হয় ত বল্‌বে—অদৃষ্টে নেই, কি করব ভাই? তা' কর্‌লে চলে না। চাই উদ্যোগ, চাই মনের বল, চাই উৎসাহ, চাই অভিমান ত্যাগ; তবেই মানুষের ভাগ্য খোলে, নচেৎ কিছুই হয় না। তুমি হয়ত বলবে

আমি গ্রাজুয়েট, মোটা পুঁজি চাই, সাহেবী কায়দায় আফিস ঘর চাই, তবে ত কারবার খুলবো। না হ'লে যে মান যায়। কম পুঁজি নিয়ে ত আর মুদী রাখালী করা চলে না !! তোমার স্ত্রী-পুত্রেরই আহার জোটা'তে পার না, তা বেশী পুঁজি জোটাবে কোথা হ'তে। ভাই, মনে কিছু কর না, তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, আজ কাল বাজার পড়েছে তাই! তারপর এই যে চাকরীর বাজার, তাও ত দেখছ। তবে কি করা যায়, কোন দিকেই উপায় নাই। অমনি অদৃষ্টবাদী হিন্দু আমরা, কপাল চেয়ে উদ্বেগ কমালুম !! হায়, কি দুরদৃষ্ট এ দেশের !! ভাই! দেখ, শুধু ভাগ্যে নেই বলে চুপ করে থেক না; চেষ্টা কর। শাস্ত্র বলেন,—

উদযোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

সাক্ষী দেখ, মারওয়াড়িগণ মাত্র লোটা-কম্বল সহায় করিয়া প্রবাস বহির্গত হয়, আর প্রত্যাগমন সময়ে দেখিবে যে, সেই মারওয়াড়ি দিব্য সুচিক্কণ বস্ত্রাদিতে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, হস্তে ও কর্ণে রত্নখচিত বলয়াদি পরিধান করিয়া সুবিপুল বপু দোলাইয়া মূল্যবান পুলিন্দা সঙ্গে ট্রেণে উঠিতেছে। তখন তাহার কি সহাস্য বদন! তা ভাই, একবার মনে করে দেখ দেখি, সে কি প্রবাসে আসিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল? কত দিবা রাত্রি অনিদ্রা, অনাহারে, কত ঝড়, বৃষ্টি মাথার উপর বহাইয়া, কত উদ্বেগ অশান্তি কাটাইয়া, তবে সে আজ লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছে। বিনা চেষ্টায় কিছুই হয় না ভাই।

শ্যামসুন্দরের কথা রমেশের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল—'উদযোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী।' কিন্তু তখন যে তাহার হাতে কিছুই নাই! কি লইয়া ব্যবসা করিবে? কাতরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইল। বুদ্ধিমতী কাত্যায়নী স্বামীর সে ভাব বুঝিল। অতঃপর নানা বিষয় আলোচনার পর ভগ্নী একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভ্রাতাকে নিজেদের আর্থিক অবস্থা জানাইল। ভগ্নীপতিকে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্যামসুন্দর বলিল,—"ভাই, যদি এক বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিয়া ২০০৲ টাকা সঞ্চয় করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিজে আরও ৫০০৲শত টাকা দিয়া একটা বড় রকম কারবার করিয়া দিতে পারি। এই নাও দশ টাকা, ইহাকে খাটাইয়াই দুই শত টাকা

করিতে হইবে। রমেশ বিস্মিত ভাবে শ্যামসুন্দরের মুখের দিক চাহিল! উদ্দেশ্য এত অল্প পুঁজিতে কিরূপে ২০০৲ টাকা হইবে।

(৩)

কালের অপরিহার্য্য নিয়মে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঠক, বড়বাজারের মোড়ে ঐ যে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের দোকান দেখিতেছেন, ঐ দোকানের স্বত্বাধিকারী মধ্যস্থলে তাকিয়া ঠেস দিয়া সম্মুখে বাক্স রাখিয়া আল-বোলার নলটি মুখে করিয়া টাকা গণিতেছে, ঐ লোকটিকে চিনিতে পারেন কি? ও সেই রমেশ! কি, আমার কথায় আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে! আচ্ছা একবার নাম ধরে ডাকুন দেখি? তবে দে'খবেন, নেহাৎ রমেশ বলে ডা'কবেন না, একটা 'বাবু' যোগ দিয়ে ডাকুন। দে'খবেন, আদর আপ্যায়নের ত্রুটী থাকিবে না, নচেৎ অপমানের একশেষ। আমি কিন্তু সেজন্য দায়ী নহি। শ্যালকের উপদেশে ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর যত্নে রমেশ সত্যসত্যই এক বৎসরে দুই শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় কৌতূহল হইতেছে? আচ্ছা রমেশের ব্যবসায়টাই না হয় খুলিয়া বলিলাম, তাতেই আর রমেশের এখন কি ক্ষতি! তবে ভরসা আছে এ জন্য রমেশ আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করিবে না। পত্নীর উপদেশ মত প্রথমেই সে ছয় টাকা পুঁজি লইয়া নিজ বাটীর বহির্দ্দেশে একচালায় একখানি ছোট মুদিখানা দোকান সাজাইল। কাত্যায়নী তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল এবং নিজে বাকী চারি টাকা লইয়া কৃষকদিগের নিকট হইতে শাক-শব্জী কিনিয়া নিকট বা দূরস্থ হাটে যাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সে অল্পদিনেই পুঁজি বাড়াইয়া ফেলিল। ক্রমে শাক-শব্জীর ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া, গামছা ও জোড়াকতক কাপড় সস্তাদরে কিনিয়া দ্বিগুণ মূল্যে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করিয়া বেচিতে লাগিল। ইহাতেও বলিতে চান কি, এক বৎসরে দুই শত টাকা সঞ্চয় করা যায় না? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, রমেশ কিন্তু দুই শত টাকা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী পুঁজি বাড়াইয়া ছিল। তাহা কাত্যায়নীর নাকের লাগাম ও খোকার কোমরের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে। শ্যামসুন্দর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত আরও পাঁচ শত টাকা দিয়া কলিকাতায় একটা ছোট কাপড়ের দোকান করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলেই বর্ত্তমান রমেশ'বাবু'আলবোলার নল মুখে করিয়া টাকা গণিতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সাহিত্য সরস্বতী।

12 FEB 1921

মতিমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৫)

উভয়ের অবস্থা দেখিয়া হরিহর বাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল, তিনি কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে কি ভাবিয়া তিনি তথা হইতে সরিয়া আসিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নানারূপ চিন্তায় তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, পিশাচী রমণীর অকরণীয় কিছুই নাই; আর কেন, হতভাগিনীকে এখনই দূর করিয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর। আবার ভাবিলেন, "মার পেটের ভাই, এত নিমক্‌হারাম! ছেলেবেলা লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত কি না করিয়াছি? পেটে না খাইয়া উহার স্কুলের মাহিনা যোগাইয়াছি; সব জানিয়া শুনিয়াও কেবল স্কুল পলাইয়া, তাস খেলিয়া, আর সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়াইয়াছে; তারপর বড় হইয়া আমার অহোরাত্র পরিশ্রমের অর্থ যথেচ্ছা নষ্ট করিতেছে; আজীবন তাহার সকল আব্‌দার, সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে এই পুরস্কার! হরিহর বাবু আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন; চিন্তার আবেগে তিনি যেন উন্মাদ হইয়া উঠিলেন।

অহল্যাদেবী যথাকালে তাঁহার আত্মীয়ের বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিরপ্রথানুসারে কিঞ্চিৎ সিদ্ধির সরবৎ ও মিষ্টান্ন লইয়া ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু ভ্রাতার মুখমণ্ডলে এরূপ এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিজাতীয় ভাব অবলোকন করিলেন যে, যে ভগ্নীর ইঙ্গিতে হরিহর বাবু বালকের ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকেন, সেই মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা পর্য্যন্ত আর বাক্যালাপ করিতে সাহসী হইলেন না। হরিহর বাবু একদৃষ্টে কক্ষপ্রাচীরে কি দেখিতেছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং বলিতে পারেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক, বহুক্ষণ অহল্যাদেবী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরি, আজ একটু সিদ্ধি মুখে দেবে না?" হরিহর বাবু তাঁহার ভগ্নীর কথাগুলি শুনিয়াছিলেন কি না অথবা তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু তিনি যখন অহল্যাদেবীর মুখমণ্ডলে

তাঁহার আরক্তিম নেত্রদ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, ত্রস্তভাবে উল্লিখিত সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন কক্ষতলে রক্ষা করিয়া নিঃশব্দে সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

বহুক্ষণ চিন্তার পর হরিহর বাবু স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন; এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুরাতন ভৃত্য জগন্নাথকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইল, এবং প্রভুর মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া নিঃশব্দে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল। হরিহর বাবুর সেদিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিঃশব্দে অর্দ্ধোন্মাদের ন্যায় কক্ষতলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনর্ব্বার "জগা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথ বিনীতভাবে বলিল, "বাবু!" তীব্রকণ্ঠে হরিহর বাবু বলিলেন, "হারামজাদা, কখন তোকে ডেকেছি?" হরিহর বাবু স্বভাবতঃ মিষ্টভাষী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও কাহাকে কোনওরূপ রূঢ়কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না;—বিশেষতঃ, দাস-দাসী ও পরিজনবর্গের প্রতি তিনি সমধিক দয়ালু ছিলেন। জগন্নাথ তাহার প্রভুর মুখ হইতে উল্লিখিত কথাগুলি শুনিয়া বস্তুতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং বিনয়-নম্রবচনে কহিল, "বাবু, আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।"

রোষ-কষায়িত-লোচনে হরিহর বাবু বলিয়া উঠিলেন, বে'কুফ্। শূয়ার! মুখে কথা নেই! কোচমানকে শীঘ্র গাড়ী জুত্‌তে বল্, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির চাই।"

জগন্নাথ বাবুর ঈদৃশ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সাতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইল, এবং ভীতিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গাড়ী?"

"পাল্কী-গাড়ী,—সাদা ঘোড়া।"

জগন্নাথ চলিয়া গেল। হরিহর বাবু পুনরায় উন্মাদের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(৬)

অনতিবিলম্বে জগন্নাথ আসিয়া সংবাদ দিল যে, গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। তখন হরিহর বাবু অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বৌ-ঠাকরুণ কোথা?"

জগন্নাথ সভয়ে কহিল, "এই পাশের ঘরে।"

"পাশের ঘরে! কি কর্‌ছে?"

"বালিসের ভিতর মুখ দিয়ে শুয়ে আছেন,—বোধ হয় অসুখ করেছে।"

হরিহর বাবু মনে মনে বলিলেন, "কুলটা জানে না যে, মাটির ভিতর লুকাইলেও তাহার কলঙ্ক চাপা পড়িবে না। উড়ে ম্যাড়াটা ভাবছে যে, তার বৌ-ঠাকরুণের অসুখ করেছে; কিন্তু সে ত জানে না যে, সুখের পথে কাঁটা পড়েছে ব'লেই এই অসুখ।" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ঘরে এ'ল কখন?"

"যখন আপনি এলেন, তিনিও আপনার পিছে পিছে আসিলেন; আপনি এ ঘরে ঢুকলেন, আর বৌঠাকরুণ ও ঘরে ঢুকলেন।"

হরিহর বাবু সকল কথা শুনিলেন কি না বা বুঝিলেন কি না তাহা আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তিনি মাত্র অন্যমনস্কভাবে একটি "হু" বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথ ভয়ে ও বিস্ময়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল।

হরিহর বাবু কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মতিমালা উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া রোদন করিতেছে। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আরক্তিম হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতেছে। হরিহর বাবুকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মতিমালা নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, আর ঐ মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস যেন গুরুগম্ভীর নীরব ভাষায় পুরুষজাতিকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "ছি ছি, তোমরা এতটুকু প্রাণ লইয়া এত বড় সংসারে বিচরণ কর!" পাঠক-পাঠিকাবর্গকে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এ সকল ভাষার একটি বর্ণও হরিহর বাবুর কর্ণে পৌঁছিতে পারে নাই। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে মতিমালাকে বস্তুতঃ অমূল্য মতিমালা বোধে এতকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে মতিমালাকে একটু সরিয়া বসিতে বলিয়াও মনে মনে ব্যথা অনুভব করিতেন, সেই মতিমালার যখন চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত, তখন তাহাকে নির্ম্মমভাবে অতীব রূঢ় কঠোর স্বরে বলিলেন, "আর ছেনালীতে কাজ নেই, ঢের হয়েছে! এখন উঠে পড় দেখি,—তোমার যা নেবার আছে নিয়ে এখনই বেরোও, এখানে তোমার আর এক মুহূর্ত্তও

স্থান নেই। গাড়ী তৈয়ারি আছে, যেখানে বল্‌বে সেইখানে পৌঁছে দেবে।"

মতিমালার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মে ভীষণ আঘাত করিল—সে আঘাত বজ্রাঘাত অপেক্ষাও ভয়াবহ! মতিমালা মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। দুঃখে ক্ষোভে অপমানে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চক্ষের জল শুষ্ক হইল। যে আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল হইতে ক্ষণকাল পূর্ব্বে শ্রাবণের ধারা বর্ষণ হইতেছিল, তাহা হইতে যেন বজ্রাগ্নির প্রদীপ্ত জ্যোতি বিনির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু হরিহর বাবু এখন অর্দ্ধোন্মাদ; এ সকল বিষয় লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য তাঁহার আদৌ নাই। তিনি অধিকতর নির্ম্মম কঠোর স্বরে বলিলেন, "বসে রহিলে যে? সহজে বিদায় হবে, না ঝি-চাকর দ্বারা গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় কর্‌তে হবে?"

এইবার মতিমালার সহের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি কিঞ্চিৎ অসংযত ভাবে বিদ্যুৎগতিতে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন; দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, আর ঝি-চাকর দিয়ে গলাধাক্কা দেবার প্রয়োজন নেই, আমি আপনিই বিদায় হচ্ছি; কিন্তু কোথায় যাব, তা—ত বলে দেবে?"

মতিমালার উত্তরে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যমের বাড়ী" এবং তৎসঙ্গে এরূপ এক পদাঘাত করিলেন যে, মতিমালার ক্ষীণ দেহযষ্টি সে গুরু আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কক্ষের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইল।

চিরহিতাকাঙ্ক্ষী পুরাতন ভৃত্য জগন্নাথ এতক্ষণ পর্য্যন্ত পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বারদেশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার বৌঠাকুরাণীকে দ্বারদেশে নিপতিত হইতে দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিল না; অহল্যাদেবী কিছু পূর্ব্বে যে জলপূর্ণ পান-পাত্রটি রাখিয়া গিয়াছিলেন, পলক মধ্যে তাহা গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে পার্শ্বকক্ষের দ্বারসম্মুখে মতিমালার নিকট উপস্থিত হইল। অহল্যাদেবীও দূর হইতে ভ্রাতৃবধূকে ভূপতিতা দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন। হরিহর বাবু কর্ত্তৃক তাহার বৌ-ঠাকুরাণীকে এইরূপে অযথা নিগৃহীত হইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ জগন্নাথ আর সহ্য করিতে পারিল না; সে রাগতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবু, আপনি কর্‌ছেন কি?"

হরিহর বাবুর মস্তিষ্কের আদৌ স্থিরতা ছিল না। তিনি তাহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, আজ বিশ বৎসরের পুরাতন শুভানুধ্যায়ী ভৃত্যের

গণ্ডদেশে "চুপ রহো শূওর!" বলিয়া সজোরে চপেটাঘাত করিলেন। জগন্নাথ অবাক্ হইয়া ক্ষণেক অনিমেষনেত্রে হরিহর বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিল, পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অহল্যাদেবী কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া ভৃত্যের হস্ত হইতে সত্বর জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে হরিহর বাবুর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর মতিমালার মুখে জলসিঞ্চন করিতে করিতে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, কোথায় লাগ্‌লো?" পরে তাঁহার গাত্রে ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় অতীব স্নেহ-ব্যঞ্জক কোমল স্বরে কহিলেন, "বৌ, কোথায় লাগ্‌লো বল না, একটু জল দিয়ে দি।"

মতিমালার মুখে বাক্য নাই,—নয়নে অশ্রুকণা নাই, দেহে স্পন্দন নাই, যেন একটি নির্ব্বাক, নিস্পন্দ সজীব প্রস্তর-পুত্তলিকা!

হরিহর বাবু পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এখনও দেরি! তোর যা আছে নিয়ে এখনই দূর হ'।"

মতিমালা একবার কাতরনেত্রে নীল নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরক্ষণেই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ভূলুণ্ঠিতা হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। মতিমালার আর জীবনে কোনও সাধ ছিল না। তাহার যে স্বামী এতকাল তাহাকে আদর ও সোহাগের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে স্বামী এতকাল তাহাকে বক্ষে রাখিয়াও ভাবিতেন, বুঝি বা তাঁহার মতিমালা ব্যথা পাইতেছে, সেই স্নেহময় স্বামী আজ তাহাকে তাহার স্বপ্নসুখবিজড়িত পতিগৃহ—তাহার ভূস্বর্গ, তাহার আনন্দধাম হইতে পদাঘাতে বিতাড়িত করিতেছেন বলিয়া, তাহার দুঃখ ছিল না, কারণ মতিমালা জানিতেন যে, তাহার স্বামী তাহার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তিনি তাহাকে তাহার পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেও, তাহার হৃদয়-মন্দির কখনও শূন্য করিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু তাহার দুঃখ, আজ তিনি তাহার দেবদুর্লভ স্বামীর চক্ষে অবিশ্বাসিনী—নষ্টা—ভ্রষ্টা—কলঙ্কিনী। এ দুর্ব্বিসহ মর্ম্মভেদী যাতনাভার তাহার পক্ষে অসহ্য, তাই আজ তাহার নিত্য নববাসনা-সঙ্কুল ভরাযৌবনে অকস্মাৎ সকল সাধ ছায়াবাজীর ন্যায় কোথায় বিলীন হইল! আজ মতিমালা মনে প্রাণে মৃত্যুপ্রয়াসী, তাই আজ তিনি

সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতিপদধূলি মাত্র সম্বল করিয়া, চির বিদায়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

হরিহর বাবু এরূপ ব্যবহারের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মতিমালার অপ্রত্যাশিত আচরণে যেন সচকিতে ঈষৎ পশ্চাৎপদ হইলেন, পরক্ষণেই অধিকতর ক্রোধে—রাক্ষসি, আবার ছেনালী। বলিয়া পুনর্ব্বার পদাঘাতের উদ্দেশ্যে স্বীয় দক্ষিণপদ উত্তোলন করিলেন; কিন্তু অহল্যাদেবী আসিয়া তৎক্ষণাৎ বাধা প্রদান করিলেন। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং গর্ভধারিণী সদৃশ জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে ঠেলিয়া দিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সরে যাও তুমি!" বৃদ্ধা বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মতিমালা কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ত্বরিতপদে বহির্বাটী অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। অহল্যাদেবী ও জগন্নাথ তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবার প্রয়াস করিলে, হরিহর বাবু তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার!" সুতরাং তাহারা আর মতিমালার অনুবর্ত্তী হইতে সাহস করিল না।

মতিমালা বহির্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখেই গাড়ী প্রস্তুত। গম্ভীরস্বরে তিনি সহিসকে কহিলেন, "এক মিনিটের মধ্যে একখানা ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া আন।" সহিস ছুটিল, কিন্তু তাহার আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন হইল না; সম্মুখেই একখানা গাড়ী মিলিল। গাড়ীখানি দ্বারদেশে আসিবামাত্র মতিমালা তাহার খড়খড়িগুলি উঠাইয়া দিতে বলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া বসিয়া শকট-চালককে আদেশ করিলেন, "চালাও—হাঁকৃকে;—গঙ্গাজীমে।" গাড়ী ছুটিল। অল্পক্ষণ মধ্যে গাড়ী গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। মতিমালা সত্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শকট-চালক কি মনে ভাবিয়া শকটখানির অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় উপবেশনের স্থান হইতে অবরোহণ করিল, এবং আলোকের সাহায্যে শকটাভ্যন্তর পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিল, তথায় একছড়া স্বর্ণহার পতিত রহিয়াছে। দরিদ্র শকটচালক লোভসম্বরণে অসমর্থ হইয়া, চকিতের ন্যায় একবারমাত্র ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, ক্ষিপ্রহস্তে উহা তুলিয়া লইয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে রক্ষা করিল। অতঃপর কোচবাক্সে আরোহণ করিয়া, ভয়চকিতনেত্রে আর একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে শকটসহ অদৃশ্য

হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টা বাজিল। বিজয়ার বিসর্জ্জন সমাধা হইল।

(৭)

মতিমালা বিদায় হইবার পর হরিহর বাবু একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া বসিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, সে চিন্তার আদি অন্ত নাই, তাঁহার চিন্তাকাশে যেন একটা প্রলয়-ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর হরিহর বাবু সেই ঝটিকার আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে তিনি কতক্ষণ ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই নির্দ্ধারণে অক্ষম, তবে আমাদের বিশ্বাস, নূন্যাধিক অর্দ্ধ-দণ্ডকাল তিনি এইভাবে ছিলেন। ক্রমে যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইলেন, তখন বুঝিলেন যে, পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক এবং মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন যে, গৃহে জনমানবের সঞ্চার নাই; সম্মুখে একটি তারের ঢাকনার মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি সুরক্ষিত রহিয়াছে।

হরিহর বাবু আরও কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। ঘটিকাযন্ত্রটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, উহাও তাঁহারই ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও অচলভাবে অবস্থিত। অনুভবে বুঝিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে স্নানাগারে প্রবেশ করতঃ সেই গভীর রাত্রে বহুক্ষণ ধরিয়া শীতল জলে স্নান করিলেন, পরে গৃহমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া আহারীয় হইতে একটি মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়া পূর্ণ দুই গ্লাস জল পান করিলেন। অতঃপর অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিদ্রাকর্ষণ হইল না,—সমস্ত রাত্রি বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হরিহর বাবুকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিহগকুল প্রভাতসঙ্গীত আরম্ভ করিল।

(৮)

পাঠক-পাঠিকাবর্গ, আসুন আমরা একবার অহল্যাদেবীর সন্ধানে যাই। হরিহর বাবুর অদৃষ্টপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত কার্য্য-কলাপে বৃদ্ধার জ্ঞানবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার যে সহোদর এতকাল তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত, যাঁহার আদেশ দেবাদেশ অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিত,—যাঁহার সম্মুখে কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না,

সেই সহোদর—তাঁহার পুত্রস্থানীয় আবাল্যপ্রতিপালিত সেই হরিহর আজ কি না তাঁহারই সম্মুখে যথেচ্ছাচার করিল, ভৃত্যের সম্মুখে তাঁহার অবমাননা করিল। অহল্যাদেবী বস্তুতঃ বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। অন্য সময় হইলে তিনি হরিহর বাবুর এই ব্যবহারে কি করিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু আজ আর তাঁহার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই, তাঁহার বড় আদরের, বড় যত্নের ভ্রাতৃবধূ আজ গৃহ-বিতাড়িতা।

মতিমালার অনুগমনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অহল্যাদেবী ক্ষণকাল সেই স্থানেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই হরিহর বাবু অন্যমনস্কভাবে আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলেন, এবং অর্দ্ধশায়িত ভাবে হস্তদ্বয়ের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া নিমীলিতনেত্রে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে অহল্যাদেবী ধীরপদবিক্ষেপে হরিহর বাবুর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইলেন। জগন্নাথও ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

অহল্যাদেবী স্বীয় কক্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, নিকটেই জগন্নাথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহাকে দেখিবা মাত্র ব্যস্তভাবে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "জগু, এসেছিস বাবা?—ভালই হয়েছে। একবার দেখ্ দেখি বৌ-ঠাকরুণ কোথায়?" জগন্নাথ দুই একপদ অগ্রসর হইবামাত্র অহল্যাদেবী পুনরায় বলিলেন, আগে দেখ্ বাবা, সদর দরজায় গাড়ীখানা আছে কি না? জগন্নাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। অহল্যাদেবী মুহূর্ত্তকাল সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু এইরূপে একাকিনী স্থিরভাবে অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। ইতিমধ্যে কক্ষাভ্যন্তরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল—"মা!" অহল্যাদেবী সত্বর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া খোকাকে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এই মা আস্‌ছে, ঘুমোও বাবা, ঘুমোও।" অত্যল্পকাল মধ্যে খোকা পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইল। খোকার ঝি তখনও নির্ব্বিবাদে সুখনিদ্রায় বিভোর। অহল্যাদেবী দুই তিনবার তাহাকে অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, অগত্যা তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ঝি, একে কি ঘুম বলে?" দাসী শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল এবং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা বাবুকে কি মা-ঠাকরুণের ঘরে শুইয়ে আসবো?" (ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, বি, এস্‌ সি।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

এস মা আনন্দময়ী নিরানন্দ ভবনে।
আশাপথ চেয়ে আছি জবা দিব চরণে॥
সম্বৎসর হইল গত, শরৎ পুন আগত,
শরৎশশী সমুদিত সুদূর গগনে,
কর কৃপা কৃপাময়ী ত্রাসিত সন্তানে॥

এস বিশ্বেশ্বরী বিশ্ববন্দিনী মা। ভারতভুবন আলোকিত করিতে, তোমার অনুগত ত্রাসিত সন্তানগণকে পুলকিত করিতে, বিশ্ববিমোহিনী রূপে আসিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর, আমরা আশাপথ চাহিয়া আছি, তোমার মোক্ষমূলাধার পাদপদ্মে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিয়া নরজন্ম সার্থক করিব। এস মা, ভারতের গগন পবন পবিত্র করিয়া তোমার ঐ দেবদুর্লভ মূর্ত্তিতে আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ কর, আমরা ধন্য হই, কৃতকৃতার্থ হই।

মা, বলিয়াছিলাম ত "সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায়চ"। বৎসর ত অতীত হইয়াছে, বর্ষার মেঘমলিনতা ত কাটিয়া গিয়াছে, শরতের সুন্দর গগনে ত আবার শরৎশশীর উদয় হইয়াছে, ধরিত্রী সতী ত আবার নানাবিধ পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিতা হইয়াছে, কুমুদকহ্লার শেফালী কোকনদ ত ফুটিয়া তোমার চরণ-সরোজে শোভা পাইবার জন্য হাস্য আস্যে বিরাজ করিতেছে! মরি মরি! কান্তারে কাশকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া কতই না আনন্দ বিহ্বল হইতেছে। সকলেই আনন্দিত, বিশ্ব যখন আনন্দে ডগমগ, তখন আনন্দময়ী তুমি আসিবে না কেন?

যদিও তুমি ভক্তের হৃদয়রাজ্য ছাড়া কখন হও না, যদিও তুমি আমার মনোমন্দিরে মনোময়ী প্রাণময়ীরূপে সতত বিরাজিত, যদিও তোমার করুণা-কটাক্ষ বিনা আমার প্রাণের স্পন্দন সমাহিত হয় না, তোমার শক্তি না পাইলে যখন আমার অস্তিত্ব লোপ পায়, তখন তুমি যাও কোথায়, আর আইস বা



কোন্‌খানে। তুমি ত সতত সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছ। তথাপ মা! শরৎ আসিলে, শরতের এই জ্যোৎস্নাবিধৌত, সেফালী-সৌরভ-স্নাত ধরিত্রীর প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে, দেবীপক্ষে ভিক্ষুকের কোমলকণ্ঠে আগমনীর সেই ললিত রাগিণী শ্রবণে প্রবেশ করিলে মন যেন সততই মাতিয়া উঠে, প্রাণে যেন কি একটা পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে, ত্রেতায় সেই রাবণবধের কথা, সীতা উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই শক্তি উদ্বোধনের কথা, গদ্‌গদকণ্ঠে সেই স্তবস্তুতির কথা, কমল অভাবে কমললোচনের সেই লোচন উৎপাটনের কথা যখনই মনে পড়ে, করুণাময়ী তখনই তোমার সেই সাকার মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে প্রতিফলিত না করিয়া থাকিতে পারি না; শরতের এ সময়টা এমনি প্রীতিপ্রদ, এমনি ভক্তিভাবযুক্ত যে, প্রীতি-ভক্তি আনিতে হয় না, কোথা হইতে, কোন অজানিত অমরধাম হইতে অমরের এই অমিয়সুধা আপনাপনি আসে। যখন এই সাকার মূর্ত্তির পূজার জন্য প্রাণে

একটা ধাক্কা মারিতে থাকে—মনকে মা-ময় করিয়া দেয়, তখন ভক্ত আর থাকিতে পারে না, সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় এই পুতুলপূজায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী এইরূপে পুতুল পূজা করে বলিয়াই বাঙ্গালী পৌত্তলিক, অনেকে ইহার নিন্দা করে, সর্ব্বশক্তির আধারভূত, শিবসঙ্গিনী চিদানন্দময়ী মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া বাঙ্গালীর এ অখ্যাতি,—যাহারা অখ্যাতি করে, তাহারা জানে না যে, বাঙ্গালীর এই সব সাকার মূর্ত্তির পূজা করাই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। প্রবৃত্তি হইতেই নিবৃত্তি, সগুণ হইতেই নির্গুণ, তেমনি সাকার হইতে নিরাকার, অথবা মা আমার নিরাকার, নির্গুণ বলিতে যেন প্রাণ চায় না, মন তৃপ্তি বোধ করে না, যে যেখানে মাতৃদর্শন পাইয়াছে, মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়াছে, সবই ত সাকারে, মা ত সকল ভক্তকেই ভুবন-মোহিনী মাতৃরূপে আসিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—তবে মা আমার নিরাকারা কিসে? আর নিরাকারে পূজা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাই বা কোথায়, কেমন করিয়া সমাহিত হয়? শ্রীরামচন্দ্র কি রাবণবধের সময় নিরাকার মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, না শুম্ভ নিশুম্ভ নিরাকারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অথবা ভক্ত রামপ্রসাদের মনোরঞ্জনের জন্য নিরাকারে তাঁহার বেড়া বাঁধিয়া-ছিলেন, ভক্তের ভোগের জন্য কখনও ত মা নিরাকারে দর্শন দেন নাই। যাহার আকার নাই, তাহার আবার দর্শন কোথায়, তাহার প্রসাদ লাভই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? অতএব মা আমার নিরাকারা নহেন—অন্তরে বাহিরে তিনি সাকারা—সগুণা। বাঙ্গালী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে হৃদয়-সিংহাসনে যে মূর্ত্তি গড়ে, ভক্তিপুষ্পে, প্রীতি চন্দনে যাঁহার পূজা করিয়া আপনার প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে, সেই মূর্ত্তিই সাধক হৃদয়ের বাহির করিয়া সাকার ভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া পূজা করে, ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব, ইহাই হিন্দুর কৃতিত্ব, আর কোনও স্থানে ইহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া হিন্দুর প্রতিমা-পূজা অতুলনীয়।

হিন্দুসাধক অতি গোপনে হৃদয়সিংহাসনে মনোময়ীর প্রাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যখন পূজা করে, তখন সে বড়ই স্বার্থপর, তাহার সে আরাধ্য মূর্ত্তি আর কাহাকেও দেখাইতে তাহার প্রাণ চায়, তখন সে স্বার্থপরতার সহিত বলে :—

আদর করে হৃদে রাখি আমার আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
কেবল রসনা রে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হতে দিয়োনাকো,
জ্ঞানের প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে।

ভক্ত যখন দরিদ্র, ভক্তিধনে যখন সে নিতান্ত দীন, যখন তাহার প্রাণের আশা একান্ত মেটে নাই, তখন সে প্রাণের প্রত্যেক পরতে, পরতে, হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে স্তরে সেই ভুবনভুলান—দীনশরণ রূপ জাগাইয়া রাখে, দিবারাত্র জাগিয়া জাগিয়া অন্তর মধ্যে অনিমিষলোচনে তাহাই দেখে আর ভক্তিগদ্‌গদস্বরে মা মা বলিয়া কোলের ছেলের মত ডাকিয়া ডাকিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনার অন্তরের প্রার্থনা সেই বিশ্ববন্দিনী ত্রিতাপহারিণী দুর্গতী-নাশিনী দুর্গার পদে জানায়, ভক্তবৎসলা সন্তানবৎসলা যখন ভক্ত সন্তানের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, অভয়দানে যখন তাহাকে কৃতার্থ করেন, তখন সেই আনন্দবিহ্বল সন্তান আর থাকিতে পারে না। একাকী উচ্চকণ্ঠে মা মা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, তখন সে হৃদয়ের মূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত মা মা রবে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলী দিতে অগ্রসর হয়, ইহাই হিন্দুর সাকার মূর্ত্তি, ইহা কি কাল্পনিক, না হৃদয়ে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তবে বাহ্যজগতে তাহার সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রকাশ? দেবগণ নিজের শক্তি সমন্বয়ে এই দুর্গা শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সাধক এই শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া, হৃদয়-সিংহাসনে বিশিষ্টরূপে স্থাপন করিয়া সাধারণের হিতের জন্য এই সাকার মূর্ত্তির পূজার বিধান করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি চিরদিন এ দুর্লভ আরাধ্য মাতৃমূর্ত্তির পূজা না করিয়া থাকিতে পারে? কর বাঙ্গালী ভক্তিপ্রাবল্যে, প্রার্থনা সাফল্যে বিশ্বশক্তির আধারভূতা মায়ের এ প্রতিমা পূজায় ব্রতী হও, নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্যে দেবীর আরাধনা কর, জাঁক জমক হউক আর নাই হউক, মায়ের ছেলে, ছেলের মত তারস্বরে ডাকিয়া ভক্তি-অশ্রুসিক্ত হইয়া বল, "প্রসীদ পরমেশ্বরী, ত্রাহি দুর্গে" তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইবে, শক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমরা জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। শক্তির সেবক তোমরা, অসক্ত কিসে? বরাভয় হস্তে মা তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আজ প্রপন্ন শরণাগত হইয়া বল—

শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে।

বল ভাই—

ভগবতী ভয়চ্ছেদে শক্তিভূতে সনাতনী।

এই আধিব্যাধি-প্রপীড়িত জগতে মায়ের কৃপা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না, তোমরা সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইবে।—সম্পাদক।

প্রাক্তনের ফল।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানী চ সুখানী চ।"

মালতীপুর গ্রামের হারাধন চক্রবর্ত্তীর কন্যা নির্ম্মলা এবং ভবতোষ চৌধুরীর কন্যা বিমলা বাড়ীর সন্নিহিত বালিকা-বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন করিত। নির্ম্মলা দরিদ্রের কন্যা, বিমলা বিপুল বিভবশালী ধনাঢ্যের কন্যা হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। বিমলাদের প্রাসাদতুল্য উচ্চসৌধের পার্শ্বেই নির্ম্মলাদের জীর্ণ পর্ণ-কুটীরখানি অবস্থিত ছিল। সুতরাং নির্ম্মলা একাকিনী বিমলাদের বাটীতে, অথবা বিমলা নির্ম্মলাদের বাটীতে নির্ভয়ে যাতায়াত করিত। নির্ম্মলা মেয়েটি বড় লক্ষ্মী;—দেখিতেও সুন্দরী, স্বভাব-চরিত্রও অতিশয় নির্ম্মল। সে সবেমাত্র দ্বাদশবর্ষীয়া, তবু পাকা গৃহিণীর ন্যায় গৃহকার্য্য করিয়া জননীর সহায়তা করিত। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পিতার ঠাকুর-পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিত; তাহা হইতে কতক পুষ্প নিজের শিবপূজার জন্য রাখিয়া দিত। শেষে ঘরের মেজ পরিষ্কার করিত, আঙ্গিনায় গোবর ছড়া দিত, আঙ্গিনা ঝাঁট দিত ও বাসন-পত্র মাজিত। গৃহকর্ম্ম শেষ হইলে পর, ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া পড়িতে বসিত, বৈকালে কোন কোন দিন সে রন্ধনও করিত। সে স্বভাবতই সুহাসিনী ও মিষ্টভাষিণী।

আর বিমলা? বিমলা দেখিতে যত সুন্দর, তার গুণ তত নয়। সে ধনীনন্দিনী, আত্মসুখান্বেষিণী, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী বালিকা। সে সর্ব্বদাই আপনার দেহপারিপাট্যে ও বেশ-বিন্যাসে ব্যতিব্যস্ত। সে গৃহকর্ম্ম কিছুই করিত না, কেবল নিত্য নূতন সাজে সুসজ্জিতা হইয়া সুনীতি, সবলা ও নির্ম্মলাদের বাড়ীতে বেড়াইয়া ফিরিত, ধনী নন্দিনী বলিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না কিন্তু নির্ম্মলা মাঝে মাঝে বলিত, "দেখ ভাই বিমলা। বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী, পাচক-পাচিকা থাকিলেও নিজের সমস্ত কার্য্য শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেন না, লোকের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না।" বিমলা প্রিয়সখীর এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-বাণী হাসিয়াই উড়াইয়া দিত।

নির্ম্মলা ও বিমলা প্রায় সমবয়স্কা, উভয়ের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। কন্যার বিবাহ লইয়া হারাধন চক্রবর্ত্তী ও ভবতোষ চৌধুরী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভবতোষ বাবু মেয়ের বিবাহের জন্য বেশী বেগ পাইলেন না। কারণ তিনি অতুল বিভবশালী। জমিদার-কন্যার বরের অভাব কি? ভবতোষ বাবু শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক নবীন যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

আর হারাধন বাবু? তিনি বড় নিরুপায়ে পড়িলেন। হারাধন বাবু অতি দরিদ্র, তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই যে, ভবতোষ বাবুর ন্যায় বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অতি বিচিত্র। তাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে? ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত। একদিন পল্লীগ্রামের জনৈক বিদ্বান যুবক নির্ম্মলাকে দেখিতে আসিল। পুষ্পাভরণা পার্ব্বতীর মত সেই নিরাভরণা বালিকার গৌরকান্তি দেহের নব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবক মুগ্ধ হইল। নির্ম্মলার সেই অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখী শিশিরসিক্ত গোলাপ-কলিকা-লাঞ্ছিত বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্য-জ্যোতি হেরিয়া, সেই নিতম্বচুম্বি-কৃষ্ণকুঞ্চিত চিকুরগুচ্ছের লহরী-শোভা দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। যুবক হারাধন বাবুর কাছে, তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিল। হারাধন বাবু অতি আনন্দের সহিত যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে অতি ধুমধামের সহিত বিমলা ও নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর উভয়ে শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল।

(২)

আশ্বিন মাস। শরতের শ্যামল-সৌন্দর্য্যে বসুন্ধরা এক অভিনব আনন্দ-হিল্লোলে উল্লসিতা। লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে, আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্রই এক নবীন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেফালীফুলগুলি নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে। কাননে কাননে অজস্র কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেই ফুটন্ত ফুলের উন্মাদ সৌরভ বুকে লইয়া ধীর-সমীর ঝির্ ঝির্ করিয়া নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। আনন্দময়ী মা আসিতেছেন; নিরানন্দময় বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দ বিলাইতে—সুখশান্তি দিতে—পবিত্র শরৎকালে এই দুঃখ-তাপ-পরিপূর্ণ ধরাতলে দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী আসিতেছেন। তাই সমস্ত বিশ্ব আনন্দে উৎফুল্ল! আনন্দে মাতোয়ারা!

এ হেন আনন্দের দিনে পিতামাতার আদরিণী কন্যা নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। স্নেহময়ী জননী সুদীর্ঘ দিবস পরে স্নেহের কন্যাকে দেখিতে পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। ছোট ভাইটি দিদিকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি! আর তোমায় কোথাও যাইতে দিব না।"

নির্ম্মলা বালকের সেই পুষ্পপুটতুল্য রক্তাধরে একটি মধুর চুম্বন দিয়া বলিল, "না ভাই! আমি আর যাইব না।" বালকের সুন্দর মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

নির্ম্মলা জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! ও-বাড়ীর বিমলা আসিয়াছে?"

জননী বলিলেন, "হাঁ আসিয়াছে! বিমলা শ্বশুরবাড়ী গিয়া মাত্র দু'মাস ছিল; সেখানে গিয়া সে কোন কাজকর্ম্ম করিত না, সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া-বিবাদ করিত, শেষে কাঁদিয়া কাটিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাপের বাড়ীতেও ভাই-বৌদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে।"

নির্ম্মলা। আমি শুনিয়াছি, বিমলার শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-দেবর খুব ভালমানুষ।

জননী। তাহারা ভাল হইলে কি হইবে? কথায় বলে, আমি ভাল ত জগত ভাল, আমি কাল ত জগত কাল। বিমলা আসিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর নামে কত রকম কুৎসা করিয়াছে। তাঁহারা না কি বিমলাকে খাইতে পরিতে দেয় না, সর্ব্বদা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করে ইত্যাদি কত রকম বলিয়াছে।

নির্ম্মলা। তাহা হইলে দেখিতেছি, বিমলার ভবিষ্য-জীবন বড়ই দুঃখময়।

জননী। শুনিয়াছি, বিমলার স্বামী না কি আবার বিবাহ করিবে।

নির্ম্মলা। এ কথা বিমলা জানে?

জননী। হাঁ, সে নিজেই এ কথা বলিয়াছে। সে সব কথা এখন থাক্, হাত পা ধুয়ে দুটো খেয়ে নে মা!

নির্ম্মলা। আমি অস্নানে খাই না মা!

স্নেহময়ী জননী স্নেহের কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কয়দিনের মধ্যে এতই হইয়াছিস? মা লক্ষ্মী আমার! তবে খোকাকে সঙ্গে নিয়ে যা, নদী হইতে স্নান করে আয়।"

"যাই মা।" এই বলিয়া নির্ম্মলা ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেল। এদিকে স্নেহময়ী জননী স্নেহের কন্যার জন্য সযত্নসঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী বাহির করিয়া থালা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। আহা, মাতৃস্নেহ কি মধুর!

(৩)

বৈকালে নির্ম্মলা বিমলাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। বিমলা তখন সুসজ্জিত কক্ষের স্বচ্ছদর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিতেছিল।

নির্ম্মলা আসিয়া ডাকিল, "বিমলা! ভাল আছিস্ ভাই!"

বিমলা। কে? নির্ম্মলা যে, কখন আসিলি ভাই?

নির্ম্মলা। সকালবেলা আসিয়াছি।

বিমলা। বেশ! এখানে আসিয়া বস।

নির্ম্মলা কক্ষে গিয়া সুকোমল দুগ্ধফেণনিভ শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করিল। বিমলা বলিল,—"ভাল আছিস ত?"

নির্ম্মলা। ঈশ্বরের কৃপায় ভালই আছি।

বিমলা। তোর শ্বশুরের সাংসারিক অবস্থা কেমন?

নির্ম্মলা। অস্বচ্ছল নয়—কোন রকমে চলিয়া যায়।

বিমলা। তোর স্বামী তোরে ভালবাসে কেমন?

নির্ম্মলা। সে বিষয়ে ভগবানের বিশেষ দয়া আছে।

বিমলা। তোর শ্বশুর শাশুড়ী কেমন? তাঁরা তোরে আদর-স্নেহ করেন ত?

নির্ম্মলা। তাঁরা খুব ভাল—নিজের মেয়েব মত আমায় স্নেহাদর করেন।

বিমলা। কই, তোর শরীরে কোন অলঙ্কারপত্র নাই ত? তাঁরা কেমন ধারা তোরে আদর করেন?

নির্ম্মলা। সংসারের খরচ বেশী, কুলাইতে পারে না—তাই দেন নাই, সময় হইলে দিবেন। আচ্ছা ভাই! তোর শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন? তাঁরা তোরে আদর করেন ত? তোর স্বামী তোরে ভালবাসেন ত?

বিমলা। না,—তাঁরা কেহই আমাকে দু চক্ষে দেখিতে পারেন না, সদাই লাঞ্ছনাগঞ্জনা করেন।

নির্ম্মলা। সে কি ভাই! তুই যদি তাঁদের কাছে বিনীতা হ'স, শ্রদ্ধাবতী হ'স, সেবাকারিণী হ'স, তবে তাঁরা তোর প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন কেন? ভালবাসায় বনের পশু বাধ্য হয়, আর ওরা ত মানুষ—শুধু মানুষ নহে, যাঁরা তোর চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়, তাঁরা তোরে আদর না করিবেন কেন? বোধ হয়, তুই সংসারের কাজকর্ম্ম করিস না, স্বামীকে আদরযত্ন করিস না, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা করিস না, তাই তাঁরা তোকে দেখিতে পারেন না।

বিমলা। সেবা করিব? কেন, কিসের জন্য? আমি কি তাহাদের ঝি না দাসী? বুড়াবুড়ীর সেবা করিব! আমার সেবা কে করে?

নির্ম্মলা। ছি ভাই! অমন কথা বলিস না, শ্বশুর-শাশুড়ী পিতৃমাতৃতুল্য পূজনীয়, তাঁদের প্রতি রাগ, দ্বেষ, অসূয়া করা কি উচিত? জনকমহিষী সীতাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার কালে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিয়া সুমতি,
রাগ-দ্বেষ-অসূয়া না করো কা'রো প্রতি।"

যাঁহারা স্বামীর গুরু—স্বামীর পূজনীয়, তাঁহারা স্ত্রীর গুরু—স্ত্রীর পূজনীয় না হইবেন কেন? তোর স্বামী যাঁহাদের দাস, তুই তাঁহাদের দাসী নস্ কিসে? নারীজাতি চিরপরাধীনা, পরের ঘরে পরকে আপন করিয়া চিরজীবন বাস করে। নারীর স্বাধীনতা ভাল নয়, পরার্থে আপনার সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দেওয়াই স্ত্রী-জীবনের কর্ত্তব্য।

বিমলা। তা' আমি পারিব না ভাই! আমি বেশ ভাল আছি।

নির্ম্মলা। চিরদিন এমনি ভাল যাইবে না? পিত্রালয়ের সুখ কয় দিনের জন্য? যা বোন! শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া গিয়া পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ী ও

স্বামীর পদসেবা করিয়া নারীজন্ম সার্থক কর গে। দেখ ভাই! শাস্ত্রে আছে,—"যদি কোন স্ত্রী তেত্রিশ কোটি দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া কায়মনোবাক্যে স্বামী-সেবা, স্বামী-পূজা করে, তবে তার সদ্গতি হয়।

বিমলা। আমি সদ্গতিও চাই না, পরের দাসীও হইব না।

"কিন্তু ভাই! মনে রাখিস, 'এ সুদিন চিরকাল র'বে না সমান।' সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আজ তবে যাই" বলিয়া নির্ম্মলা চলিয়া গেল। বিমলা বেশ-বিন্যাসে রত হইল।

(৪)

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসরের আবর্ত্তনে জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? এই পাঁচটি বৎসরের মধ্যে কত সুখের সংসার ছারখার, কত দুঃখের সংসার সোণার সংসারে পরিণত হইয়াছে। কত হৃদয়ের শান্তি গিয়াছে, কত মরুময় হৃদয় শান্তিসিক্ত হইয়াছে। কত উচ্চ নীচ, কত নীচ উচ্চ হইয়াছে। কত ধনী দরিদ্র, কত দরিদ্র ধনী হইয়াছে, কে তাহার গণনা করে?

এই পাঁচটি বৎসরের মধ্যে বিমলা পথের ভিখারিণী হইয়াছে। সে স্বাধীনতার আশুসুখলাভাশায় যৌবন-সুলভ-চাপল্যে আত্ম-অহঙ্কারে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতারা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বিমলা নিরুপায় হইয়া শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু সেখানেও তিন মাসের বেশী থাকিতে পারে নাই।

আর নির্ম্মলা? নির্ম্মলা এখন বড় সুখিনী! নির্ম্মলার গুণে তাঁহার শ্বশুরের ক্ষুদ্র সংসারটি বিরাট সংসারে পরিণত হইয়াছে। সে এখন সেই সোণার সংসারের লক্ষ্মী গৃহিণী! এ জগতে যাহা পাইলে হিন্দুনারী সুখিনী হয়, নির্ম্মলা সেই সকলেরই অধিকারিণী হইয়াছে। দেবতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ী, স্নেহময় স্বামী—রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য—নির্ম্মলার নাই কি?

সুখের উপর আরও সুখ! নির্ম্মলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া, শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর আনন্দ আরও বর্দ্ধন করিল। নবজাত শিশুর অসামান্য রূপচ্ছটা ও কচি মুখের মধুরহাসি দেখিয়া সকলেই নির্ম্মলাকে অত্যধিক ভালবাসিতে লাগিল।

ক্রমে দিনে পর দিন অতিবাহিত হইয়া খোকার অন্নপ্রাশনের দিন নিকট-বর্ত্তী হইল। পৌত্রের শুভ অন্নপ্রাশন কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য নির্ম্মলার শ্বশুর মহাশয় পুত্র ভবেশচন্দ্রকে বিরাট আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। একান্ত বাধ্য পুত্র ভবেশচন্দ্র পিতার আদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন।

আজ খোকার অন্নপ্রাশন, বাড়ীতে অনেক জন-সমাগম হইয়াছে। বড় লোকের ছেলের অন্নপ্রাশনের কথা শুনিয়া অনেক দুঃখী কাঙালী আসিয়াছে। নির্ম্মলার শ্বশুর ও স্বামী সহস্তে নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। এদিকে অন্তঃপুরে শাশুড়ী, বধূও অন্নদানে বিরতা নহেন। আহা! কি নির্ম্মল পূত দৃশ্য!

সকলের আহারাদি শেষ হইলে পর, অপরাহ্নে দুঃখী, কাঙালী বিদায় করা হইতেছিল। একটা সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে কাঙালিদিগকে রাখিয়া একটি দ্বার দিয়া তাহাদিগকে একে একে বাহির করা হইতেছিল ও প্রত্যেককে একটি টাকা এবং একখানি করিয়া বস্ত্র প্রদান করা হইতেছিল।

নির্ম্মলা তখন খোকাকে কোলে করিয়া দ্বিতলের বারান্দার চিকের আড়ালে বসিয়া নীচের কাঙালী বিদায় দেখিতেছিল। সহসা তাহার দৃষ্টি এক মলিন বেশধারিণী কাঙালিনী উপর পতিত হইল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া দাসীর দ্বারা উক্ত কাঙালিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দাসী গিয়া সেই কাঙালিনীকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিল।

নির্ম্মলা কাঙালিনীকে একটি ছোট চৌকীতে বসাইয়া বলিল "তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ?" "না" বলিয়া কাঙালিনী বিস্মিতনেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নির্ম্মলা বলিল, "আমি তোমায় চিনিতে পারিয়াছি;—তুমি না আমার সেই বাল্যসহচরী বিমলা? বিমলা, বোন! আজ তোর এই দশা?"

কাঙালিনীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সে দুই হাতে নির্ম্মলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"বোন! এ কাহারও দোষ নয়; ইহা আমার প্রাক্তনের ফল।" ঠিক সেই সময় অদূরে কে গাহিয়া উঠিল,—

"দোষ নয় গো মা,
আমি স্ব-খাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

আষাঢ়ের প্রশ্নোত্তর।

শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী, কলিকাতা। ইনিই কেবলমাত্র আষাঢ় মাসের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস, পাবনা, ২য় প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, আমরা তাহা সাদরে মুদ্রিত করিলাম।

১ম প্রঃ উঃ—

বি-শব্দে পক্ষী, তাহাদের রাজা গরুড়, গরুড়ের প্রভু বিষ্ণু, তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণুর পুত্র মদন, মদনের শত্রু শিব। ইঁহার অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়।

২য় প্রঃ উঃ—

মোহ, মায়া, রাগ, মদ, মল, কাম, দম্ভ এবং দ্বেষ।

৩য় প্রঃ উঃ—

পবননন্দন ভীমপত্নী রন্ধনকর্ম্মে পটীয়সী দ্রৌপদী।

৪র্থ প্রঃ উঃ—

(ইনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে) মাদী ছাগল।

৫ম প্রঃ উঃ—

নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠাইয়াছেন।

আত্মপর।

রাবণের ভাই হয়ে রক্ষ বিভীষণ
ভ্রাতৃবৈরী শ্রীরামের প্রিয় বন্ধুবর,
অধর্ম্মেরে করে যেবা জীবনে বরণ
ধ্বংস তার পরিণতি বন্ধু তার পর।
ধর্ম্মে যেবা লক্ষ্য করি রামের মতন
আচণ্ডাল সর্ব্বজীবে প্রেম করে দান,
পশু পক্ষী হয় তার যেন পরিজন
তার তরে হয় শিলা নীরে ভাসমান।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম, কাব্যনিধি, ময়মনসিংহ; আষাঢ়ের ৫ম প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠাইয়াছেন।—

সাধনা।

পাষাণ পরাণে, যদিও ঠেলেছ মোরে, ওগো চরণে তোমার,
কাঁদাইতে মোরে, যদিও ঝরেনি মাত্র ওগো বিন্দু অশ্রুধার।
কল্পনা কামনা মম, যদিও চরণে, ঠেলিয়ে করিলে বিফল,
যদিও নিয়েছ প্রাণ, দিয়ে প্রতিদান, ওগো শুধু আঁখিজল।
পারি না ভুলিতে মম, তোমার পরাণ, এমনি সাধনা তোমার,
অবিরত গাহে কণ্ঠ, অতীব করুণ, তুমিই ওগো আমার।
সাধনা কামনা সকলই তুমি, ওগো তুমিই স্বপন,
দেখিতে চাই তোমারে আমি, নিয়ে আঁখি দু'টী ফুরালে জীবন।

ভাদ্রের প্রশ্নোত্তর।

শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত শর্ম্মা, সিলেট। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ, নদীয়া। প্রথম ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। নীহারবাবুর কবিতায় লিখিত প্রথম প্রশ্নটি মুদ্রিত করিলাম। শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী, কলিকাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস, পাবনা। ১ম প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ৩য় প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাঁতরা, ব্রজলালকে ১ম প্রশ্নের উত্তর কবিতায় দিয়াছেন, কিন্তু ৩য় প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয় নাই। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চন্দ্র, জলপাইগুড়ী। ১ম ও ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয় নাই।

১ম প্রশ্নের উত্তর।

(মোর) তিনটী আখরে　　নামটী 'চাদর,
বাবুরা ব্যবহার করেন পান
প্রথম আখর,　　'চা'টুকু দুবেলা,
যাক্ না দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ।

আমারি প্রথম, দুইটী শবদে,
প্রথমেরে যদি করহ দান;
চন্দ্র বিন্দু (ঁ), 'চাঁদ' হয়ে আমি
ডাকাইয়া দিব রূপের বাণ।
আমারি প্রথম শেষের শবদ,
'চার' লাভ আসে মৎসগণ,
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে, 'দর' নাহি হলে,
বেচা কেনা নাহি হয় কখন;
দ্বিতীয় তৃতীয়, শবদে 'আ' স্বর,
যোজনা করহ হে সুধীগণ;
'আদর' লভিয়া, আহ্লাদ মাঝে,
হাসিবে পরাণ হাসিবে মন।
পুনঃ অই রূপ, প্রথমে 'উ' স্বরে,
'উদর' রূপেতে বর্ত্তমান;
সব জীবদেহে, । দেখহ ভাবিয়া,
মহীতলে মোর কত না মান॥

২য় প্রশ্নের উত্তর।—

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রণজয়জনিত দর্প চূর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধের নিকট লইয়া যান। রামচন্দ্র সাগরবন্ধনের জন্য বানরের সাহায্য লইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুন অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। হনুমান তখন সেখানে আসীন ছিল, ক্রোধে কম্পিত হইয়া সে অর্জ্জুনকে অন্য কোন সহজ পথ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি বাণে বাণে সেতু করিয়া দিতে পারি। হনুমান কহিল, আমি তাহার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য ৩ বার তাহাতে ঝম্প দিব; যদি অটুট থাকে, তবেই বুঝিব, তুমি বীর। অর্জ্জুন বাণে বাণে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিপদ গণিয়া কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেতু পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রহিলেন। হনুমান তাহাতে লাফ দিল। সেতু অটুট রহিল, কিন্তু তাহার ভারে কূর্ম্মের মুখনিঃসৃত রক্তে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অর্জ্জুন এতক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া ছিলেন, এক্ষণে হনুমানের সেই পরীক্ষা শেষ হইলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সাগর জলের রক্তবর্ণ ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ আমূল বর্ণনা করিলে

অর্জ্জুন বুঝিতে পারিল, কৃষ্ণ চালক এবং স্বয়ং তিনি শ্রীকৃষ্ণহস্তে যন্ত্রমাত্র। শ্রীকৃষ্ণই রামের অবতার (নারায়ণ), সুতরাং কূর্ম্মরূপধারী তাঁহার পৃষ্ঠে হনুমান লাফ দিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।—ছিপকুশী বা কুশাকুশী (তাম্রনির্ম্মিত জলাধার) বড় খানার উদরে—ভিতরে জীবন অর্থাৎ জল থাকে, আর ছোট খানা বড় খানার ভিতরের জল নষ্ট করে অর্থাৎ ঐ জল ছোট খানার সাহায্যে ফেলিতে হয়। মুসলমানেরা ঐ সব ব্যবহার করে না, হিন্দুদের পূজাদিতে সর্ব্বদাই লাগে।

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর *।—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে মস্তক, গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞানের মতে ঐ সকল মুণ্ডন করিলে শরীরের তেজ হ্রাস পায় এবং শীত ও রৌদ্রাতপে কষ্ট হইতে থাকায় স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, এ জন্য আমাদের প্রাচীন মুনি, ঋষিরা ও আধুনিক সন্ন্যাসীরা মস্তক, গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতেন না এবং করেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—

পদক ও পুরস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক — প্রবন্ধের বিষয়।

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক) বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ।

---

* এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত পরে জানাইব।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারীচিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা' চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানভাগ।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম ও ১০ম বিষয় মহিলা-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পুরস্কার প্রবন্ধ ৩১ চৈত্র মধ্যে পরিষৎ সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা, ২০ কার্ত্তিক।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা, ২৪ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

অনুকরণ।

এ সংসারটা কি? ইহা একটা প্রহেলিকা। এ রাজ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা, আমরা সংসারে আসিলেই আমাদিগকে পূর্ব্বের সব ভুলাইয়া রাখে। দার্শনিকদিগের ব্যাখ্যা এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যস্থলে থাকিয়া মহামায়া জীবাত্মাকে পরমাত্মজ্ঞান-সম্বন্ধে সব ভুলাইয়া রাখেন। তাই অবস্থাটা এই দাঁড়ায় যে, আমরা যেন এ সংসারে নবাগত অতিথি,—আত্মাকে সর্ব্বজ্ঞই বলুন, আর যা'ই বলুন, দেহ আশ্রয় করিলেই এই সংসারটা আমাদের নিকট যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন রাজ্য বলিয়া বোধ হয়। কবি তাই বলিয়াছেন,—"মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত।" এই "সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে" যখন কিছুকাল ভ্রমণ করিতেই হইবে, তখন অবশ্যই আমাদিগকে এখানকার পথ ঘাটের কিছু পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। নিজে যখন কিছুই জানি না, তখন বাধ্য হইয়াই অপরের নিকট হইতে শুনিতে হইবে;—অপরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তদনুযায়ী চলিতে হইবে। মোটের উপর যাঁহারা প্রাচীন, যাঁহারা এ রাজ্যের পথ ঘাট চিনেন, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। ইহারই নাম 'অনুকরণ'। অনু (সদৃশ) + কৃ (করা) + অনট্, ভাববাচ্যে = অনুকরণ, অর্থ অন্যের সম্পাদিত কার্য্য দেখিয়া তদ্রূপ করণ। "অনুকরণ" একটা নূতন কিছু নহে। ইহা একেবারে সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর যখন সংসারটাকে মায়াময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এ রাজ্য যখন সকলের নিকটই অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, তখন প্রত্যেককেই যে অনুকরণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সকলেরই যখন এক অবস্থা, তখন সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছিল, তাহা নিয়া মতভেদ হইতে পারে। তবে মোটা-মুটী ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তিনিচয়ের সাহায্যে নানা আলোচনার পর নানা জনে নানা পথ আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন,—অথবা ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার হইতেই প্রথম অনুকরণ আরম্ভ হয়। সে যাহা হউক, অনুকরণ যে প্রত্যেককেই করিতে হয়, ইহা স্বীকার করিলেই

হইবে। তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সকলেই যখন অনুকরণ করে, তখন সময় সময় ধর্ম্মপথ বা পার্থিব জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা বিষয় আবিষ্কৃত হয় কোথা হইতে? অনুকরণের মূলস্থান হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল, কেবল তাহা ছাড়া, নূতন পাওয়া যায় কোথা হইতে? এ প্রশ্নের মীমাংসা দুই এক কথায় হইবার নহে। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মনে করুন. অনুকরণ সাহায্যে কোনও একটা বিষয় যতদূর জানা যাইতে পারে, ততদূর জানা গেল: তারপর ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধি ইত্যাদি বৃত্তি সমূহের সাহায্যে যথেষ্ট চর্চ্চার দ্বারা সেই বিষয় সম্বন্ধে আরো অধিক জানা যাইতে পারে; জগতের ইতিবৃত্ত হইতে ইহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কোন্ কার্য্য কিরূপে করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, এবং সেই অনুকরণে আমাদের জীবন গঠিত করিতে পারি। হিন্দুদের পুরাণ ও ইতিবৃত্ত, ইহাতে যথেষ্ট আদর্শ অনুকরণীয় চরিত্রের বর্ণনা আছে।

অনুকরণেই উন্নতি। প্রথমতঃ অনুকরণ করিয়া মস্তিষ্ক চালনাদ্বারা, তাহা হইতে নানা বিষয় শিখিতে পারা যায়। মানবের পক্ষে অনুকরণ ব্যতীত কিছুই হয় না। একটা নূতন কিছু করিতে গেলেই কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়ে; যেমন,—

"গোঁপগুলি সব ছিঁড়, আর নাকগুলি সব ছাঁট,
পাগুলি সব উপরে দিয়ে, মাথা দিয়ে হাঁট।"

মোটেই অনুকরণের সাহায্য না লইয়া একটা নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিতে গেলেই পাগল সাজিতে হয়। অনেকের বিবেচনায় হয় ত ইহাতে স্বাবলম্বনের মাহাত্ম্য লঘু করা হইল বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু লঘু না হইয়া বরং স্বাবলম্বনের মাহাত্ম্যটার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এত কথা আলোচনার প্রয়োজন এ স্থলে নাই।

জন্মগ্রহণের পর সর্ব্বপ্রথম অনুকরণস্থল—মাতা। এ সংসারে মাতার সঙ্গেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম পরিচয়। যাহাতে এই প্রথম পরিচয়ে ভুল না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক মাতারই সত্যজ্ঞান থাকা উচিত। মাতার নিকট হইতে যাহা অনুকরণ করা যায়, যাহা শিখা যায়, তাহা আর ভুলিবার নহে। মাতা যদি ভাল কাজ করেন, তাহা হইলে সন্তানও তাহাই শিক্ষা করে। সুতরাং সন্তানের উন্নতি অবনতি মাতার উপর বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করে।

রূপরসাদি সম্ভোগ বা অনুভব করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। যতই আমরা বড় হইতে থাকি, এ জগতে স্থিতিকাল আমাদের যতই বাড়িতে থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম যতই বিকাশ পাইতে থাকে, ততই নানাদিকে নানা জিনিষের সহিত আমরা পরিচিত হইতে থাকি; তখন জানিবার ইচ্ছা আমাদের বলবতী হইতে থাকে। ক্রমে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত পরিচিত হই ও তাহাদের অনুকরণ করিতে থাকি। এইরূপে ক্রমে গ্রাম, দেশ, জাতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হই, এবং সব জানিবার—শিখিবার জন্য সকলের অনুকরণ করিতে থাকি। ঈশ্বর-সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই একটা সম্বন্ধ আছে, তাই পরস্পর একটা আকর্ষণ আছেই। চতুর্দ্দিকস্থ সমস্তই আমাদিগকে আকর্ষণ করে,—তাই দিন দিন আমাদের মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং সেই জন্যই চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা অনুকরণ করিয়া থাকি।

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

অতএব যাহাদের সংসর্গে থাকিয়া, যাহাদের অনুকরণ করিয়া, আমাদের জীবন গঠিত করিব, তাহাদের সৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সমাজ বা জাতি সৎ বা ভাল না হইলে তাহাদের অনুকরণে অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

সংসার বৈচিত্র্যময়,—

"সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।"

পৃথিবীর গতি এবং পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদী ইত্যাদির অবস্থান ও প্রাকৃতিক আরো নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্নস্থান বিভিন্ন রকমের। ঐ সকল কারণে লোকের রুচিভেদ; তাতে আবার,—

"কালের অধীন নর অবস্থার দাস,—

ইত্যাদি কারণে দেশ-কাল-পাত্রভেদ মানিতেই হয়, এবং আবহমান কাল হইতে সমাজপ্রিয় মানবের দেশাচার বা লোকাচারও মানিতে হয়। আবার ভালমন্দ দুইয়ের মিশ্রণেই জগৎ। তার মধ্যে আবার এ জগতে জানিবার, শিখিবার, করিবার এত অধিক আছে যে, তাহা শান্ত মানবের পক্ষে একাধারে সব অর্জ্জন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইত্যাদি কারণে জগতের সমস্তই আমাদের অনুকরণীয় নহে।

"অনন্ত পারং কিল শব্দ শাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বু মধ্যাৎ॥"

দেশ-কাল-পাত্রাদি ভেদে অনুকরণেরও ব্যতীক্রম হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশের লোকের মত গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া সমস্ত শরীর বিশেষরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া নিদ্রা যাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর অনুকরণীয় নহে।

"যস্মিন্ দেশে যদাচার পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।"

ইহাও মানিতে হয়। উল্লিখিত কথায় কেহ মনে করিবেন না যে, মুসলমানে হিন্দুর বা হিন্দুতে মুসলমানের, ভারতে ইংলণ্ডের অথবা ইংলণ্ডে ভারতের অনুকরণীয় কিছুই নাই। অন্যের মধ্যে যাহা ভাল পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের ছাঁচে তাহা গড়িয়া তুলিতে হয়;—ইহাই নীতিসঙ্গত, শাস্ত্রসঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কার্য্য। পশু পক্ষীতেও অনুকরণীয় পাওয়া যায়।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপিকাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মন্দের ভিতরেও ভাল জিনিষ থাকিলে, তাহা গ্রহণ করিবে;—তাহাতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু একথা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, অনুকরণ করিতে গিয়া যেন বিদেশী ছাঁচে গঠিত না হই; যেন মন্দটা অনুকরণ না করি।

আজ-কা'ল বাঙ্গালী প্রায়ই ইয়ুরোপীয় ভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে কতকগুলি গর্হিত অনুকরণ করা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে সমস্তেরই বিভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে কে? হায়! অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালী কি মূঢ়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট থাকিলেও এস্থলে বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

আমরা ভারতবাসী পূর্ব্বে যাহাই থাকি না কেন, বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই বলিতে হয় যে, প্রতীচ্যের জড়বিজ্ঞান আমাদের অনুকরণীয়। আদান প্রদানেই জগতের উন্নতি। অতএব বর্ত্তমানে আমাদের ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রতীচ্যের ও প্রতীচ্যের জড়বিজ্ঞান আমাদের, অনুকরণে উন্নতি

নিশ্চয়। কিন্তু এই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের হিন্দুত্ব ধর্ম্ম, জড়বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ঠিক রাখিতে হইবে—আর্য্যমহর্ষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে।—

"মহাজনো যেন গত স পন্থা।"

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।"

অনুকরণ কেবল মানবে নহে, পশু পক্ষীতেও দৃষ্ট হয়, বানর জাতি বেশ অনুকরণ করিতে পারে তোতা ইত্যাদি পক্ষীও বেশ অনুকরণ করিয়া বুলি শিখিতে পারে। বস্তুতঃ অনুকরণ-প্রবৃত্তি জগতের সকলেরই আছে।

শ্রীগিরিজাকান্ত শর্ম্মা।

হরিনাম।

(১৩২৬ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

উপসংহারে।

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং॥"

ভাই! 'হরি নামেরি মতন আর কি আছে রতন'? এ নামের মত যে আর কিছুই নহে, এমন মোক্ষফলপ্রদ—এমন অবিনশ্বর সম্পদ যে আর নাই! সংসারসুখমুগ্ধ বিষয়াসক্ত মূঢ় মন! এ অনিত্য সংসারচিন্তা ছাড়িয়া একবার 'হরি হরি' বলিয়া ডাক। 'যখন পাঁচ ভূতে মিলে, সকলি তোমায় ফেলে, কে কোথায় যাবে চলে, তার কি খবর রাখ?' মন! অবিরাম বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! প্রতিনিয়ত নাম করিতে করিতে সংসারজ্বালা দূরে যাবে—হৃদয় জুড়াইবে। হরিনামরূপ অমৃতনির্ঝরিণীর শীতল প্রবাহে মনের মলিনতা দূর হইবে, মন প্রেমানন্দে ভাসিবে।

মন! তুমিও হরিবোল বলিয়া প্রেমেতে গলিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে পারিলে না, তুমিও হরিনামে আত্মহারা হইয়া উন্মাদের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে পারিলে না, তবে তোমার উপায় কি?—উপায় আছে, নাম কর, 'হেলায় শ্রদ্ধয়া বা' যেমন করিয়া পার, অবিরত কেবলই নাম কর। অবিরাম বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! এইরূপে বারবার হরি বলিতে বলিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে। প্রাণে ভক্তির বাণ ডাকিবে। নাম করিতে করিতেই তাঁহার কৃপালাভ হইবে। ডাক মন! বারবার হরি হরি বলিয়া ডাক। কলিতে নামকীর্ত্তনই যে মুক্তির প্রধান উপায়। যথা:—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্ত তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুন একবার॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ;
জ্ঞানযোগ, কর্ম্মতপ আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি তিন উক্ত একসার॥ (শ্রীচৈ, চ, মৃ)।

ভাই! প্রাণ ভরিয়া অবিরাম হরিনাম কর। শ্রীহরিতে ও তাঁহার নামে কোন পার্থক্য নাই। ঐ দেখ, হরিভক্ত কবি প্রাণ খুলিয়া গাইতেছেন:—

"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ,
ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন,
আপনি শ্রীহরি॥"

নাম কর ভাই! নাম কর, মধুর হরিনামের প্রেম-বন্যায় বিশ্ব ভাসিয়ে দাও—হরিগুণ গানে এ নিখিল বিশ্ব পূর্ণ হউক। 'উঠুক এ হরিধ্বনি, গগনে-পবনে, বাজুক মঙ্গল শঙ্খ ভবনে ভবনে।' এ জগতের প্রতি গৃহ হরিনামের মধুর রবে মুখরিত হউক, বিশ্বকণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হউক, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি,
বল ভাই ধন্য হরি।

ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি।" (গীতাঞ্জলি)

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—"নামে রুচি ও বিশ্বাস করিতে পারিলে তবে আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করিতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্তশুদ্ধি হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে। সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাক্‌লে ভগবান লাভ হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ)।

কলিতে হরিনামই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। এ যুগে জ্ঞান বা কর্ম্মযোগের আর তেমন প্রয়োজন হয় না, একমাত্র ভক্তিযোগই মুক্তির স্বর্গসোপান। এ যুগে শুধু ভক্তিতেই শ্রীশ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রাণ ভরিয়া নিয়ত তাঁহার নাম কর, মুক্তি আসিয়া আপনি তোমার দ্বারে উপস্থিত হইবে—ভক্তের ভগবান আপনি আসিয়া তাঁহার ভক্তকে কোলে তুলিয়া লইবেন।

ভাই! তোমার শুদ্ধাভক্তির অভাব বলিয়া নাম করিতে বিরত হইও না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—

"জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হউক না কেন, তাঁর নাম কল্লেই ফল হবে। অমৃতকুণ্ডে যে কোনপ্রকারে হ'ক, একবার পড়্‌তে পার্‌লেই অমর হওয়া যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ)

নাম কর ভাই! নাম কর। হরিনাম করিতে করিতে তোমার প্রাণের গুপ্ত কক্ষে, হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যখন তোমার প্রাণের ঠাকুর আসিয়া উপনীত হইবেন, যখন আপনি শ্রীভগবান শ্রীহরি তোমার হৃদাসন আলো করিয়া বসিবেন, তখন তাঁহার অমিয় মধুর শীতল স্পর্শে তোমার অঙ্গ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, নাসিকা শ্রীভগবানের অঙ্গের সুপবিত্র পদ্মগন্ধে বিভোর হইবে, কর্ণ কৃষ্ণকথা—তাঁহার মধুর মুরলীধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইবে না, নয়ন সে মুরারীধারী শ্রীহরিবরূপ জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না, বিপুল পুলকে নিয়ত প্রেম-অশ্রু বিগলিত হইবে। তখন তোমার মানব-জন্ম সার্থক হইবে, ধন্য হইবে—জীবন মধুময় হইয়া যাইবে। তখন তুমি বিশ্বময় বিশ্বনাথের মোহন মূর্ত্তি—শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ

দর্শনে মুগ্ধ হইবে—বিভোর হইবে—স্বশরীরে স্বর্গবাসী হইবে। তখন তুমি তোমার সাধনার ধনের দর্শনে আত্মহারা হইয়া বিপুল হর্ষভরে গাইয়া উঠিবে,—

"অধরং মধুরং বদনং মধুরং বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং চলিতং মধুরংভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং।

তখন,—অন্তর ছিঁড়িয়ে শোণিত-ধারায়
বহিবে সদা প্রেম-অশ্রুধার;
মুছি যাবে ভোগ-আসক্তি-কালিমা
জাগিবে পরাণে বিভূতি তাঁহার।
তখন,—সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পূজিবে শ্রীহরি
নিয়ত হেরিবে অলকা মাধুরী;
নবীন আলোকে মধুর পুলকে
বাজিবে মরমে প্রেমের বাঁশরী।

তখন তুমি এ মনুষ্যদেহেই দেবতা হইয়া যাইবে। তাই বলি, ভাই! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! প্রাণ ভরিয়া সকলে সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যে নিয়ত হরি হরি বল। 'সবে পায় ধরি, ভজাইব হরি' এ অযোগ্য অধমের তেমন দৈন্য—তেমন সাধন ভজন, তেমন ক্ষমতাও নাই; এ দীন নিজেই যে নামের কাঙ্গাল! দুর্জ্জয় অভিমানের দাস! তোমরা প্রেমিক-ভক্ত—হরিনামের পাগল, সবে একবার হরি হরি বল; আমি তোমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া—হরিভক্তের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া 'হরিবোল বলিয়ে দু'বাহু তুলিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে' যেন পাগল হইতে পারি। বল ভাই সকল! সমবেত ভক্ত সাধকগণ! প্রাণ ভরিয়া সকলে সমকণ্ঠে এক-বার 'হরিবোল' বল। অহো! কি মধুর নাম! যে যেখানে থাক, প্রেমানন্দে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া এস; বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

"ওরে ভক্ত, ওরে পাগল, তোল্ রে ভক্তি-রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্ রে 'হরিবোল।'
মোহের ধাঁধায় আর যাবি না,
এমন নাম তুই আর পাবি না;

ভাবে ভোলা পরাণ খোলা, নামের তুফান তোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল।'
প্রেমেই যে তার চিত্ত ভরা, নাই কামনার রোল,
প্রেমেই যে সে আত্ম-ভোলা—নাই কো তাতে গোল ;
মানুষ হ'রে মানুষ হ',
প্রেমের কথা সদা ক',
ধরিস্‌ না রে যশ কিনিতে ভক্তি-বিটল খোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল।'
হরি ব'লে বাহু তুলে বাজিয়ে প্রেমের ঢোল,
গলা ছেড়ে নাম করিতে পড়ুক 'রগে' টোল।
মরণকালে নাম করিলে,
ভবের ভাবনা যাবে চলে,
ছাড়িস্‌ নে রে অন্তঃকালে প্রেমের মহাবোল
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল'।
শব-দেহটা কাঁধে করে, (সবাই) বল্‌রে 'হরিবোল'
শ্মশান-ঘাটে, আগুন-কাঠে প্রতিধ্বনি রোল—
ঘন ঘন হরিধ্বনি,
শুনায় সবায় নামের মণি—
শোন্‌ রে সবে কাণ ভরিয়ে প্রেমের মধুর রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল।'
কষ্ট হলে, প্রেমিক বলে—বল্‌ 'হরিবোল'
সুখের হলে প্রেমিক বলে বল 'হরিবোল'।
প্রেমিকের এ হরি বলা,
মুছিয়ে নে যায় মনের মলা,
ভুলিয়ে দিয়ে ভবের হাটের যতেক গণ্ডগোল !
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল রে 'হরিবোল।"

* এই কবিতাটি পূজ্যপাদ ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিরচিত ও ভারতবর্ষ হইতে উদ্ধৃত।—লেখক।

অভিমান।

(গল্প)

(১)

"এখন কেমন আছ?" বলিতে বলিতে একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা একটী রোগীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। রোগী বলিয়া উঠিল, "আমি যেমনই কেন থাকি না মলিনা, তাতে তোমার ত কিছু এসে যায় না। তুমি তোমার প্রাসাদ ছেড়ে দারিদ্রের এ কুটীরে এলে কেন? আমি ত তোমায় ডাকিনি।" অমল এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল, মলিনা কোন কথারই উত্তর দিল না, নীরবে অমলকে বাতাস করিতে লাগিল।

মলিনার অজ্ঞাতে তাহার দু-একটী অশ্রুবিন্দু অমলের গণ্ডস্থলের উপর পড়িয়া যাওয়ায়, অমল বলিয়া উঠিল, "কাঁদচো! কাঁদচো কেন মলিনা? তোমার ত কিছুরই অভাব নাই। তোমার বাপের অগাধ টাকা, প্রকাণ্ড বাড়ী, ঝী চাকর যথেষ্ট; তুমিই ত ঐ সবের একমাত্র অধিকারিণী। তোমার চোখে এ জল ত শোভা পায় না!" আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া মলিনা বলিল, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর। বেশী কথা কইতে ডাক্তার বাবু মানা ক'রে দিয়েচেন।" অমল চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল।

মলিনা খুব বড় লোকের মেয়ে। পিতা এখনও বর্ত্তমান। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির সেই একমাত্র অধিকারিণী।

অমলের যখন দশ বৎসর বয়স, তখন সে পিতৃমাতৃহীন হয়। তাহার পিতার বিশেষ কিছুই ছিল না! যাহা কিছু যৎসামান্য ছিল তাহা দশ ভূতে লুটিয়া লইল। দয়া পরবশ হইয়া মলিনার মাতা তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখেন। মলিনা তখন পাঁচ বৎসরের। মলিনার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অমলের সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। মলিনার পিতা অমলকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র স্ত্রীর অনুরোধেই তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। মলিনার মাতার আদর যত্নে সে একদিনের জন্যও মায়ের

অভাব বুঝিতে পারে নাই এবং কেবল তাঁহারই চেষ্টায় সে বি-এ পাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই অমলের দুর্গতির সীমা রহিল না। চাকর-বাকরেরা এতদিন গৃহিণীর ভয়ে কিছুই বলিতে পারে নাই, বরং অমলের জন্য তাহারা মাঝে মাঝে অনেক ভর্ৎসনা সহ্য করিতে বাধ্য হইত। এখন সুদে আসলে তাহার শোধ লইতে আরম্ভ করিল। মলিনার পিতার ত কথাই নাই। তিনি বেশ পাকে চক্রে অমলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এ বাড়ীতে তাহার আর স্থান হইবে না। অমল যে কিছুই বুঝিতে পারিত না এমন নহে। সে সমস্তই বুঝিত, কিন্তু কাহারও কোন কথা গায়ে মাখিত না। মলিনার মাতা মৃত্যুর সময় বলিয়া যান, "অমল, মলিনাকে দেখ, তার আর পৃথিবীতে কেউ রইল না।" মুমূর্ষের শেষ উক্তি স্মরণ করিয়া এখনও সে এ বাটী ছাড়িয়া যায় নাই। যখন তাহাকে অপমানের উপর অপমান সহ্য করিতে হইত, তখন সে এ বাড়ী ছাড়িবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিত; কিন্তু পরক্ষণেই মলিনার মুখ দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়া যাইত।

মলিনাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার পিতা অমলকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না এবং সেই জন্য পদে পদে নিজে ত অপমান করিতেনই, আবার চাকরগুলিকে দিয়াও অপমান করাইতেন; উপায় নাই ভাবিয়া সে নীরবেই রোদন করিত। অমলকে না দেখিয়া সে এক মুহূর্তও থাকিতে পারিত না। রাত্রে বাটি ফিরিতে দেরী হইলে সে অমলের প্রতীক্ষায় জানালার ধারে বসিয়া থাকিত, অমলকে আসিতে দেখিলে তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। অমলকে যখন তখন যা তা হুকুম করিত, অমলও শুধু হাসিয়া তাহার সমস্ত স্নেহ আবদার সহ্য করিত।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অমলের প্রতি বাড়ীর অত্যাচার ততই বাড়িতে লাগিল। এত অত্যাচার মলিনার সহ্য হইল না। অমলের মলিন মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণের ভিতর বড়ই ব্যথা লাগিত। সে বুঝিল, তাহার জন্যই অমলের এত কষ্ট। অমল যদি এ বাড়ী ছাড়িয়া যায়, তাহার অত্যন্তই কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু অমল ত অপমান হইতে রক্ষা পাইবে এবং সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করিতে পারিবে। তাহার মনোকষ্টের জন্য সে গ্রাহ্য করে না, অমলের সুখ হইলেই হইল, তাহাতেই তাহার সুখ। কিন্তু কি করিয়া সে অমলকে বাটী ছাড়িয়া যাইতে বলিবে। বলি বলি করিয়াও

তাহার বলা হইল না। সে কথা ভাবিলেই তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিত, হৃদয়ের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করিত। মলিনার এই 'বলি' 'বলি' ভাবটা অমল লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পায় নাই।

একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া অমল দেখিল, মলিনা কাঁদিতেছে। কেন কাঁদিতেছে. কি হইয়াছে, ইহার কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না এবং অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন ফল হইল না। অগত্যা এ সংবাদ তাহার পিতাকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিয়া অমল ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, তিনি সেই ঘরের দিকেই আসিতেছেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ অমল, তোমায় আমি বারবার এ বাড়ী ছেড়ে যেতে বলেছি, তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করনি। আমি আবার বলছি, তুমি কালই আমার বাড়ী ছেড়ে যাবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, আমার মেয়ে যে আমার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী. সে তোমার মত দরিদ্রের সঙ্গে মেলা-মেশা করে। কাল যদি তুমি না যাও, আমি দ্বারবানকে দিয়ে তোমায় বার করে দেব।" তিনি আর কিছুই না বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। অমল এতক্ষণ অধোবদনে দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ এ তিরস্কারের সে কোনই অর্থ বাহির করিতে পারিল না। মলিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "তুমি আজই এই মুহূর্ত্তে চলে যাও। এত অপমান সহ্য করে থাকতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি না পুরুষ মানুষ!" মলিনার কথা শুনিয়া অমল চমকিয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া কেবলমাত্র অস্ফুট স্বরে ডাকিল, 'মলিনা!' কিন্তু মলিনার নিকট হইতে কোনই উত্তর আসিল না। অমল দেখিল, মলিনা আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিয়া আছে। "তবে তাই হোক, মলিনা" এই বলিয়া অমল ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল—লইয়া গেল বুক-ভরা বেদনা আর অভিমান।

(২)

তাহার পর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। মলিনা হঠাৎ সংবাদ পাইল, অমলের অসুখ। মলিনার বাড়ী ত্যাগ করিয়া অমল একটী ছোট বাড়ীতে বাস করিতেছিল। সেখানে তাহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ না থাকায়, অসুখের সংবাদ পাইয়াই মলিনা তাহার দেওয়ানজীর সাহায্যে পিতার অজ্ঞাতে অমলের বাড়ী আসিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া

দিল, পিতার ভয়ে সে সেখানে দিন রাত থাকিতে পারিত না; মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা করিয়া যাইত। অমল কত বারণ করিত, সে শুনিত না। আজও সেইরূপ দেখা করিতে আসিয়া উল্লিখিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অমল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাইবার পর মলিনা আর আসিত না।

আরও তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে মলিনার পিতা মারা গেলেন। সমস্ত সম্পত্তির মলিনাই এখন অধিকারিণী হইল।

কাল তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মলিনা বৃদ্ধ দেওয়ানজীর সাহায্যে সমস্তই প্রায় বন্দোবস্ত করিয়াছে। বৈকালে দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, আপনি ও বাড়ীতে একবার গিয়েছিলেন?" দেওয়ানজী বলিলেন, "গিয়ে আর কি করবো দিদি? জান ত সে কখনই আসিবে না।" মলিনা বলিল, "না ঠাকুর্দ্দা, আপনাকে একবার যেতেই হবে। যেমন ক'রে হ'ক তাঁর আসা চাই-ই। আপনি এখনি একবার যান।" বৃদ্ধ দেওয়ানজী আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি বেশ জানিতেন যে, মলিনা অত্যন্ত একগুঁয়ে মেয়ে, যাহা বলিবে তাহা নিশ্চয়ই করিবে। তিনি এ বাড়ীতে মলিনার ঠাকুর্দ্দার সময় হইতে আছেন। সেই জন্য মলিনা তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকিত।

দেওয়ানজী অমলের বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, সে এইমাত্র অফিস হইতে ফিরিয়াছে। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সসম্মানে নিজের ঘরে বসাইয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দ্দা, সব ভাল ত?" দেওয়ানজী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাল আর কৈ রাখ্‌লে দাদা? তোমরা দুটী যা হয়েছ।" দেওয়ানজীকে আর বেশী কিছু বলিতে না দিয়া অমল কথাটা যেন কাণে তুলিল না এই ভাবে বলিল, "তা ঠাকুর্দ্দা, জ্যাঠা মশায়ের কাজ কবে হচ্চে? কাল হবার কথা না?" দেওয়ানজী বলিলেন, "সেই জন্যই এসেছি দাদা, তোমার যে তলব পড়েচে।" অমল একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার তলব! আমি ত যেতে পার্‌বো না ঠাকুর্দ্দা।" দেওয়ানজী একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে বড় কড়া হুকুম দাদা! যেতে তোমায় হবেই। তোমায় সঙ্গে না নিয়ে গেলে আমার আজ গর্দ্দান যাবে।" অমল বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "না ঠাকুর্দ্দা, আমি কখনই যেতে পার্‌বো না, আমায় ক্ষমা করবেন।"

দেওয়ানজী অমলকেও বেশ চিনিতেন, আর বেশী কিছু না বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে বাটী ফিরিলেন।

মলিনা সমস্ত কায-কর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহারই প্রতীক্ষায় জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। দেওয়ানজীকে একলা গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার বিষাদমাখা মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল। তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া মলিনা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি অনেক করে বল্লেন, তবুও এলেন না?" দেওয়ানজী বলিলেন, "হাঁ দিদি, এর বেশী কেউ বলতে পারে না।" একটু ভাবিয়া মলিনা বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, আপনি এখনি দ্বারবানকে দিয়ে একটা গাড়ী আনিয়ে দিন। আমি নিজে একবার যাব।" দেওয়ানজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যার নিজের দু-খানা মোটর, চারখানা গাড়ী, সে ভাড়া গাড়ীতে কেন যাবে দিদি? আর তুই কি এই বয়সেই সন্ন্যাসিনী হবি। ভাল কাপড় পরিস্ না, গায়ে গয়না দিস্ না, এসব আমার কিন্তু ভাল লাগে না, তা আমি ব'লে দিচ্ছি।" মলিনা নিরাশভাবে একটু মুচকে হাসিয়া বলিল, "আপনি শিগ্‌গীর একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দিন। দেরী কল্লে চলবে না।" বৃদ্ধ আপনার মনে বকিতে বকিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মলিনা যখন অমলের বাড়ী আসিল, সে তখন একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মলিনা বলিল, "এখনি তোমায় আমাদের বাড়ী যেতে হবে। ওঠ, গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না।" কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া অমল মলিনাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটী সাদা সিদে সেমিজের উপর একটী মামুলি ধরণের কাপড় পরা। দেহে কোথাও গহনা নাই। হাতে মামুলি ধরণের কাঁচের চুড়ী আর একটা লোহার নোয়া। মলিনাকে হঠাৎ দেখিয়া এবং এই বেশে দেখিয়া অমল কিছুই বলিতে পারিল না। মলিনা বলিল, "ওঠ, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখন অনেক কাজ বাকী। তুমি না গেলে হবে না।" অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া খবরের কাগজ হাতে লইয়া অমল বলিল, "সে ত আমি ঠাকুর্দ্দাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছি, আমি যেতে পারবো না।" মলিনা বলিল, "সে কথা বল্লে হবে না। আমি একা সব বন্দোবস্ত ক'রে উঠতে পারবো না, তোমায় যেতেই হবে।" অমল মলিনার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "না মলিনা, আমি যাব না।

ঠাকুর্দ্দা আছেন, তিনিই সব ঠিক ক'রে দেবেন।" মলিনা অনেক কষ্টে কান্না চাপিয়া বলিল, "বাবা মারা গেছেন, এখনও কি তুমি তাঁকে ক্ষমা কর্ত্তে পারনি?" অমল একটু বিচলিত হইয়া বলিল, "গরীব কখন বড় লোককে ক্ষমা কর্ত্তে পারে মলিনা?" ভারী গলায় মলিনা বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে আসিনি, আমি শুধু তোমায় নিতে এসেছি। চল, আর দেরী ক'র না।" অমল জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ফিরে যাও মলিনা, আমি যাব না।" মলিনা আরও ভারী গলায় বলিল, "তা হ'লে নিশ্চয়ই যাবে না?" একই ভাবে অমল বলিল, "না।" মলিনা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অমল বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দ্যাখ, আমি শুনলুম, আমার অসুখের সময় তুমি না কি তোমার বাবার অজ্ঞাতে আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য ২০০৲ টাকা খরচ করেছিলে।" ড্রয়ার হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "সেই টাকা কটা তুমি নিয়ে যাও। তোমাদের কাছে আমি চিরকাল ঋণী। ঋণের উপর আর ঋণ বাড়াতে ইচ্ছা করি না।"

অমলের ব্যবহারে মলিনা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। প্রস্তরের মত কিছুকাল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া, কিছু না বলিয়া নোট দুইটী লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। চক্ষু আর কোন বাধা মানিল না।

কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, অমল হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, একটী ভাড়াগাড়ীর ছাদে মলিনার দ্বারবান বসিয়া আছে, বুঝিল, ঐ গাড়ীতেই মলিনা আসিয়াছিল। তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না—একদৃষ্টে সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া দু-এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে অমলের এক বন্ধু আসিয়া বলিল, "কি হে, আজ যে বড় দাতা হয়ে পড়েছ দেখছি। মোটা মোটা চাঁদা দিতে আরম্ভ করেচ। মস্ত বড় 'পেট্রিয়ট' হয়ে পড়লে দেখছি যে!" অমল সকালে উঠিয়া গত বৈকালের ঘটনাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। রাত্রে ঘুম না হওয়ায় মাথাটা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ দানের কথা শুনিয়া বলিল, "দান! কি রকম?" বন্ধু বলিল, "আর 'মডেষ্টিতে' কাজ কি বাবা, এই দেখ

না। এতই যদি টাকা হয়েছে আমাদের একদিন খাইয়ে দাও না বাপ্।" অমল দেখিল, যথার্থই একস্থানে লেখা রহিয়াছে, "অমলকুমার আহত ভারতবর্ষায় সৈনিকদিগের সাহায্যের জন্য ২০০৲ টাকা দান করিয়া অত্যন্ত মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন।" অমল একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল, "পৃথিবীতে কি আর কোন অমল নাই?" বন্ধু তাহার পিঠে একটী আষাঢ়ে চড় মারিয়া বলিল, "এই যে বাবা তোমার ঠিকানা রয়েছে। দেখতে পাচ্চ না? এবাড়ীতে কি তোমরা দু-জন অমল থাক না কি?" অমল দেখিল, যথার্থই তাহার ঠিকানাও লেখা রহিয়াছে। এ যে এই অমল তাহার আর সন্দেহ নাই। অমলকে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যাইতে দেখিয়া বন্ধুটী বলিল, "কি হে, ব্যাপার কি? দান করেছ বলে কি আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কবে না না কি?" অমল কোন উত্তর করিল না, মনে মনে বলিল, "এ নিশ্চয়ই মলিনার কায।"

(৩)

বৃদ্ধ দেওয়ানজীর সাহায্যে মলিনা বেশ এক রকম সুশৃঙ্খলে তাহার পিতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিল। কাঙালী ভোজনের সময়ে সে নিজে হাতে সকলকে পরিবেশন করিয়াছিল এবং তাহাদের বিদায়কালে প্রত্যেককে এক জোড়া করিয়া নূতন কাপড় ও পাঁচটী করিয়া টাকা দান করিয়াছিল। এত কাজের মধ্যেও মলিনা সময় সময় বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, যেন কাহার আগমন প্রতিমুহূর্ত্তে সে প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই নিরাশ হইয়া কাঙালী ভোজনে এবং বাড়ীর ঝী চাকরকে খাওয়াইতে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

খাওয়ান দাওয়ান শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। অত বড় বাড়ী ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। মলিনা আর একবার কাহার জন্য নিরাশ মনে পথের দিকে চাহিয়া নিজের ঘরের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। আজ তাহার মনে পড়িল, সেই রাত্রি যে রাত্রিতে সে অমলকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী মলিনাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া তাহার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মলিনা বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ অস্থির হইয়া বলিলেন, "মলিনা, তোর খাওয়া হয়েছে?" মলিনা মুখ না তুলিয়া ভারী গলায় বলিল, "আমার আজ ক্ষিদে নাই ঠাকুর্দ্দা, আমি খাব না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।

হিলিংবাম

মেহ প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এক মাত্রায় উপকার। ২৪ ঘণ্টায় জ্বালা নিবারণ।

সপ্তাহে রোগমুক্তি।

"হিলিংবাম" সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে সর্ব্বদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ব্যবহার্য্য। গণোকোকাই নামক এক প্রকার কীটাণু মেহ, প্রমেহ রোগের মূল কারণ কেবলমাত্র "হিলিংবাম" দ্বারা'ই এই সকল কীটাণু সমূলে বিনষ্ট হয় বলিয়া, "হিলিংবাম" মেহ প্রমেহাদি রোগের এক মাত্র মহৌষধ। ২৫ বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিলিংবাম সেবনে

প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা, সপূঁজ ও সূত্র তার ন্যায় বিকৃত ধাতু পাত, প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে শুক্রপাত, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণ দাগ লাগা, মূত্রনালীর টনটনানি, প্রস্রাবের পথে ক্ষত, স্ফূর্ত্তিহীনতা, হাত পা জ্বালা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা ও কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্ব্বদা আলস্য, কার্য্যে অনুৎসাহ ইত্যাদি উপসর্গ সকল "হিলিংবাম" সেবনে আরোগ্য হয়।

"হিলিংবাম" নিজগুণে বহু খ্যাতনামা উচ্চ উপাধিধারী ডাক্তারগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকজন ডাক্তারের নাম দেওয়া গেল, যথা—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি ইত্যাদি; মেজর বি, কে, বসু (আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; মেজর এম, পি, সিংহ (আই, এম, এস,) এম, আর, পি, পি; এম, আর, সি, এম; ডাঃ ইউ গুপ্ত এম, ডি, এফ, সি, এস; ডাঃ এস চক্রবর্ত্তী, এম, ডি, লণ্ডন; ডাঃ ই, এস, পূসং এম, ডি, (লণ্ডন) ডাঃ জি, সি, বেজ-বড়ুয়া—এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি, এস; ডাঃ এ কারমী, এল আর, সি, পি, এণ্ড এস; ডাঃ আর, সনিয়ার এম, বি, সি, এম; ডাঃ আর, নিউজেণ্ট এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষ বিবরণাদির জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক বিনামূল্যে পাঠান হয়, পত্র লিখিলে পাইবেন। মূল্য বড়শিশি ২॥০, ছোটশিশি ১৸০, ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং কেমিষ্টস্

টেলিগ্রাফ—হিলিং, কলিকাতা।

১৪৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

হিলিংবাম

[illegible] প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এক মাত্রায় উপকার। ২৪ ঘণ্টায় জ্বালা নিবারণ।

সপ্তাহে রোগমুক্তি।

"হিলিংবাম" সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে সর্ব্বদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ব্যবহার্য্য। [illegible] নামক এক প্রকার কীটাণু [illegible], প্রমেহ রোগের মূল কারণ কেবল [illegible] "হিলিংবাম" দ্বারাই এই সকল কীটাণু সমূলে বিনষ্ট হয় বলিয়া, "হিলিংবাম" [illegible] প্রমেহাদি রোগের এক মাত্র মহৌষধ। ২৫ বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিলিংবাম সেবনে

[illegible] যন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা, সপুঁজ ও সূত্র [illegible] [illegible] ধাতুপাত, প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে শুক্রপাত, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণ [illegible] [illegible], প্রস্রাবের পথে ক্ষত, স্ফূর্ত্তিহীনতা, হাত পা [illegible], [illegible], অনিদ্রা ও কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্ব্বদা আলস্য, কার্য্যে অনুৎসাহ ইত্যাদি [illegible] সকল "হিলিংবাম" সেবনে আরোগ্য হয়।

"[illegible]" নিজগুণে বহু খ্যাতনামা উচ্চ উপাধিধারী ডাক্তারগণের [illegible] [illegible]। [illegible] ডাক্তারের [illegible] দেওয়া গেল, যথা—

[illegible] জে, পি, [illegible] (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি ইত্যাদি; [illegible] [illegible] (আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; মেজর এস, পি, [illegible] [illegible] [illegible], ডাঃ [illegible] [illegible] [illegible] এম, ডি, লণ্ডন; ডাঃ [illegible]

বিজ্ঞাপন।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবা-কুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা, ও তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা রহিল।

কবিরাজ উপেন্দ্র নাথ সেন।

ম্যানিজিং ডাইরেক্টার।

সি, কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সাল।

১০ খানি গোল্ডমেডেল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

গভর্ণমেন্ট এবং রেলওয়ে কালী ও রবারষ্ট্যাম্পের একমাত্র কণ্ট্রাক্টার্স।
ইউরোপের দারুণ যুদ্ধে মূল্যের কিছু তারতম্য হইয়াছে।

FORGET ME NOT-

ভুলনা আমায়। P. M. *BAGCHI* & Co
PERFUMERS

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুদৃশ্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও বহুদিন স্থায়ী। বিলাতী ফরাসী দেশের এসেন্সকে হার মানিতে হইয়াছে। দেশীয় এসেন্সের ত কথাই নাই। প্রিয়জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী। একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন, আপনি খুসী হইবেন। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এসেন্সের তালিকা যথাঃ—

এসেন্স বোকে—বিলাতী এসেন্স কাশ্মীর বোকে হইতেও উৎকৃষ্ট	...	১।০
মনের মতন—উৎকৃষ্ট স্থায়ী গন্ধ, বিশেষ আদরণীয়	...	১।০
ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ, বহুক্ষণ স্থায়ী	...	১।০
নৈশসুন্দরী beauty of the night হাসনাহানা পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ	...	১৶০
কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের গন্ধ	...	৸৶০
হোয়াইট রোজ—দেশীয় গোলাপের গন্ধ	...	৸০
ডামাস্ক রোজ—দেশীয় গোলাপের গন্ধ	...	৸০
এসেন্স রজনীগন্ধ—সদ্যপ্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ	...	৸০
বকুল—সুলভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ, বড় শিশি ৸৶০ ছোট		৷৵০
খস—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষন স্থায়ী	...	৸০
কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী পুষ্পের গন্ধ	...	৸০
গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ পুষ্পের স্থায়ী গন্ধ	...	৸০
চেরি—চেরি ব্লসমের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ	...	৸০
জেস মিন—প্রস্ফুটিত জুই ফুলের স্থায়ী গন্ধ	...	৷৶০
কুমুদিনী—সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ	...	৸০
টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ (অতি মনোহর)	...	৷০
সেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ (যাহা কোথাও নাই)	...	।৶১০
হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ (এরূপ গন্ধ এই নূতন)	...	৸০
ভুলনা আমায় forget me not—দ্রব্যের সহিত তুলনায় মূল্য অতি অল্প		২৶০
অডিকোলন—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী, তৃপ্তিজনক ও বহুক্ষণ স্থায়ী	...	৷০

অফিস—১৩নং সুকিয়াস লেন, মুর্গিহাটা (পর্টুগীজ চার্চ্চের সম্মুখে)
কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

বিংশ শতাব্দীর গৌরব।

গোল্ডেন ব্রেন পিল

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা।

শীত আসিয়াছে, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে বঙ্গদেশ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। একে অন্নাভাব তদুপরি রোগ যন্ত্রণা বাঙ্গালীর সোনার সংসারকে উৎসন্ন দিতেছে। যদি ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন—যদি নীরোগ শরীরে অবাধে সংসারের কার্য্যাবলী সমাধা করিতে ইচ্ছা করেন, কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের গোল্ডেন ব্রেন পিল এক শিশি ক্রয় করুন। পরীক্ষায় বুঝিবেন যে আপনি লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন ;

গোল্ডেন ব্রেন পিল :—ইহা দুঃস্থকে সুস্থ করে, বৃদ্ধকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করে।

গোল্ডেন ব্রেন পিলঃ—বাজারের সালসা অপেক্ষা বহু পুষ্টিকর এবং বার্দ্ধক্যের জড়তা নাশক।

গোল্ডেন ব্রেন পিল ধাতুদৌর্ব্বল্যনাশক, আয়ুর্ব্বেদীয় তেজস্কর লতা ও গুল্মের এবং স্বর্ণাদি ধাতুর সংমিশ্রণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ঔষধাদি মিশ্রনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। ইহাতে পারদাদি কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৸৹ মাশুল ।৹

ত্রিকূট তৈল।

কেবল মাত্র বহির্ম্লিসে সর্ব্ব প্রকার রোগ আরোগ্য হইবে। পার্ব্বত্য দেশজাত কতকগুলি অপূর্ব্ব মহাগুণশালী দ্রব্যের সংমিশ্রণে এই অদ্ভুত শক্তিশালী তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। কেবল মাত্র বহির্ম্লিসে অনেক কঠিন কঠিন রোগ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় স্থায়ী ভাবে আরোগ্য হয়। এক কথায় ইহা ব্যবহারে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বিভূষিত হইবেন এবং নীরোগ শরীরে শতায়ু পরমায়ু লাভ করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১।৹ মাশুল ।৵৹।

গোল্ডেন ব্রেন পিল ও ত্রিকূট তৈল সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে পত্র লিখুন, বিনামূল্যে "নূতন জীবন" পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গোল্ডেন ব্রেন পিল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং,

কুণ্ডা, দেওঘর (এস্, পি)।

ডা[illegible] [illegible]মালসা রক্ত পরিষ্কারক পারাগাম্বি ও বাতনাশক, বলবৃদ্ধিকারক, সেবনকালে কোনবাধাধরা নিয়ম নাই, সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাংসহ ১৵০ ৩ শিশি ৪৷৵০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মূল্য প্রতি ড্রাম /১০ ও [illegible] বাক্স পুস্তক ঔষধ ও ফোটাফেলিবার যন্ত্র সহ মূল্য ১২ শিশি মাঃসহ ২৷০, ২৪ শিশি ৩৷৵০, ৩০ শিশি ৪৵০, ৪৮ শিশি ৬৲, ৬০ শিশি ৭৷০ ৮৪ শিশি ১০৷০, ১০৪ শিশি ১৩৲

দরিদ্রভাণ্ডার ঔষধালয় শ্রী অখিলচন্দ্র শীল। ১৫/৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন। পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

* ব্লুব্ল্যাক কালীর ট্যাব্লেট।

এই কালীর ট্যাবলেট বিলাতী কালীর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রতি ট্যাবলেটে এক দোয়াত সুন্দর কালী হয়।

ফ্যান্সি টিন বাক্স সমেত ১ গ্রোস বা ১৪৪টী ট্যাবলেটের মূল্য ৮৵০ আনা।

* * *

সবুজ ৮৵০ ভাওলেট ৬৵০ ও লাল ১৷৵০ আনা মাশুলাদি ।০ চারি আনা।
একত্রে ১২ গ্রোস লইলে মূল্য ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি ১৲ এক টাকা।

সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

[illegible] ১৷৵০, যোগ বা সাধন-তত্ত্ববারিধি ১৵০, [illegible] উপন্যাস ৷৵০, [illegible] ৷৵০, বিশ্ববিজ্ঞান কাব্য [illegible] বা অক্রূরসংবাদ গীতাভিনয় ১৵০, [illegible] পণ্ডিত ।৵০ আনা।

শ্রী[illegible] শীল।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] নামোল্লেখ করিবেন।

ঢাকার বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতী চরণ কবিশেখর।
F.N.B.A. (LONDON.) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত

কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক

আদিস্থান, — আসক লেন, ঢাকা।
ব্রাঞ্চ,—৩৫৬/২নং অপার চিৎপুর রোড,
নূতন বাজার, কলিকাতা।

বিনা উত্তেজনায় প্রত্যূষে কোষ্ঠ-পরিষ্কার ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির নূতন অত্যাশ্চর্য্য সুস্বাদু মহৌষধ। একমাত্রা সেবনেই বাহাদুরী বুঝা যায়। সুফল না হইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন॥ কৌটার মূল্য,—৫ তোলা ৷৶০, ১০ তোলা ১৶, ২০ তোলা ২৲ মাত্র। একবার পরীক্ষার্থ এক তোলাও বিক্রীত হয়। তাহার মূল্য ৶০ তিন আনা।

ইহা সেবনে পেটফাঁপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাতাজীর্ণ, ডিস পেপসিয়া, লিভারের দোষ, মস্তিষ্কের উষ্ণতা, অর্শ, অম্বল, অম্ল-পিত্ত, অম্ল-শূল, পিত্ত-শূল, ক্রিমি, গাত্র-বেদনা, প্লীহা, জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় কলিকাতার ব্র্যাঞ্চে আছেন। এবং কলিকাতার ব্র্যাঞ্চের সঙ্গে ঢাকার "আয়ুর্ব্বেদীয় যৌথ কারখানার" মহামূল্য ঔষধের ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে, যিনি কলিকাতার বাজারের মূল্যাধিক্য ও কৃত্রিমতায় বিরক্ত, তিনি আসুন

ডাঃ বাট্‌লিয়ালার জেনুইন্‌-কুইনাইন ট্যাব্‌লেট্‌স্‌।

একশত বটিকাপূর্ণ (এক গ্রেণের বটিকা) এক শিশি ৸০ আনা ; ঐ (দুই গ্রেণের বটিকা) বড় শিশি ১৲ টাকা। ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার এগিউ মিক্‌শ্চার—জ্বর, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির মহৌষধ—মূল্য ১৲ টাকা। বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তহীনতায় ও দৌর্ব্বল্যে মহোপকারী—মূল্য ১৷০ দেড় টাকা বাট্‌লিওয়ালার টুথ পাউডার দন্তরোগের মহৌষধ—মূল্য ১৷০ টাকা। বাট্‌লিওয়ালার দাদের মলম—মূল্য ।০ আনা। নিম্ন ঠিকানায় এবং সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য। ডাঃ এইচ, এল, বাট্‌লিওয়ালা সন্স কোং লিমিটেড, ওয়ার্লি ১৮ বম্বে।

Dr. H. L. BATLIWALLA SONS. Co. Ltd.
WORLI 18 BOMBAY.



আসামের কালাজ্বর,

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জররোগের এমত আশু-শান্তি-কারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য—বড় বোতল ১।৶০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা। ছোট বোতল ৸৶০ ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা অ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, ডাকমাশুল ।৶০।

এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবালবৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা গুণপ্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টিন ।৶০ আনা, বড় টিন ॥০ আনা।

সোল্ এজেণ্টস্ বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

১ ও ৩নং বনফিল্ডস্ লেন্, কলিকাতা।

মিলন-মাধুরী তৈল



অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপন প্রতিভাবলে তৈল জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইনি সৌগন্ধে অতুলনীয়া। কেশ বৃদ্ধিকারিতা, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারিণী এবং শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর বাহুল্য মাত্র। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—

এ. বোস এণ্ড সন।

১১নং চৌধুরী বাগান লেন,

হাওড়া।

উৎসব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

ইহাতে হিন্দুর বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির নির্দ্দেশিত সনাতন পন্থা নির্দ্দেশ, ভক্তি কি, কিরূপে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করা যায় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাসহ যোগবাশিষ্ঠঃ ও ছান্দোগ্য-উপনিষদের সরলার্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

ম্যানেজার উৎসব কার্য্যালয়।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

IMPERIAL

মাতঙ্গিনী বটিকা।

কুইনাইন দেখাইতে পারিলে ১০০্ টাকা পুরস্কার!!

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন জ্বররোগের ব্রহ্মাস্ত্র। অপিচ, ইহা দ্বারা প্লীহা ও যকৃত-বিবৃদ্ধির হ্রাস হয় এবং বিকৃতি দূর করে। ইহা সেবনে এক দিনেই জ্বর বন্ধ হয়, পুনরায় জ্বর আসে না। ইহা ঘর্ম্ম ও মূত্রের প্রবর্ত্তক এবং কোষ্ঠাগত-বায়ুনাশক। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর দূর করিয়া শরীরে নূতন রক্তের সঞ্চার করে। এই ঔষধ সহস্রবার পরীক্ষিত হইয়া অদ্য জনসাধারণের উপকারার্থে প্রচার করা হইল। মূল্য প্রতি কৌটা সডাক ৷০ আট আনা, একত্রে ৩ কৌটা সডাক ১্ টাকা।

ম্যানেজার—মাতঙ্গিনী বটিকা, ১৪৬ নং খুরুট রোড, হাওড়া।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস সাহিত্য-সরস্বতী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রথম তরঙ্গ "খাদ্যতত্ত্ব" ছাপা হইতেছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় জ্ঞাতব্যের ব্যাখ্যাসহ একখানি সুবৃহৎ পুস্তক। তাই গ্রন্থকার ইহার এক একটি বিষয় লইয়া খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতেছেন। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" যেমন ধর্ম্ম প্রভৃতি সাধন করিতে বা জানিতে হইলে প্রথমেই শরীর রক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম কি, দেবতা কি প্রভৃতি জানিবার পূর্ব্বে কিরূপে দেহরক্ষা করিতে হয় এবং সেই দেহ কোন কোন খাদ্যে নীরোগ ও সবল থাকে, কোন খাদ্যের কি গুণ, শরীরের সহিত ত্রিগুণের সম্বন্ধ ও কালবিভাগ, ষড়ঋতুচর্য্যা, বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভোজন প্রভৃতি বিষয়ের প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে আমাদের দৈনিক খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনা করিতেছেন; অপিচ ইহাতে এমন একটি প্রশ্ন আছে যাহার মীমাংসা করিতে পারিলে গ্রন্থকার তাঁহাকে নগদ ১০্ টাকা পুরস্কার দিবেন। অগ্রিম।০ আনার ষ্ট্যাম্প বা নগদ জমা দিয়া গ্রাহক হইয়া থাকিলে বিনামূল্যে বেয়ারিং ডাকে পুস্তক পাইবেন, অন্যথায় শুধু নাম রেজেষ্টারি করিলে সডাক ৷০ আনা মূল্যে পাইবেন। সত্বর হউন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে। গ্রাহক সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যাইলে আর শীঘ্র পাইবেন না। ইহা বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব পুস্তক। গ্রন্থকারের নামে ৬ নং গোপাল বানার্জ্জীর লেন, হাওড়া, এই ঠিকানায় পত্রাদি পাঠাইবেন।

Alochona Patrika. Reg. No. C. 116.

জগদ্বিখ্যাত ব্রহ্মচারী প্রদত্ত

এম, এল, বসু এণ্ড কোং

লক্ষ্মীবিলাস।

মহোপকারী সুবাসিত তৈল। মূল্য ৵০ আনা, ডজন ১৲ টাকা; বোতল ২।০ টাকা, ডজন ২৭৲ টাকা।

সুধাসিন্ধু রস।

ম্যালেরিয়া ও প্লীহা যকৃতের মহৌষধ। মূল্য ৷৵০ আনা।

বাতরাজ তৈল।

বাতরোগের মহৌষধ। মূল্য ৷০ আনা।

দদ্রু-হুতাশন।

সর্ব্বপ্রকার দাদরোগের মহৌষধ। মূল্য ।৵০ আনা।

গোলাপ সার।

মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ও চক্ষুরোগের মহৌষধ। মূল্য ।০ আনা।

পাইট ৶০ আনা।

মহামলম।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের মহৌষধ। মূল্য ৷০।

১২২ নং, পুরাতনচিনাবাজার, কলিকাতা।

Printed By R. N. Das at the Bani Press, 63 Nimtola st, Calcutta and Published by R. N. Das from 6, Gopal Banerjee's Lane, Howrah,